মানস-সরোবর ও কৈলাস

সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রাবণ, ১৩৩৮

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত
১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ



জীবন্তে যিনি গৌতম,

মরণে শাশ্বত শিব-মূর্ত্তি

সেই

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

রাখালদাস ন্যায়রত্ন

দাদা-মহাশয়ের

শ্রীচরণে



ভূমিকা

পুণ্য ভারত-ভূমির অসাধারণ মহিমার অনন্ত কারণ বিদ্যমান আছে। ভারতের পূজ্যপাদ মুনিঋষিগণ, ভারতের অধ্যাত্মবিৎ বড় বড় দার্শনিকগণ, ভারতের সতীকুল-ললামভূতা সীতা-সাবিত্রী-অরুন্ধতী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহিলাবৃন্দ, ভারতের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ ও কলা প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ এবং ভারতের ত্রিলোক-বিখ্যাত আদর্শ-চরিত বীরপুরুষগণ—আরও কত লিখিব, এই জাতীয় মানব-মহিমার জ্বলন্ত উদাহরণ স্বরূপ অসংখ্য কারণসমূহ মিলিত হইয়া ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে অনাদি কাল হইতে যেমন অতুলনীয় গৌরবে অলঙ্কৃত করিয়াছে, ভারতের অগণিত মহাপ্রভাবশালী তীর্থরাজিও অপর দিকে জগতে ভারতের অতুলনীয় মহিমা তেমনই খ্যাপন করিয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, পৃথিবীর সকল সভ্য-প্রদেশ অপেক্ষা ভারতের তীর্থজনিত গৌরব অত্যন্ত অধিক। হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, আবার আসাম হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত, ভারতের সমস্ত প্রদেশই অসংখ্য তীর্থের গৌরবে সমুদ্ভাসিত। পৃথিবীর অন্য কোন মহাদেশে এত তীর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের ইহাও হইতেছে অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের কৌতুকপ্রিয় প্রাকৃত-শোভা-

ভূমিকা

দর্শন-লোলুপ ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভূমণ্ডলের নানা স্থানের বিস্ময়াবহ প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ বিলোকন করিবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় ও নানাপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহা আমরা সকলেই জানি। তাঁহাদিগের উদ্যম ও অধ্যবসায় যে সর্ব্বথা প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতেও পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি নব্য শিক্ষিতবৃন্দের মধ্যে বহুল ভাবে দেখা দিয়াছে, ইহাও প্রশংসনীয়। কিন্তু ভারতের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী প্রাচীন গৌরবের প্রতি আস্থাসম্পন্ন নরনারীগণের তীর্থদর্শনের জন্য ব্যাকুলতা ও একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যে পর্য্যটন—তাহার সহিত ঐ সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন-লোলুপ পর্য্যটকগণের সাদৃশ্য যেমন আছে, বিলক্ষণতাও সেইরূপ সমধিক ভাবে বিদ্যমান এবং তাহাই হিন্দু-ভারতের পক্ষে বিশেষরূপে প্রশংসনীয় ও শ্রদ্ধেয় হইয়া থাকে। পায়ে হাঁটিয়া দারুণ শীত, গ্রীষ্ম ও আতপ সহ্য করিয়া, পথে বাসস্থানের ও প্রাণ-ধারণের যোগ্য আহারাদির অসহনীয় অভাব নীরবে সহন করিয়া ভারতের বিশ্বাসী হিন্দুনরনারীগণ যে ধর্ম্মপ্রাণতা, ত্যাগশীলতা ও বীরতার পরিচয় এখনও দিয়া থাকেন, তাহা যে না দেখিয়াছে তাহাকে বুঝান যায় না। অগণিত নরনারীর প্রতিবর্ষে এই তীর্থ-যাত্রার ক্লেশের ইতিহাস এখনও কোন ভাষায় লিখিত হয় নাই। যদি কোন দিন লিখিত হয়, তবে দৃঢ় বিশ্বাসসহকারে আমি বলিতে পারি, তাহা ভাষায় বর্ণনীয়

বিষয়-সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়োৎপাদক ও সকলেরই হৃদয়াকর্ষক হইবে। এই জাতীয় সাহিত্যের প্রচার বর্ত্তমান সময়ে যে একান্ত অপেক্ষণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় যে, এইরূপ একখানি গ্রন্থ সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ-ভাজন শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অসীম ক্লেশ ও অর্থব্যয় অঙ্গীকার করিয়া নিজে ভারতীয় তীর্থ-রাজির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম ও সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক গাম্ভীর্য্যময় অনন্ত প্রাকৃতিক শোভা সম্পন্ন মহাতীর্থ—কৈলাস ও মানস-সরোবরে গমন পূর্ব্বক গন্তব্য পথের ও তৎসংক্রান্ত প্রাকৃত দৃশ্যরাজি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া, বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাগণের জ্ঞান বৃদ্ধি ও সন্তোষের জন্য এইরূপ একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সুবিখ্যাত "বসুমতী" নামক মাসিক পত্রে ধারাবাহিক-রূপে তাঁহার এই—মানস-সরোবর ও কৈলাস যাত্রার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি ঐ সকল ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলি, একত্র সংগ্রহ ও অপেক্ষিত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া তিনি সচিত্র "মানস-সরোবর ও কৈলাস" এই নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি আশান্বিত হইয়াছি যে, এই প্রকার প্রয়োজনীয় সাহিত্য-সৃষ্টির বাস্তব সূত্রপাত এতদিনে আমাদের ভাষায় হইল; এই সূত্রানুসারে ভবিষ্যৎ তীর্থ-সাহিত্যিকগণ অগ্রসর হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। এই গ্রন্থে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনামাত্র করিয়াই গ্রন্থকার বিরত,

হয়েন নাই, কারণ হিন্দুতীর্থ-যাত্রীর পক্ষে প্রাকৃতিক তীর্থ-শোভা দর্শনই তীর্থযাত্রার প্রধানতম উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু উহা অবান্তর মাত্র। অবান্তর বলিয়া তিনি তাহার উপেক্ষাও করেন নাই। কিন্তু ললিত সরল ভাষায় তাহার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তীর্থের পুরাণ ও ইতিহাস বর্ণিত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সপ্রমাণ উল্লেখ তিনি এইগ্রন্থে করিয়াছেন এবং এই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম কৈলাস-তীর্থ-যাত্রায় প্রত্যেক যাত্রীর কি ভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত, যাত্রিগণের উপকারার্থে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে বিস্তৃত পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন। পথে যাইবার সময় কোথায় কোন্ কোন্ বস্তু তীর্থযাত্রীর পক্ষে আবশ্যক-ভাবে সংগ্রহ করিতে হয়, পথের উভয় পার্শ্বস্থিত গ্রাম ও জনপদের অধিবাসিগণের প্রকৃতি কি প্রকার, কিরূপ ব্যবহার তাহারা ভালবাসে, কিরূপ ব্যবহারেই বা বিরক্ত হয়, তাহাদের নিকট হইতে কি ভাবে কিরূপ সাহায্য তীর্থযাত্রিগণ পাইতে পারেন, কোথায় কোন্ বস্তু কিরূপ মূল্যে পাওয়া যায়, কোন্ স্থান হইতে 'দোভাষী' সঙ্গে লওয়া উচিত, এক চটি হইতে অন্য চটির দূরত্ব কত, পথের দুর্গমতা কি প্রকার, কোন্ সময়ে যাত্রা করিতে হয় ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এই গ্রন্থের মধ্যে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তীর্থ-সংলগ্ন মনোহারী দৃশ্যসমূহের এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত সুন্দর চিত্রাবলীতেও গ্রন্থখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমলঙ্কৃত। প্রত্যেক তীর্থের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক তত্ত্বের অনুশীলনে গ্রন্থকার অপূর্ব্ব কৃতিত্বের

পরিচয়ও দিয়াছেন। হিমবৎপ্রদেশের তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে যে কয়খানি গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এইখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমার মনে হয়। যুগপ্রভাবে শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণের মহিমা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তীর্থরাজির প্রতি নব্য-শিক্ষিত হিন্দুগণের বর্ত্তমান ঔদাসীন্য, দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিয়া থাকেন। এই ঔদাসীন্য দূর করিবার জন্য ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম অথচ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মহাতীর্থ—কৈলাস ও মানস-সরোবরের এমন সুন্দর বর্ণনাযুক্ত প্রয়োজনীয় এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়া কল্যাণ-ভাজন গ্রন্থকার বাঙ্গালী আস্তিক হিন্দু মাত্রেরই যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন এবং যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, ইহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আমি আশা করি, এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শোভা বর্দ্ধন করিবে।

৺কাশীধাম
২রা শ্রাবণ, ১৩৩৮

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

উপক্রমণিকা

ব্রহ্মার মানস-সৃষ্ট মানস-সরোবর ও মৃত্যুঞ্জয় সদাশিবের নির্ব্বিকল্প সমাধিক্ষেত্র শ্রীকৈলাস—এই উভয় তীর্থই হিন্দুর চক্ষে কতদূর শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। এই তীর্থযাত্রার পথ ভারতের সকল তীর্থস্থানের যাত্রাপথ অপেক্ষা অধিকতম দুর্গম। এই মানস-তীর্থ এ যাবৎ প্রায় সকলেরই মানসে কল্পনার ছবির মতই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অবস্থান করিত। পূর্ব্বে এ তীর্থে কেবল সাধু-সন্ন্যাসীরাই যাত্রা করিতেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে জন-সাধারণের মধ্যে সৌভাগ্যবশতঃ যদি তাঁহাদের সহিত কাহারও সঙ্গলাভ ঘটিত, তবে সেই সকল সাধু মহাত্মার প্রমুখাৎ মানস বা কৈলাস সম্বন্ধে নিত্য নূতন কতই না আশ্চর্য্যজনক ঘটনা উপকথার মত আমাদের কর্ণে মধুবর্ষণ করিত। অনেক স্থলে সাধারণতঃ তাহার বর্ণন এইরূপ :—"মানসের নীলজলে নীল-কমল সদাই প্রস্ফুটিত থাকে। সেই স্বচ্ছ সুমহান্ পবিত্র হ্রদে দেবতাগণ স্নান-মার্জ্জনাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া শ্রীকৈলাস-সমাধি-বেদীর তলে বসিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব-স্তুতি-ধ্যানে নিরন্তর ব্যস্ত, সে জলে 'পরমহংস'-রূপী হংসের বিচরণ অবাধ। তাহারা রাজহংস অপেক্ষাও আকারে বৃহৎ, দর্শন মাত্রেই ক্রূরপ্রকৃতি মনুষ্যের চিত্ত নির্ম্মল হইয়া যায়"—ইত্যাদি অপূর্ব্ব ভক্তিভাবসমন্বিত কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া এ দুর্গম তীর্থের দর্শনাশার সুযোগ বহুদিন হইতেই অন্বেষণ করিতেছিলাম।

ভূতভাবন কৈলাসপতির অনুগ্রহে আজ বিনা বাধায় সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারই কৃপায় উৎসাহের সহিত এ তীর্থ-যাত্রার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ সাধারণে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

উপক্রমণিকা

এই দুর্গম তীর্থ-যাত্রার বিবরণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যাত্রা-সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করা উচিত। কারণ আমার মত যদি কাহারও এই তীর্থদর্শনের উৎকট অভিলাষ থাকে, তিনি এই বিবরণ পাঠ করিলে অবশ্যই কিছু না কিছু উপকৃত হইবেন, এরূপ আশা করা অস্বাভাবিক নহে। প্রথমেই জানা আবশ্যক, কোন্ সময়ে এই কৈলাসতীর্থে যাত্রা করা উচিত। বদরিকাশ্রম প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে যাইতে গেলে যাত্রিগণ সাধারণতঃ বৈশাখ মাসেই যাত্রা করিয়া থাকেন; কিন্তু এই হিমালয়-পারের শ্রীকৈলাস-তীর্থযাত্রার সময় পৃথক্। এ পথে চির-তুষারাবৃত লিপুলেক গিরিবর্ত্মে (যেখান হইতে তিব্বতের সীমা আরম্ভ হইয়াছে) বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সর্ব্বদা তুষাররাশি গলিতে আরম্ভ হয়। সে সময়ে এই পথ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। তিব্বতের "তাকলাকোট" নামক স্থানে বাণিজ্য করিবার জন্য ভুটিয়া-বণিকগণ ভেড়ার পৃষ্ঠে মাল বোঝাই দিয়া, সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে গিয়া থাকে। তুষার-স্তূপের উপর দিয়া ঐ ভেড়ার দলের পুনঃ পুনঃ গমন-ফলে ক্রমশঃ এই তুষার-পথ মনুষ্য-চলাচলের উপযুক্ত হয়। তখন হইতেই যাত্রীদিগকে "লিপুলেক পাস্" দিয়া যাইতে দেওয়া হয়। সুতরাং এ তীর্থ-পথে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে অথবা আষাঢ়ের প্রথমে যাত্রা করাই যুক্তিযুক্ত।

যাত্রাকাল

কৈলাস বা মানস-যাত্রীর দ্বিতীয়তঃ জানিতে হইবে, এ পথে কিরূপ অবস্থার যাত্রিগণ যাইতে সমর্থ, কোন প্রকার যানবাহনাদির ব্যবস্থা আছে কি না? কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে এই দুর্গম তীর্থ-দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে? পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া শুনিয়া যাত্রার আয়োজন করিলে যাত্রীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা

যাত্রার অধিকারী

হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ের ভুক্তভোগী কৈলাসযাত্রী আমরা এ বিষয়ে যতদূর জানিয়া আসিয়াছি, তাহাই অন্য পাঠকবর্গকে জানাইতেছি।

প্রথম কথা ঃ—এই পথে পদব্রজে যাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত মনে হইল। তবে তাহাতে প্রতি যাত্রীরই পথের ক্লেশ সহনের উপযুক্ত শক্তির প্রয়োজন। বাঙ্গালা দেশের লোক, চিরদিন সমতল ক্ষেত্রে বাস করিয়া দুই মাস কাল একাদিক্রমে এই পার্ব্বত্য-পথে বিনা যান-বাহনে চৌদ্দ পনেরো মাইল হিসাবে অগ্রসর হইবেন, ইহা অবশ্যই কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পার্ব্বত্য-পথ বলিতে গেলে, পর্ব্বতের উপরে সাধারণ প্রশস্ত পথ, এ কথা যেন পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ মনে না করেন। কৈলাসের পথে ইহার একটু বিশেষত্ব আছে। কোথায় কোন পাহাড়ের চড়াই পাঁচ হইতে সাত মাইল পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে এবং সেই পথ এক এক স্থানে এমন সংকীর্ণ যে, একটিমাত্র মানুষই কোন মতে সেই পথে যাইতে পারেন। পাশাপাশি দুইজনের অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আবার কোথায়ও বা এইরূপ ভাবে পাঁচ সাত মাইল 'উত্‌রাই' নামিয়া আসিয়াছে। প্রায় সকল পথেই মধ্যে মধ্যে শীতল ঝরণার ধারা প্রবাহিত হওয়ায়, সেই সেই স্থান খুবই পিচ্ছিল হইয়া আছে। খুব সন্তর্পণে সেই সকল স্থান অতিক্রম করিতে হয়, নহিলে পদস্খলিত হইয়া একবারে নীচে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং পদব্রজে যাইতে গেলে প্রত্যেক যাত্রীর হৃদয়ে বল এবং অন্তরে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন। যাঁহাদের সে শক্তি নাই, তাঁহারা স্থানে স্থানে ঘোড়া বা ঝব্বুর সাহায্য পাইতে পারেন। এই ঝব্বু কৃষ্ণকায়, গায়ে বড় বড় লোমবিশিষ্ট জন্তু বিশেষ। দেখিতে অনেকটা ভীষণাকৃতি মহিষের মত। মায়ের জাতির যদি এই তীর্থভ্রমণের সাধ থাকে, তবে তাঁহারা কোন কোন স্থানে "ডাণ্ডি" করিতে পারিবেন। কোন স্থানে বা বাঁশে সতরঞ্চি বাঁধিয়া (দুই দিকে) সেই

ঝোলায় বসিয়া, বাঁশের উপরেই বুকের ভর দিয়া যাইতে হইবে। ইহা ছাড়া ঘোড়া বা ঝব্বু দুই প্রকার বাহনেই চড়িতে হইবে। রাস্তা খুব খারাপ থাকিলে, স্থানে স্থানে কিছু কিছু পদব্রজেও যাইতে না হয়, এমন নহে। এমন কি, এবারে 'নীরপানি' পাহাড়ের এক স্থানে ঝরণার পার্শ্বে বড় বড় উপলখণ্ড বিস্তৃত থাকায়, আমাদের সহযাত্রিণীদিগকে বাধ্য হইয়া পাহাড়ী-কুলির পৃষ্ঠে উঠিয়াও (বালককে পৃষ্ঠে লওয়ার মত) যাইতে হইয়াছে। এই সব উপায় জানা থাকিলে সাধারণতঃ প্রত্যেক যাত্রীই কৈলাস-যাত্রার দুর্গমতা অনুভব করিয়া লইবেন এবং মায়ের জাতিরা কৈলাস-যাত্রার অসুবিধা অনুভব করিয়া প্রথম হইতেই সতর্ক হইবেন। তাঁহারা যেন প্রত্যেকেই মনে রাখেন, উল্লিখিত সকল প্রকার কষ্ট স্বীকার করিবার সাহস ও ধৈর্য্য থাকিলে (শুধু অর্থ হইলে চলিবে না), তবে তাঁহাদের এই তীর্থ দর্শন লাভ হইতে পারে। এই দুর্গম তীর্থে যাইতে গেলে কি কি আবশ্যক-দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে হয়, যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য তাহাই এক্ষণে জানাইব।

যাত্রার আবশ্যক দ্রব্যাদি

(১) দুর্গম পথে রাত্রিবাসের জন্য একটি তাঁবু লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। এই তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিতে অন্ততঃ দুই মাস সময় লাগিয়া থাকে। পথে রাত্রিবাসের জন্য পরিষ্কার ধর্ম্মশালা এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। চৌদ্দ পনেরো মাইল পথ অতিক্রমের পরে যদি কোন গ্রাম দেখিতে পাওয়া গেল, তবে সেই গ্রাম্য লোকদের অনুগ্রহ হইলে মধ্যে মধ্যে দুই একখানি ঘরে আশ্রয় পাওয়া যায়, কিন্তু এমন স্থানেও আসিয়া পড়িতে হয়, যেখানে রাত্রিবাস করিবার জন্য তাঁবুই একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে।

(২) দারুণ শীত হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য শীতবস্ত্রাদি—

যেমন জামা, গায়ের কাপড়, গরম সোয়েটার, টুপী, গলাবন্ধ, দস্তানা, ট্রাউজার, দুই জোড়া ষ্টকিং ও দুই জোড়া জুতা, (এক জোড়া ভিজিয়া গেলে অপর জোড়া ব্যবহার্য্য) এবং পায়ের 'লপেটা' বা পট্টু (যাহা সাধারণতঃ সিপাহীগণ ব্যবহার করে) এবং শয়নের জন্য কম্বল, লেপ বালিশ ইত্যাদি।

(৩) বর্ষার জল হইতে বিছানা-পত্রাদি বাঁচাইবার জন্য প্রত্যেক বিছানার উপরে বাঁধিতে একটি করিয়া ভালরূপে ঢাকিবার অয়েল্ ক্লথ এবং জিনিসপত্র—যেমন আটা, চাউল, চিনি, মশলা প্রভৃতি ঢাকা দিতে কিছু অতিরিক্ত অয়েল ক্লথও সঙ্গে রাখা আবশ্যক। নিজের গায়ের জামা, গরম কাপড় প্রভৃতিকে বৃষ্টির জল হইতে বাঁচাইবার জন্য একটি ছাতা ও 'ওয়াটার প্রুফে'র আবশ্যক করে।

(৪) খাদ্য-দ্রব্যাদির মধ্যে প্রধানতঃ নূতন চাউল গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। পুরাতন চাউল খাওয়ার অভ্যাস থাকিলে কিছু চাউল, কিছু মুগের ডাল (কারণ, রাস্তায় একমাত্র মসুর ডাল ভিন্ন কোন ডালই পাইবেন না), কিছু টকের আচার, পুরাতন তেঁতুল, আদা, শুক্না সকল প্রকার মশলা (পিষিয়া লইলে ভাল), পেস্তা, বাদাম, আখরোট, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি কিছু কিছু শুষ্ক খাদ্য, অবস্থাবিশেষে কিছু চিঁড়ে সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত। উৎকৃষ্ট ঘৃত, আটা বা ভেলি গুড় (ইহা তত সুবিধার নহে), তাকলাকোট পর্য্যন্ত বরাবরই পাইবেন। শরীরকে গরম রাখিবার জন্য কিছু চা সংগ্রহ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

(৫) রন্ধনের জন্য আবশ্যক-পাত্রাদি (যতদূর হাল্কা হইতে পারে)—একটি ষ্টোভ, দুই বোতল স্পিরিট, এক টিন কেরোসিন তৈল (টিনগুলি মজবুত অর্থাৎ পেট্রোলের টিন হইলেই ভাল হয়), একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন, একটি টর্চ্চলাইট্, তদুপযোগী অতিরিক্ত 'ব্যাটারী', সম্ভব হইলে আত্ম-

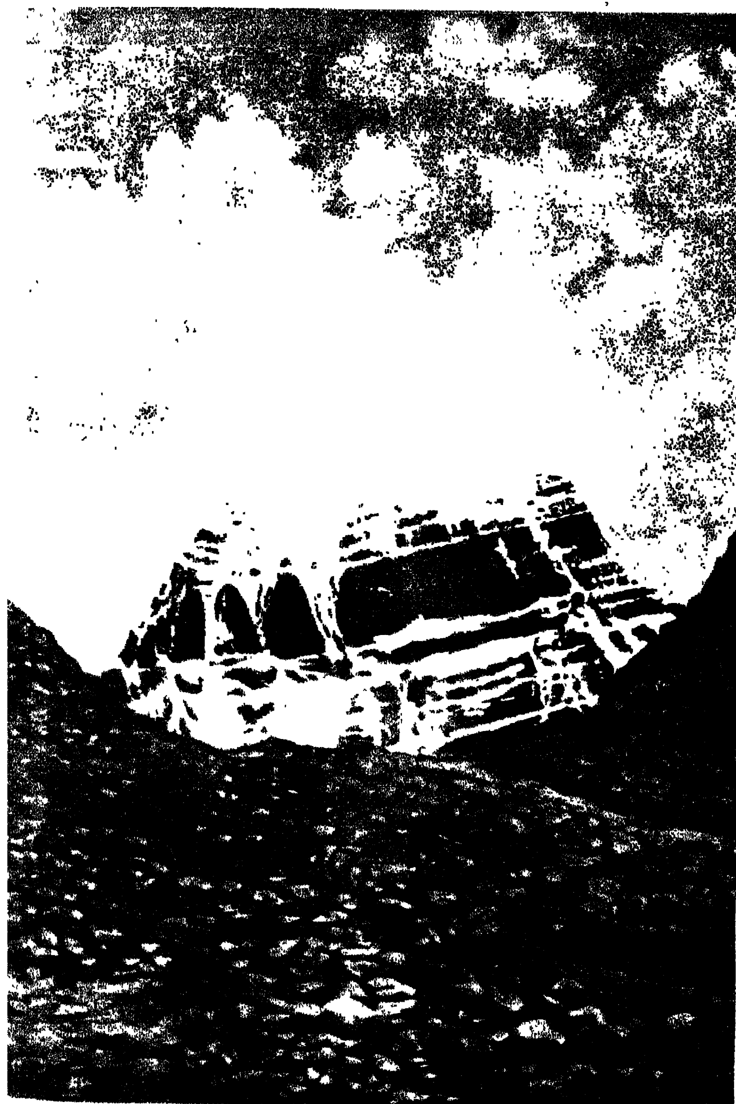
রক্ষার্থে দু' একটি আগ্নেয়াস্ত্র (যথা বন্দুক বা রিভল্‌ভার), পাহাড়ে উঠিবার একটি লম্বা ছড়ি (Stick), এক বাণ্ডিল দেশালাই ও বাতি, কাপড় পরিষ্কার রাখিবার জন্য কিছু সাবান, মাখা বা খাওয়ার অভ্যাস থাকিলে একটিন সরিসার তৈল (পথে ইহার সম্পূর্ণ অভাব), তাহা ছাড়া মুখে মাখিবার "ভেসেলিন্", "পমেটম্" ইত্যাদি (কারণ, তিব্বতের হাওয়ায় মুখ নাক ফাটিয়া অনেক সময়ে রক্ত পর্য্যন্ত বাহির হয়), জ্বর, শর্দ্দি ও আমাশয়ের কিছু কিছু আবশ্যকমত ঔষধপত্র, এক শিশি জম্‌বক্ এবং একটি চসমা (Sun gogles) তিব্বতের রৌদ্রে আবশ্যক করে।

এতগুলি জিনিসপত্রকে ব্যবস্থামত বোঝা তৈয়ার করিয়া, বর্ষার বৃষ্টি মাথায় লইয়া, পার্ব্বত্য বন্ধুর পথ প্রত্যহ দশ পনেরো মাইল হিসাবে অতিক্রম করিবার সাহস ও ধৈর্য্য থাকিলে যাত্রিগণ কৈলাসতীর্থ পর্য্যটনে অবশ্যই সক্ষম হইবেন, সন্দেহ নাই।

এস্থলে আর এক কথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ দুর্গম তীর্থক্ষেত্রে যাইতে গেলে কি পরিমাণ অর্থের আবশ্যক হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে যাত্রার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত হিসাব আমি এই গ্রন্থের শেষভাগে পরিষ্কারভাবে লিখিয়া দিয়াছি, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পাঠকবর্গ যথাকালে আপনারা তাহা সবিশেষ জানিতে পারিবেন।



গোনাইয়ের নিকটে চীরের জঙ্গল



শ্রীকৈলাস

মানস-সরোবর ও কৈলাস

প্রথম পর্ব্ব

আলমোড়ার পথে

বিঘ্নবহুল, দুর্গম গিরিপথে কৈলাসতীর্থ-ভ্রমণের নিমন্ত্রণ আসিল আমার অগ্রজা-স্বরূপা 'দিদির' নিকট হইতে। বীরভূমের জমিদার ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা-সূত্রে আমি দিদি বলিয়াই ডাকিতাম। ইনি কলিকাতা-কাশীপুর-নিবাসী মদীয় সোদরপ্রতিম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় —যাহাদের "শ্রীশ্রী৺কৃপাময়ী"-কালীমন্দির কাশীপুরে চিরপ্রসিদ্ধ, তাঁহারই জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তীর্থভ্রমণে চিরদিনই ইঁহার বিশেষ অনুরাগ। তবে কৈলাসের মত দুর্গম তীর্থ-যাত্রায় একজন বাঙ্গালী-মহিলার আগ্রহ দেখিয়া আমি বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম। বলা বাহুল্য, তাঁহার এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। বহুদিন হইতে মনে মনে যে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, শুভক্ষণে আজ সেই সুদিন সম্মুখে দেখিয়া, এ দুর্গম তীর্থে যাইবার উপযোগী আবশ্যক-দ্রব্যাদি একে একে সমস্তই সংগ্রহ করিয়া লইলাম। দুই পাঁচ দিন মধ্যেই যাত্রার দিন স্থির হইয়া গেল।

মানস-সরোবর ও কৈলাস

সেদিন ৬ই আষাঢ়, ইং ২০শে জুন, বৃহস্পতিবার। প্রভাতে বেনারেস ক্যান্টন্‌মেণ্ট হইতে বেলা ৯।৫৮ মিঃ সময়ে "ডেহ্‌রাদূন-এক্সপ্রেস্" ট্রেণে উঠিয়া আমরা বরাবর কাঠগুদাম উদ্দেশে রওনা হইলাম।

আমরা একত্রে পাঁচজন মাত্র ছিলাম। দিদি, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ, বন্দুক হস্তে তাঁহাদের একজন দরোয়ান—নাম ভূপ সিংহ এবং একটি স্ত্রীলোক সহযাত্রিরূপে আমাদের সহিত ছিলেন। রাত্রি এগারোটা আন্দাজ সময়ে বেরেলী ষ্টেশনে এক্সপ্রেস্ ট্রেণ বদল করিয়া, রাত্রি একটার সময়ে অন্য গাড়ীতে (মিটার গজ) আবার উঠিলাম। ক্রমে পরদিন প্রভাতে আমাদের গাড়ী লালকুঁয়া জংসনে আসিয়া পৌছিল। সেখান হইতে চোখের সম্মুখে দূরে প্রথমেই পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়া সকলেরই প্রাণে যুগপৎ উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি দেখা দিল। ক্রমশঃ পরের ষ্টেশন "হালদুয়ানী"তে গাড়ী পৌছিলে সেখান হইতেই দলে দলে মোটরওয়ালাগণ গাড়ীতে উঠিয়া "কহাঁ যাইয়েগা, মোটর কী কেরায়া" ইত্যাদি প্রশ্নে আমাদিগকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। আমরা পাঁচজন যাত্রী, সঙ্গে বিস্তর লগেজ ছিল। রেল কোম্পানীকে কাঠগুদাম পর্য্যন্ত পাঁচ খানা টিকিটে ছয় টাকা হিসাবে ত্রিশ টাকা ভাড়া গণিয়াও, আমাদিগকে অতিরিক্ত আট টাকা দুই আনা লগেজ ভাড়া দিতে হইয়াছিল। লগেজের বহর দেখিয়া কোন মোটরওয়ালা আলমোড়া পর্য্যন্ত মানুষ পিছু ভাড়া তিন টাকা এবং মণ পিছু লগেজ ভাড়া দেড় টাকা চাহিয়া বসিল। শেষে একজন, লগেজ সমেত মানুষ পিছু তিন টাকা হিসাবে ভাড়া চুক্তি করিয়া তবে আমাদিগকে নিষ্কৃতি দিল। কাঠগুদাম ষ্টেশনে নামিব শুনিয়া, সে সেখানে মোটর লইয়া অপেক্ষা করিবে, এ কথা পুনঃ পুনঃ জানাইয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া আমাদের গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইল। বেলা সাতটা আন্দাজ সময়ে কাঠগুদাম ষ্টেশনে

আমাদের গাড়ী প্ল্যাটফরমের নিকটে একবারে নিশ্চল হইয়াই দাঁড়াইল। ষ্টেশনে যে হিসাবে যাত্রীদিগকে নামিতে দেখিলাম, তাহাতে তাঁহাদের বোঝা লইবার কুলী সে অনুপাতে খুব কম বোধ হইল। এজন্য মাল উঠাইতে কিছু বিলম্ব ঘটিল। অবশেষে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মোটর-বাসের মস্তকে কুলীর দ্বারা মাল উঠাইয়া লইয়া, অন্য যাত্রী ভরিয়া তবে মোটর ছাড়িবে, এ কথা জানিতে পারায়, আমরা সকলেই নিকটস্থ একটি পার্ব্বত্য নদীতে যথাশীঘ্র স্নানাদি সমাপন করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বেলা সাড়ে আটটা আন্দাজ সময়ে মোটর ছুটিল।

কাঠগুদাম হইতে আলমোড়া একাশী মাইল দূরে অবস্থিত। এই দীর্ঘ পথ পাহাড়ের পাশ দিয়া গিয়া উপরে উঠিয়াছে। আমাদের মোটর এইরূপে পাহাড়ের তলদেশ হইতে ক্রমশঃ পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। চোখের সম্মুখে প্রতি মিনিটেই যেন অভিনব রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি, এরূপ মনে হইতেছিল। সতেরো শত ফুট উচ্চ হইতে দুই হাজার ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত পাহাড়গুলি অতিক্রম করিবার সময়ে, আশে-পাশের দৃশ্যগুলি কতই মধুর ও মনোরম বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা সুকঠিন। দার্জ্জিলিং যাইবার সময়ে ছোট ছোট ট্রেণগুলি যখন পাহাড়ের উপর ক্রমশঃ উঠিতে থাকে, সে সময়কার আশে-পাশের দৃশ্য যেমন দেখিতে সুন্দর লাগে, তাহার তুলনায় এ দৃশ্য আরও নয়নানন্দকর মনে হয়। বিশেষতঃ, বর্ষার সূচনায় কোথাও বা কোন পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়া, কোথাও ঝরণার ঝর্-ঝর্ প্রবাহ, কোথাও বা নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ বৃক্ষের শ্রেণী নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে যেন চাহিয়া চাহিয়া আমাদের গতি নিরীক্ষণ করিতেছে। কেবল একটা বিষয়ে মনে একটু অশান্তি পোষণ করিতে হইয়াছিল। প্রতি মিনিটে পাহাড়ের প্রতি বাঁকে মোটর ঘুরিয়া যাইবার সময়, অপর দিক হইতে যদি মোটর

সম্মুখে আসিয়া ধাক্কা দেয়, তবে আমাদের কি দশা হইবে, তাহারই চিন্তা। হয় ত আমাদের মোটরসহ আমরা একবারে দশ তলা সমান নীচে পড়িয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইব। এ কথা মনে করিবার হেতু, মোটরওয়ালা পাহাড়ের বাঁকের মুখেও বাঁশী বাজাইতে একবারে নারাজ দেখিলাম। হয় ত, সে নিজেকে একজন বেশী চালাক বলিয়াই মনে করিয়া থাকে! মোটরকে ক্রমাগত পাহাড়ের ঘূর্ণিপাকে ঘূর্ণায়মান দেখিয়া, কোন কোন যাত্রীর বমি হইবার উপক্রম দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক্, বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে আমাদের মোটর "ভাওয়ালী" অতিক্রম করিয়া আগে চলিল। মধ্যাহ্ন ঠিক সাড়ে বারোটা আন্দাজ সময়ে "রাণীক্ষেত" গিয়া পৌছিলাম। তথা হইতে মধ্যে বামদিকে নাইনিতাল যাইবার রাস্তা ছাড়িয়া দ্রুতগতি মোটর সন্ধ্যা পাঁচটা আন্দাজ সময়ে আলমোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, যাত্রার প্রারম্ভে এই মহাপুরুষের দর্শনলাভ শুভ লক্ষণ বলিয়া সকলের ধারণা জন্মিল। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী এবং ড্রাইভারের পার্শ্বে অপর একজন উপবিষ্ট ছিলেন। পরে শুনিয়াছি, ইনি অপর কেহ নহেন, তাঁহারই পুত্র। যাহা হউক্, আলমোড়ায় প্রবেশকালে মোটর-যাত্রীদের প্রত্যেককে আট আনা করিয়া 'টোল' বা পথকর দিতে হইল। আমরা একবারে "এম্পায়ার ইণ্ডিয়ান হোটেলে"র সম্মুখে গিয়া 'বাস' হইতে নামিয়া হোটেলওয়ালার সহিত উক্ত হোটেলের দ্বিতলের দুইটি বড় বড় আস্‌বাবসহ কক্ষ এবং নিজেদের পাক করিয়া লইবার একটি রান্নাঘর, প্রতিদিন দুই টাকা চারি আনা হিসাবে ভাড়া চুক্তি করিয়া সেদিনকার মত সেখানে আশ্রয় লইলাম।

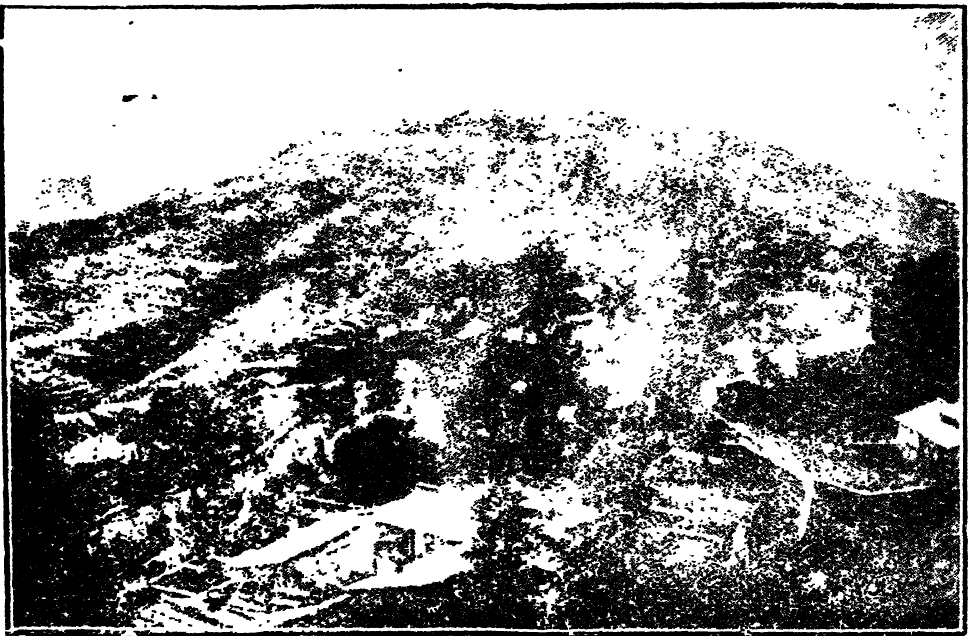
কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও জলযোগাদির পরে কৈলাসযাত্রীরা কেহ আসিয়াছেন কি না জানিবার জন্য একবার "রামকৃষ্ণ-কুটীরে" যাওয়া আবশ্যক

মনে করিয়া, অনুসন্ধান করিয়া প্রায় মাইলখানেক দূরে সেখানে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম যে, উত্তরপাড়া হইতে তিনটি ভদ্রলোক, নাম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ঘোষ এবং পাবনা হইতে একটি ভদ্রলোক, নাম শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র রায় কৈলাসযাত্রী হইয়া আলমোড়ায় আসিয়া কয়দিন হইতে অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা ছাড়া আশ্রম হইতে পাঁচজন স্বামীজীও—নাম (১) স্বামী অনুভবানন্দ পুরী (ধারচুলা তপোবনের সেক্রেটারী), (২) শঙ্কর-নাথ স্বামী, (৩) বিশ্বনাথ স্বামী, (৪) অপর্ণানন্দ স্বামী এবং (৫) শ্রীমৎ কালিকানন্দ গিরি এবারে এই তীর্থপর্য্যটনে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আগামী পরশ্ব যাত্রার দিন স্থির হইয়াছে ইত্যাদি সংবাদ একজন স্বামী-জীর প্রমুখাৎ অবগত হইয়া, যখন সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরিয়া আসি-লাম, তখন দেখি, কৈলাসযাত্রীর দল প্রায় সকলেই আমাদের হোটেল গুলজার করিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

এত দূরদেশে আসিয়া একই যাত্রার যাত্রিরূপে এতগুলি স্বজাতির দল পাইয়া, সে দিন হৃদয়ে কতদূর সাহস ও বল পাইয়াছিলাম, তাহা পাঠকবর্গকে লিখিয়া জানাইবার নহে। অবশ্য, আসিবার পূর্ব্বে আমাদের আগমনের তারিখ আলমোড়ায় "রামকৃষ্ণ-কুটীরে" শ্রীমৎ মেঘেশ্বরানন্দ স্বামীজীকে এবং ধারচুলা তপোবনের ডাক্তার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পালধি মহাশয়কে পত্রে জানান হইয়াছিল। তদনুসারে তপোবনের সেক্রেটারী মহারাজ (স্বামীজী) এই সকল যাত্রীকে লইয়া আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সকলের সহিত আলাপ-পরিচয় শেষ হইলে যাত্রা করিবার কথা উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কি কি জিনিষপত্রাদি খরিদ করা বাকী আছে এবং পরদিনেই বা কি কি করা আবশ্যক, সমস্ত জানিয়া লইলাম। আমরা কি ভাবে যাইব, এ প্রসঙ্গ উঠিলে, দিদি এবং তাঁহার

সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটির জন্য দুইখানি ডাণ্ডি এবং তাহার বাহক বারো জন কুলীর (প্রতি ডাণ্ডিতে ছয় জন কুলী হিসাবে) আবশ্যক, এ কথা শ্রীমৎ অনুভবানন্দ স্বামীজী শুনাইলেন। বাকী তিনজনের মধ্যে এক ভূপ সিং (দরোয়ান) ব্যতীত আমাদের দুইজনকেই পদব্রজে না গিয়া ঘোড়ায় যাইবার পরামর্শ দিলেন। এজন্য দুইটি সওয়ার-ঘোড়ারও ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

পরদিন অর্থাৎ ৮ই আষাঢ়, ইং ২২শে জুন, শনিবার প্রভাতে এল্. আর. শাহ কোম্পানীর দোকান হইতে দুইখানি ডাণ্ডি বারো টাকা হিসাবে চব্বিশ টাকায় খরিদ করা হইল। ডাণ্ডি ভাড়া লইতে গেলেও প্রায় এইরূপই খরচ লাগিয়া থাকে, এজন্য স্বামীজীর কথামত ডাণ্ডি খরিদ করিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হইল। এক্ষণে উহার বাহক সংগ্রহের জন্য স্বামীজী মহারাজ আমাকে এবং শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া স্থানীয় তহশীলদারের বাটীতে লইয়া গেলেন। তহশীলদার লোকটি খুবই সজ্জন বলিয়া বোধ হইল। যথোচিত শিষ্টাচারের পরে তিনি বেলা দশটার সময়ে তহশীলদারী কাছারীতে কুলীদিগের জন্য অগ্রিম টাকা জমা দিতে আমাদিগকে ডাকিলেন। আমরা যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হইলে, তিনি সরকারী নিয়মানুযায়ী আলমোড়া হইতে ধারচুলা তপোবন পর্য্যন্ত নব্বুই মাইল পথে ডাণ্ডি-বাহক ছয় জন কুলীর ভাড়া চুয়ান্ন টাকা এক আনা হিসাবে দুইখানি ডাণ্ডির দরুণ মোট এক শত আট টাকা দুই আনা জমা করিয়া লইলেন। পথের স্থানে স্থানে যে সকল "পাটোয়ারী" আছে, তাহাদিগকে আমাদিগের সম্বন্ধে যত্ন লইবার জন্য একখানি মোহরযুক্ত পরোয়ানা-পত্রও লিখিয়া দিলেন। সেই পত্র এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ সঙ্গে করিয়া লইলাম। সরকারী নিয়মানুসারে ধারচুলা পর্য্যন্ত সওয়ার-ঘোড়ার ভাড়া প্রায় পঁয়তাল্লিশ টাকা পড়ে। ইহা বড় বেশী মনে হওয়ায়,



আলমোড়া ৭

বিষ্ণু সিং নামক জনৈক প্রাইভেট্ ঘোড়াওয়ালাকে আমাদের দুইজনের জন্য দুইটি ঘোড়া প্রত্যেকটি ছাব্বিশ টাকা হিসাবে ভাড়া চুক্তি করিয়া অগ্রিম দুই টাকা বায়না দিয়া ঠিক করিয়া লওয়া হইল।

বিংশ শতাব্দীর "একটা নূতন কিছু করার" যুগে, "পদব্রজে ভূ-প্রদক্ষিণ" করিবার সাহস লইয়া সওয়ার-ঘোড়ার জন্য নিজ ব্যয়ে এতগুলি টাকা ভাড়া গণিবার আমার আদৌ ইচ্ছা না থাকিলেও স্বামীজী মহারাজের পরামর্শানুযায়ী এ বিষয়ে মুক্তহস্ত হইতে হইল। যাহা হউক্, বৈকালে দোকান হইতে পথে খরচের জন্য নোটের পরিবর্ত্তে সমস্তই রূপার টাকার বোঝা করিয়া লইতে হইল। পাহাড়ে উঠিবার জন্য তিন টাকা মূল্যে তিন গাছি লাঠি এবং সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য দশ সের আলু খরিদ করিয়া রাত্রিতে সব বোঝা ঠিক করিয়া রাখিলাম। আমাদের ছয় মণ আন্দাজ লগেজ হওয়ায় স্বামীজী মহারাজ তিনটি ভারবাহী ঘোড়ার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতি ঘোড়া দুই মণ হিসাবে মাল লইয়া যাইবে। প্রতি মণ সাত টাকা হিসাবে দর চুক্তি হইল। বলা বাহুল্য, বোঝা লইবার জন্য সকল যাত্রীরই এই প্রকারে ঘোড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

এইখানে আলমোড়া সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এটি "ছোট-খাটো" সহর, পাঁচ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানে বাটীঘর কোনটিই সমতলে দেখিলাম না। ঘরের ছাদে টিন বা পাথর। কাঠের শিল্প কিছু কিছু আছে; অন্য স্থাপত্য-শিল্প নাই। দুই তিনটি হোটেল আছে। এখানকার আলমোড়া বাজার ও মিউনিসিপ্যালিটীর অবস্থা মন্দ নহে। বাজারে খাবার দ্রব্য মিষ্টান্নাদি ভাল ঘৃতেই তৈয়ারী বলিয়া মনে হয়। ভুট্টার আকারের একপ্রকার ক্ষীরের সামগ্রী খাইতে অতি উপাদেয় লাগিল। মিউনিসিপ্যালিটী প্রায় সকল বাটীতেই পাইপের

দ্বারা ঝরণার জল ধরিয়া আনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল। দুই তিনটি ভাল "স্যানিটেরিয়াম্" আছে। আবার এক ধারে ক্ষয়কাসরোগীদের থাকিবার কয়েকটি স্বাস্থ্যাগারও রহিয়াছে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ সুন্দরী, লজ্জাশীলা এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায়ই থাকে। দেখিলে স্বতঃই সম্ভ্রম করিয়া চলিতে ইচ্ছা করে। দূর হইতে এই সহরটি দেখিলে, পাহাড়ের গায়ে রঙ্গীন ছবির মতই বোধ হইয়া থাকে।

হোটেলে সে দিনও রাত্রি কাটাইতে হইল। রাত্রিকালে এখানে যথেষ্ট "পিশুর" উপদ্রব থাকায় সকলেরই নিদ্রায় বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

আলমোড়া হইতে ধারচুলা

পরদিন অর্থাৎ ৯ই আষাঢ়, ইং ২৩শে জুন, রবিবার—প্রত্যুষেই হোটেলওয়ালার দুই দিনের ভাড়া চুক্তি করিয়া দিলাম। বেলা সাতটার সময়ে ডাণ্ডির কুলীরা হাজির দিল। কতক কুলী রাত্রিতেই আসিয়া আমাদের হোটেলের বারান্দায় শয়ন করিয়াছিল। আমাদের দুইজনের দুইটি সওয়ার-ঘোড়া এবং বোঝা লইবার জন্য তিনটি ভারবাহী ঘোড়াও একে একে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৈলাসপতির উদ্দেশে আমরা সকলেই প্রণাম করিয়া, একে একে যাত্রার পথে অগ্রসর হইলাম। যাইবার পূর্ব্বে বোঝাগুলি ওজন করিবার সময়ে, নিজের শরীরও একবার ওজন করিয়া নোটবুকে লিখিয়া রাখিয়া দিলাম।

দিদি ও সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটিকে ডাণ্ডিতে উঠাইয়া বাহকগণ চলিয়া গেল। স্বামীজীরাও অন্যান্য যাত্রিগণসহ আপন আপন স্থান হইতে প্রত্যুষেই বাহির হইয়া গিয়াছেন। কথা আছে, এই ভাবে অগ্রসর হইলেও সকল যাত্রী ধারচুলায় গিয়া মিলিয়া সেখান হইতে একসঙ্গেই যাত্রা করিবেন। আমার সহযাত্রী শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের অশ্বপৃষ্ঠে যাওয়ার অভ্যাস যথেষ্ট আছে, তাই তিনি ঘোড়-সওয়ারের মত পাহাড়ী পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে কিছুমাত্র কষ্টানুভব করিলেন না; আর আমি এ বিষয়ে একবারে অনভ্যস্ত, তায় পাহাড়ী পথ—আদৌ সমতল না হওয়ায় প্রথমে বড়ই ভীত ও বিব্রত হইয়া পড়িলাম এবং আমাদের জাতির বাল্যকাল হইতে সাহেবদের মত অশ্বারোহী হওয়ার শিক্ষা কেন এ দেশে

প্রসারলাভ করে নাই, এজন্য মনে মনে সমাজকে এ সময়ে একবার তিরস্কার করিতেও ছাড়িলাম না। তাহা হইলেও ঘোড়ার মালিক ঘোড়াকে ধরিয়া, ধীরে ধীরে সাবধানে আমাকে লইয়া যাইতেছিল।

এই প্রকারে আলমোড়া সহর হইতে বাহির হইয়া, পাহাড়ের পাশ দিয়া দিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তিন চারি মাইল আসিবার পরে "চিতাই" নামক একটি গ্রামে আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বাধ্য হইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া আমরা দুই-জনেই একটি দোকান-ঘরে আশ্রয় লইলাম। দোকানে গরম দুগ্ধ ছিল। দুইজনেই অর্দ্ধসের হিসাবে পান করিয়া লইলাম। পরে বৃষ্টির প্রবলধারা একটু কমিয়া আসিলে রাস্তার অতি পিচ্ছিল অবস্থা এবং দেড় মাইল আন্দাজ পথ উত্রাই নামিতে ঘোড়াকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে জানিয়া, ঘোড়াওয়ালার কথামত এই পথ আমরা পদব্রজেই নামিয়া আসিলাম। আলমোড়া হইতে কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও বা পদব্রজে প্রায় আট মাইল পথ আসিয়া "বারিছিনা" নামক একটি গ্রামে বেলা সাড়ে এগারোটা আন্দাজ সময়ে উপস্থিত হইয়া স্নান ও কিছু জলযোগ করা গেল। মধ্যে এক অভাবনীয় বিপদ্ উপস্থিত হইল। চিতাইয়ের উত্রাই নামিবার সময়ে, দিদির ডাণ্ডিটি পথের মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে ভাঙ্গিয়া গেল। এইটুকু কুশল ছিল, ইহাতে তাঁহার তাদৃশ আঘাত লাগে নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি এই পথ বরাবর পদব্রজে ভূপ সিংএর সহিত আসিয়া আমাদিগকে বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। ভাগ্যক্রমে বারি-ছিনায় ভাড়া খাটাইবার একটি নূতন ডাণ্ডি পাওয়া গিয়াছিল। তপোবনের সেক্রেটারী স্বামীজী মহারাজও সে সময়ে অন্য যাত্রীদিগের সহিত এখানে উপস্থিত থাকায়, তিনি এই ডাণ্ডিখানি প্রত্যহ আট আনা হিসাবে ভাড়া চুক্তি করিয়া দিদির জন্য ব্যবস্থা করিয়া আমাদিগকে নিশ্চিন্ত

করিলেন। ভাঙ্গা ডাণ্ডিটি সেইখানে ডাণ্ডিওয়ালার জিম্মায় রাখিয়া দিয়া বারিছিনা হইতে রওনা হইলাম। এ যাবৎ পাহাড়ের গায়ে গায়ে চীর-গাছের শ্রেণী দেখিয়া আসিতেছিলাম। এই চীর-গাছ হইতে শুধু যে তক্তা তৈয়ারী হইয়া থাকে, তাহা নহে ; ইহা হইতে আল্‌কাতরা এবং টার্পেন্‌টাইন্‌ তৈলও প্রস্তুত হয়। এজন্য গভর্ণমেণ্টের ইহা হইতে প্রতি বৎসরেই যথেষ্ট টাকা আয় হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে পথের ধারে এক একটি ঝরণার ধারা নামিয়া আসিয়া, পথিকের শ্রান্তি-পিপাসা দূর করিতেছে। এইরূপে কিছুক্ষণ আসিবার পরে বেলা সাড়ে বারোটা আন্দাজ সময়ে একটি উচ্চ পাহাড়ের চড়াই আরম্ভ করিতে হইল। আমাদের ঘোড়াও ধীরে ধীরে আমাদিগকে উপরে উঠাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, অনভ্যস্ত "ঘোড়-সওয়ার" আমি লাগাম ধরিয়া, ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে বসিয়া খুবই সন্তর্পণে, ঘোড়াওয়ালার উপদেশমত আগে চলিতেছি। এই পাহাড়ের চারিদিকেই শুধু চীর-গাছ কেন, অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ পাহাড়ী গাছও যথেষ্ট থাকায়, দিবা দ্বিপ্রহরে পথ পর্য্যন্ত অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল "ধ্বস্তাধ্বস্তি"র পরে পরিশ্রান্ত ঘোড়া, চড়াই শেষ করিয়া বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে "ধলচিনারে" আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাণ্ডিওয়ালারা দিদি ও সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটিকে আগেই এখানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল।

এই ধলচিনারে একখানিমাত্র দোকান। দোকানে আটা, ঘৃত, মসূর ডাল, নূতন চাউল, দুই এক রকম মশলা ও পেঁয়াজ পাওয়া যায়। যাত্রীদিগের থাকিবার একটী ধর্ম্মশালা আছে। কিন্তু সে ঘরে মানুষ থাকিতে পারে, আমাদের এ বিশ্বাস হইল না। অশ্বশালা বলিলেই ঠিক হয়। তবে শুনিলাম, এখানে একটি ডাক-বাংলো আছে। দুর্ভাগ্য-

ক্রমে সে সময়ে আস্‌কোটের রাজওয়ারা সাহেব আসিয়া বাংলোখানি অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা সাত হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানে পাহাড়ের গায়ে অভ্রের মত বস্তু দেখা গেল। রান্না-ভাত খাইতে প্রায় চারিটা বাজিয়া গিয়াছিল। এ সময়ে আমেদাবাদ হইতে একজন কৈলাসযাত্রী, নাম শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভি. কৌশিক পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, আমাদের দরোয়ান ভূপ সিং পরিশ্রান্ত হইয়া চড়াইয়ের অর্দ্ধপথে বসিয়া পড়িয়াছে ; আর আসিতে না পারায় তাঁহার দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়াছে। স্বামীজীরা ইতিপূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। পণ্ডিতজীর মুখে এ কথা শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রে গিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে ভূপ সিংকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রিতে আশ্রয়-স্থান না পাওয়ায় বাধ্য হইয়া তাঁবু খাটাইতে হইয়াছিল। এখানে খুবই জোঁকের উপদ্রব দেখিলাম। রাত্রিতে যথেষ্ট শীতানুভব হইয়াছিল।

প্রত্যূষে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, আমাদের তাঁবু বেশ ভিজিয়া রহিয়াছে। রাত্রিকালে বৃষ্টি পড়িয়াছিল, কিন্তু সমস্ত দিন পরিশ্রমের পরে নিদ্রার আতিশয্যে আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারি নাই। যাহা হউক্, তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া সকলেই পূর্ব্বদিনের মত বিছানাপত্র আস্‌বাবাদি বাঁধিয়া লইলাম এবং ঘোড়াওয়ালাকে বোঝা বুঝাইয়া দিয়া নিজেদের ঘোড়ায় একে একে উঠিয়া পড়িলাম। ডাণ্ডির কুলীগণ দিদিদের লইয়া আগেই অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের আস্‌বাবাদি বাঁধিয়া ব্যবস্থা করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া পড়ায়, স্বামীজীরাও অন্য যাত্রিগণের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছেন। আমরা দুইজনেই সর্ব্বশেষে রওনা হইলাম। ধলচিনার হইতে এবারে ক্রমশঃ উতরাইয়ের পথে আমরা নামিয়া চলিতেছি। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই দূরে অভ্রভেদী

হিমালয়-পর্ব্বতের চূড়ায় চূড়ায় তুষাররাশির উপরে প্রভাত-সূর্য্যের তরুণ কিরণপাতে উভয়েরই দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। সে কি স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর দৃশ্য! তন্ময় হইয়া দুইজনেই সেই বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্য্য পান করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, ঐরূপ কিরণ-মাখা তুষার-পাহাড়ের মাঝখানে, হয় ত সেই কৈলাসপুরী লুকানো আছে। আর ভূতভাবন কৈলাসপতি—এ যুগে, মর-জগতের পাপান্ধকারে নিমজ্জিত মানবগণের দৃষ্টি এড়াইয়া, ওইখানেই গিয়া নিশ্চিন্ত-মনে বিরাজ করিতেছেন। সেদিন-কার সেই নয়ন-মনোহর দৃশ্যের স্মৃতি জীবনের মাঝে চিরদিনই একটি স্মরণীয় দিন হইয়াই রহিয়া গেল। নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া তুষারকিরীটী শৃঙ্গগুলি স্তরে স্তরে সাগরের ঊর্ম্মিমালার ন্যায় পর পর দেখা যাইতেছিল। একের পর একটী, তার পরে আর একটি, এইরূপ কত শৃঙ্গই না দূরে অনন্তের কোলে ক্রমশঃ মিশিয়া রহিয়াছে। যাহা হউক্, এইরূপে একে একে কত পাহাড় ঝরণা অতিক্রম করিয়া বেলা এগারোটা আন্দাজ সময়ে আমাদের ঘোড়া “সরযূ-তটে” আসিয়া উপস্থিত হইল। এই স্থানের অপর একটি নাম শেরাঘাট। ধলচিনার হইতে ইহার দূরত্ব এগারো মাইল হইবে। প্রথম বর্ষায় এই নদীর কর্দ্দমাক্ত স্রোতোধারা বহিয়া যাইতেছে। ইহার উপরে একটি লৌহনির্ম্মিত সুন্দর দোদুল্যমান সেতু পার হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নীচে অবতরণ করিলাম। তীরে নানাবর্ণের ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সম্মুখেই একটি দোকান। দোকানে নূতন চাউল, মসূর ডাল, চিনি ও দুই এক প্রকার মশলা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। দুই তিন ঘর মুসলমানের বসত-বাটী রহিয়াছে। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে একটি কলমের আমবাগানে বড় বড় ফোজলীর আকারের আম দেখিয়া খরিদ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। এক টাকায় বত্রিশটি আম পাওয়া গেল, কিন্তু সবই কাঁচা। দুর্ভাগ্যের

বিষয়, সে আম পাকা খাওয়া ঘটে নাই। ভাতে দিয়াই (লবণ-সংযোগে) খাইতে হইয়াছিল। এই স্থানের তিন দিকেই উচ্চ পাহাড়ের বিস্তৃতি থাকায়, বায়ুর প্রবেশ-পথ একপ্রকার রুদ্ধ হইয়াই আছে। অসহ্য গরম বোধ হওয়ায় আমরা সকলেই এখানে নদীতে অবগাহন-স্নান করিলাম। পরে আহারাদি সমাপন করিয়া বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে এখান হইতে রওনা হইলাম। যাত্রার কিছু পূর্ব্বে "সিয়ারাম" নামক একজন পঞ্জাবী সাধুর অধীনে একটি পঞ্জাবী স্ত্রীলোক এবং সাত আট জন পঞ্জাবী এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিয়ারাম ও স্ত্রীলোকটি ঘোড়ার পৃষ্ঠে এবং অপরাপর পঞ্জাবীগণকে পদব্রজে আসিতে দেখিলাম। বলা বাহুল্য, ইঁহাদেরও কৈলাস যাইবার ইচ্ছা শুনিলাম। ধারচুলা পর্য্যন্ত এই পথে কৈলাসযাত্রীর মধ্যে কোন দল অগ্রে, কোন দল বা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেও, ধারচুলা হইতে সকলের এক সঙ্গেই যাওয়া হইবে, এ কথা তপোবনের সেক্রেটারী স্বামীজী মহারাজ ইঁহাদিগকেও আলমোড়ায় জানাইয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহারা আলমোড়া হইতে একদিন পরে বাহির হইয়াছেন।

সরযূতট হইতে আবার ক্রমশঃ চড়াই আরম্ভ হইল। এই নদীর উভয় পার্শ্বেই শুধু উচ্চ পাহাড়; সেই পাহাড়ে শুধু অসংখ্য চীর-গাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই সকল গাছের পাশে পাশে কতকগুলি খেজুর গাছের মত বৃক্ষও দেখা যায়। নদীর ধার দিয়া প্রায় তিন মাইল পথের চড়াই অতিক্রম করিয়া "নাড়ুয়া-ঘোড়" নামক স্থানে চড়াইয়ের শেষ হইল। এইখানে একটি মুসলমানের বড় দোকান দেখিলাম। তাহাতে মুদীখানার দ্রব্য হইতে মনিহারী দ্রব্য ও সঙ্গে সঙ্গে কাপড়, জামা ইত্যাদি তৈয়ারী হইয়া বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে। দোকানের মালিক খুবই বিনয়ী ও সজ্জন বলিয়া বোধ



সরযূ নদী



গোনাইয়ের নিকটে একটি পুল

হইল। আমরা কৈলাসযাত্রায় বাহির হইয়াছি এ কথা শুনিয়া, সে আমাদিগকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা জানাইল, এবং দোকানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেও অনুরোধ করিল। এ কথা সে কথা তুলিয়া আমাদের "গোনাই" নামক স্থানে রাত্রিযাপনের সংকল্প শুনিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার ভ্রাতার নিকটে একখানি পত্র লিখিয়া দিল। আমরা যাহাতে গোনাইয়ে তাহারই বাটীতে রাত্রিতে আশ্রয়লাভ করি, এ বিষয়ে তাহার যথেষ্ট আগ্রহ দেখিলাম। এই নাড়ুয়াঘোড় হইতে এবারে উত্‌রাই পড়িল। উত্‌রাইয়ের একস্থানে নাতিপ্রশস্ত ঝরণার উপরে একটি পুলের ভাঙ্গা অবস্থা দেখিয়া আমাদের ঘোড়া জলের উপর দিয়াই পার হইয়া গেল। সেখানে এক হাঁটুর বেশী জল ছিল না। এইরূপে আরও দুই মাইল পথ আসিয়া গোনাই পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাত্রিকালে সেই মুসলমান-বন্ধুরই বহির্বাটীতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এখানে দুইখানি দোকান রহিয়াছে। দোকানে আটা, ঘৃত, পেঁয়াজ ও দুই এক প্রকার মশলা পাওয়া যায়। তবে এখানে খুবই জলকষ্ট। প্রায় চারি ফার্লং দূরে একটিমাত্র ঝরণার ক্ষীণ ধারা গ্রামের লোককে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক্, অদ্য দ্বিতীয় দিনে ষোল মাইল পথ আসা হইল।

পরদিন অর্থাৎ ১১ই আষাঢ়, ইং ২৫শে জুন, মঙ্গলবার প্রভাত হইতে না হইতেই আস্‌বাবপত্রাদি বাঁধিয়া লইয়া, পাঁচটার পূর্ব্বেই আমরা যাত্রার পথে বাহির হইলাম। এই পথে অনেকগুলি ছোট ছোট ঝরণা নদীর আকারে প্রবাহিত হইতেছিল। দুই তিনটি জলস্রোতে চালিত জাঁতার কলও (গম পিষিবার) দেখিয়া লইলাম। জলের অনর্গল স্রোত জাঁতার কলের উপরে এমনভাবে পড়িয়া থাকে, যাহাতে উহার চাপে সেই কল নিয়ত ঘুরিতে থাকে। সহজে এই প্রকার গম পিষিবার উপায় দেখিয়া,

এই অশিক্ষিত পাহাড়ী-জীবদের একটু প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পথে একটি ঝরণার উপরে লৌহ-সেতুর অবস্থা খুবই শোচনীয় মনে হইল। বেলা সাড়ে এগারোটা আন্দাজ সময়ে একটি চড়াইয়ের মুখে ঝরণার ধারায় স্নানাদি এবং সঙ্গে সঙ্গে জলযোগ সারিয়া লইয়াছিলাম। এইরূপে প্রায় আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "গাদি-গাড়" নামক স্থানে পৌছিলাম। পথে আসিতে আসিতে স্থানে স্থানে কেবল ভাঙ্গের জঙ্গল, কোথাও শুধু বিছুটীর জঙ্গল আবার কোথাও বা মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের কোলে কোলে বা নদীর ধারে ধারে ধানের ক্ষেত এবং কাঁচকলা-গাছের চাষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ঝরণার জলই এই সকল চাষ-আবাদের প্রধান উপায়। গাদি-গাড়ে একটিমাত্র দোকান ও দোকানীর থাকিবার কয়েকখানি ঘর ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাত্রীরা এখানে ইচ্ছা করিলে বিশ্রামের জন্য একটি বড় ঘর পাইতে পারেন। এখান হইতে যে রাস্তায় আমরা যাইতেছিলাম, তাহার দুই দিকেই বরাবর উঁচু পাহাড়। আবার রাস্তার পার্শ্বেই পাহাড়ের কোল দিয়া একটী নদী ঝর্-ঝর্ শব্দে অবিরাম দুই পাহাড়কে প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। চীর-গাছ-বেষ্টিত দুই পাহাড়ের মাঝখানে এই জন-বিরল পথে পথিকদের যাইবার সময়ে নদীর ঝর্-ঝর্ শব্দ অনেক সময়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

যাহা হউক্, গাদিগাড় হইতে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আবার সম্মুখে দুই মাইল চড়াই পড়িল। দশ মাইল পথ চলিয়া আসার পরে শেষের দিকে এই দুই মাইল চড়াই উঠিতে আমাদের ঘোড়া দুইটিও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বেলা সাড়ে বারোটা আন্দাজ সময়ে আমরা এবারে "বেরীনাগে" আসিয়া পৌছিলাম।

বেরীনাগ একটি সম্পন্ন গ্রাম। এই গ্রামে সম্পন্ন গৃহস্থের বাটী কম



রাম গঙ্গার পুল (থলে)　১৯

রহে। গ্রামে চারি পাঁচ খানি দোকান আছে। কোনটিতে মনিহারী দ্রব্য সাজান রহিয়াছে; কোনটিতে বা চাউল, ডাল, মশলা, ঘৃতাদি বিক্রয় হইতেছে; কোনটিতে বা হালুইকরের দোকানের মত জিলিপী, পেঁড়া প্রভৃতি মিষ্টান্ন রহিয়াছে। তাহা ছাড়া "আরি" নামক একপ্রকার ফল (খাইতে অম্ল-মধুর) ও ন্যাসপাতি দোকানে বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে। এই গ্রামে চায়ের চাষ হইতেছে দেখিলাম। এতদূরেও চা-তৈয়ারী ব্যাপার রহিয়াছে শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। দ্বিপ্রহরে আসিয়া এখানকার স্কুল বাড়ীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। এই স্কুলে প্রায় দেড় শত জন ছাত্র অধ্যয়ন করে শুনিলাম। আশে-পাশের গ্রাম হইতেও ছাত্রের সমাবেশ হয়। ছাত্রদিগকে হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এজন্য তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এই স্কুলে হেডমাষ্টার মহাশয় আমাদিগকে খুবই যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি স্কুলের মধ্যেই রাত্রিযাপনের অনুমতি দিলেন। আমরা প্রথমে পৌঁছিয়া স্কুলের বাহিরে একটি গাছতলায় চৌতারার পার্শ্বে রান্নার আয়োজন করিলাম। দোকানে ভাল চাউল না পাওয়ায়, বিজয়লাল নামক এক ব্যক্তি খুব সুগন্ধিযুক্ত "বাসমতী" চাউল আমাদের রান্নার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এ পার্ব্বত্যপ্রদেশে পথিকদের প্রতি ইঁহাদের এ সহানুভূতি বড়ই আনন্দজনক সন্দেহ নাই। এখানে একটিমাত্র ঝরণার ধারা আছে। এজন্য যত্ন করিয়া সরকার বাহাদুর, পাইপ সংযোগে সেই ধারা হইতে জল আনিবার একটি লোহা 'টঙ্কি' (ঢাকা চৌবাচ্চার মত) তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। ঝরণার জল সেই টঙ্কিতে অনবরত জমিয়া থাকে। গ্রামবাসীরা সেই জল সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আলমোড়া হইতে আজ পর্য্যন্ত তিন দিনে বিয়াল্লিশ মাইল পথ অগ্রসর হইয়াছি।

বেরীনাগে ডাকঘর থাকায় আমরা সেদিন নিজ নিজ বাটীতে

একখানি পত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম। পরদিন প্রভাতেই আবার যাত্রার পথে বাহির হইলাম। এবারে পথ ক্রমশঃ উত্‌রাইয়ে নামিয়াছে। দুই মাইল চারি মাইল করিয়া প্রায় সাত মাইল পথ পর্য্যন্ত নীচে নামিয়া আসিতে হইল। সুখের বিষয়, এ উত্‌রাইয়ে নামিতে ঘোড়াকে ততদূর ক্লেশ পাইতে হয় নাই। উত্‌রাইয়ের স্থানে স্থানে পাহাড়ের কোলে ধানের ক্ষেতের উপরে দৃষ্টি পড়িল। ক্বচিৎ দুই একটি পাহাড়ী চাষী আপন মনে নিকটস্থ ঝরণা হইতে জল ধরিয়া, কিরূপে এই ধানের ক্ষেতে জল আনিতে পারা যায়, তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছিল। এক স্থানে একটি বৃহৎ পেয়ারাবাগান দেখা গেল। এইভাবে উত্‌রাই ছাড়িয়া আরও তিন মাইল আন্দাজ পথ চলিয়া আসিয়া বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময়ে আমাদের ঘোড়া "থলে" আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই গ্রামে আট দশ ঘর লোকের বসবাস ও তিনটি দোকান আছে দেখিলাম। দোকানে নূতন চাউল, মসূর ডাল, পেঁয়াজ, চিনি, ঘৃত, আটা ও কিছু কিছু মশলা পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে ন্যাসপাতি এখানে প্রচুর। খুচরা খরিদ করিলে এক পয়সায় চারিটি হিসাবে উহা পাওয়া যায়। একটি প্রাচীন মন্দির জরাজীর্ণাবস্থায় এখনও অতীতের ধর্ম্ম-যুগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। অনুসন্ধানে জানিলাম, ইহাই প্রাচীন "বালেশ্বরের" মন্দির। এতদঞ্চলে আরও চারিটী প্রাচীন তীর্থস্থান, যথা—পুঙ্গেশ্বর, কোটেশ্বর, বাগেশ্বর ও ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। নীচেই "রামগঙ্গা" নদী কুলু-কুলু নাদে বহিয়া যাইতেছে। ইহার গতি খুবই বেগবতী। এই নদীর উপরের দোদুল্যমান লৌহ-সেতু পার হইয়া ডাকঘরের পার্শ্বের স্কুল-প্রাঙ্গণে আসিয়া আমাদের উভয়ের ঘোড়া যখন উপস্থিত হইল, তখন ডাণ্ডিওয়ালাগণ দিদিদের লইয়া এখানেই অপেক্ষা করিতেছিল। যত শীঘ্র সম্ভব আহারাদি শেষ করিয়া এখান হইতে

পুনরায় রওনা হইবার কথা ছিল। কারণ, এখনও প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিলে তবে আজিকার মত আশ্রয়স্থান পাওয়া যাইবে। তদনুসারে আমি ও শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ নিকটস্থ একটি ঝরণার ধারায় স্নান করিতে গিয়া তৎপার্শ্বের একটি জলস্রোতে চালিত জাঁতার কলের নীচের স্রোতোধারায় রীতিমত অবগাহন-স্নানাদি সত্বর শেষ করিলাম। পরে তৈয়ারী অন্ন উভয়েই দুই চারি গ্রাস মুখে দিয়া বেলা বারোটার মধ্যে পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ডাণ্ডিওয়ালারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার জন্য সর্ব্বদাই শশব্যস্ত; কারণ, তাহারা যত শীঘ্র ধারচুলায় পৌছিতে পারে, তত শীঘ্রই আলমোড়ায় ফিরিয়া আসিবে। মজুরী আলমোড়ার তহশীলদারী হইতে অগ্রিম লইয়াই তবে রওনা হইয়াছে। সুতরাং আহারাদির পরক্ষণে তাহারা বিনা বিশ্রামেই দিদিদের লইয়া আগে চলিল। বন্দুক হস্তে ভূপ সিং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে বাধ্য হইল। আমাদের ঘোড়াওয়ালারা কিন্তু এ সময় যাইতে আদৌ প্রস্তুত হইতে চাহিল না। কারণ, দশ মাইল পথ চলিয়া আসিয়া পরিশ্রান্ত ঘোড়াকে, এই দিবা দ্বিপ্রহরে পুনরায় সম্মুখের তিন মাইল, সাড়ে তিন মাইল খাড়া চড়াই পথ লইয়া যাওয়া কতদূর কষ্টকর, তাহাই তাহারা এক্ষণে আলোচনা করিতেছিল। এমত অবস্থায় আমাদের অনেক কাকুতি-মিনতির পরে অনিচ্ছায় তাহারা ঘোড়াকে যাত্রার জন্য তৈয়ার করিল। ভারবাহী ঘোড়াগুলিও অদ্য এখানে বিশ্রাম করিবার অবসর পাইল না। কারণ, বোঝা লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাদিগকেও নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে হইবে। এইরূপে আমরা আপন আপন ঘোড়ায় উঠিয়া চলিতে বাধ্য হইলাম।

এ কয়দিন ঘোড়ার পৃষ্ঠে আসিয়া আমাদের উভয়ের শরীর বেদনায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে গেলে

পাহাড়ের চড়াই উঠা চলে না। এ সময়ে সকলেরই শুধু এক সাধনা— 'আগে চল্, আগে চল্ ভাই!' সকলেরই মনে শুধু 'কৈলাস' পৌঁছিবার দুরাকাঙ্ক্ষা প্রতি মুহূর্ত্তেই জাগিয়া উঠিতেছিল। ঘোড়া চড়াইয়ের পথে হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিতেছে। তাহার পৃষ্ঠদেশে আমরা উভয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নিঃশব্দে বল্গা ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছি। তিন বা সাড়ে তিন মাইল খাড়া চড়াই অতিক্রম শেষ হইল। কিন্তু যখন আমরা চড়াইয়ের উপরে উঠিলাম, তখন দুই দিকের ঘন জঙ্গলে আমাদের রাস্তা একবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্রমশঃ সারা পথ ঘোর অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। আমাদের অবসন্ন শরীর এই জঙ্গলের ছায়ায় প্রথমে একটু শীতল হইয়াছিল; কিন্তু এইভাবে প্রায় সমস্ত অপরাহ্নকাল যখন এই জনমানবশূন্য জঙ্গলের মাঝখানেই অতিবাহিত হইতে চলিল, তখন আমরা দুইজনেই (এমন কি, ঘোড়াওয়ালা পর্য্যন্ত) ভীত-সন্ত্রস্তচিত্তে কতক্ষণে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিব, তাহারই চিন্তায় দ্রুতগতি অশ্বচালনার দিকে অবহিত হইলাম। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, শুধুই সম্মুখে চলিয়াছি। মনুষ্য বা কোন প্রকার পশুপক্ষীর সাড়া-শব্দ পাইলে হয়ত মনে তখন একটু সাহসের সঞ্চার হইত; দিনের বেলায় এই জঙ্গলের রাস্তা দিয়া যাইতে বাস্তবিকই এমন একটা আতঙ্ক হইতেছিল। মাথার উপরের গাছ হইতে একটি পাতা ঝরিয়া পড়িলেই মনে হইতেছিল, বুঝি বা কোন হিংস্র জন্তু আমাদের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে।

এইরূপে প্রায় কতক্ষণে চারি মাইল জঙ্গল পশ্চাতে রাখিয়া আরও আড়াই মাইল আন্দাজ পথ উত্‌রাইয়ে নামিয়া অবশেষে একটি শ্যামতৃণ-শোভিত ময়দানে আসিয়া পড়িলাম। সে পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই আমাদের ঘোড়া "ডাণ্ডির-হাটে" আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যা সমাগত। দূরে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তুষারময় পর্ব্বত-প্রাসাদের চূড়ায়

উপরে অপরাহ্নের শেষ সূর্য্যরশ্মিগুলি আপন আপন মায়াজাল বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। উজ্জ্বল তুষার-রাশির উপরে তাহাদের লাল আভা দূর হইতে খুবই সুন্দর দেখাইতেছিল। দেখিলাম, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত যাত্রীর দলসহ স্বামীজীরা সকলেই তখন এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টি সেই মধুর দৃশ্যগুলির উপরে নিবদ্ধ রহিয়াছে। দূরবীণ হস্তে বৃদ্ধ গঙ্গাধর ঘোষ বুঝি বা তন্ময় হইয়াই বিধাতার সেই বিচিত্র দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ডাণ্ডিওয়ালারা ডাণ্ডি নামাইয়া একধারে বসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিল। আমরাও ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে নীচে অবতরণ করিলাম।

স্বামীজী মহারাজ (অনুভবানন্দজী) আমাদের কুশলাদি প্রশ্ন করিলে আমরা রাস্তার ভয়াবহ দৃশ্যের কথা উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন, "যখন 'কৈলাস' যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তখন এ প্রকার রাস্তা খুবই সুগম বলিয়া আপনাদের মনে রাখা উচিত।" যাহা হউক্, পরিশ্রান্ত শরীর তখন ভয়ের রাস্তা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। চোখের উপরে সম্মুখের দৃশ্যগুলি নবরাগ-রঞ্জিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হওয়ায় অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের সকল ক্লেশ ও ভয় কোথায় দূর হইয়া গেল। এই ডাণ্ডির হাট আলমোড়া হইতে বাষট্টি মাইল দূরে। এ স্থানটিতে মাত্র চারি পাঁচ ঘর লোকের বসবাস আছে, তাহা ছাড়া একটি ধর্ম্মশালা বিদ্যমান। তাহার অবস্থা দেখিলে তাহাকে গোশালা বলিয়াই সাধারণতঃ ভ্রম উপস্থিত হয়। সে ঘরটিও তখন একটি বেদিনী নর্ত্তকী ও তাহার দুইজন সারঙ্গওয়ালা দুই তিন দিন হইতে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। স্বামীজী ও অন্যান্য যাত্রিগণ এখানকার একটি ঘরের সম্মুখস্থ খোলা বারান্দায় আশ্রয়লাভ করিয়াছেন দেখিয়া আমাদের কোথায়ও স্থান পাওয়া যাইবে কি না, এ বিষয়ে কিছুক্ষণ অনুসন্ধান চলিল।

অবশেষে স্থানীয় দোকানদারের নিকট তাহার একটিমাত্র দোকানের উপরের ইন্ধন-আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ একটি কুঠারীর একধারে রাত্রিযাপনের অনুমতি পাইয়া সেদিনকার মত আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলাম। আস্‌বাবাদি প্রায় সমস্তই ঘোড়াওয়ালাদের নিকট বাহিরে পড়িয়া রহিল। এই দোকানে দ্রব্যাদি কি কি পাওয়া যায়, সন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, এখানকার ঘৃত উৎকৃষ্ট, অথচ অপেক্ষাকৃত সুলভ, তজ্জন্য কিছু ঘৃত আমরা (টাকায় চৌদ্দ ছটাক হিসাবে) সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। স্বামীজীরাও এখান হইতে কিছু ঘৃত খরিদ করিয়া লইয়াছেন শুনিলাম। রাত্রিকালে ষ্টোভ জ্বালিয়া কয়েকখানি লুচি ও কিছু হালুয়া তৈয়ার করিয়া জলযোগ করা গেল। দুঃখের বিষয়, এখানে জলকষ্ট খুবই বেশী। বহুকষ্টে লোকের দ্বারা প্রায় আধ মাইল দূরের একটি ঝরণা হইতে জল আনাইয়া তবে সেদিন্‌কার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইয়াছিল।

১৩ই আষাঢ়, ইং ২৭শে জুন, বৃহস্পতিবার প্রভাতেই আমরা আপন আপন আস্‌বাব-পত্রাদি ঘোড়ার পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া সকলেই একে একে আস্‌কোট-উদ্দেশে রওনা হইলাম। পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে মধ্যে মধ্যে এবারে তৃণ-গুল্মে পরিপূর্ণ সমতল স্থান পড়িলেও এ পথে ঝরণার ধারা খুব কমই দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই সকল সমতল স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলে পাহাড়গুলি উচ্চ প্রাচীরের মত আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই মনে হইত। আগে যাইতে গেলে কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে সম্মুখের পথের অস্পষ্ট রেখাই আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে ধীরে ধীরে লইয়া চলিয়াছে। এইরূপে প্রায় সাত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা নয়টা আন্দাজ সময়ে আমরা "আস্‌কোটে" পৌঁছিলাম।

দূর হইতে এই আস্‌কোটের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। আল-

মোড়া হইতে ধারচুলা পর্য্যন্ত নব্বুই মাইল পথ যাইতে গেলে তিনটি বড় গ্রাম পড়ে, ইহা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। প্রথম বেরীনাগ, দ্বিতীয় আস্‌কোট, তৃতীয় ধারচুলা। প্রথমটির বিষয় ইতিপূর্ব্বে পাঠকবর্গ জানিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয়টি এই আস্‌কোট—আলমোড়া হইতে উনসত্তর মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামখানি বেশ ঝক্‌ঝকে ও পরিষ্কার। চারিদিকেই দূরে দূরে সারি সারি পাহাড়গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকায়, অপেক্ষাকৃত উচ্চ পাহাড়ের কোলে এই গ্রাম বেশ প্রশস্ত বলিয়া মনে হইতেছিল। গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে। রাস্তার ধারে ধারে চারি পাঁচ খানি দোকান দেখিতে পাইলাম। কোনটিতে মনিহারী দ্রব্য, কোনটিতে বা চাউল, ডাল, মশলা প্রভৃতি এবং কোনটিতে বা কাপড়, জামা ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে। এখানে ন্যূনকল্পে পঁচিশ ত্রিশ ঘর লোকের বসবাস আছে মনে হইল।

আমাদের ঘোড়া ক্রমশঃ গ্রামবাসীদের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির মাঝখান দিয়া চলিতে চলিতে এক ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন পরে এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের একমাত্র ধর্ম্মশালাটি দেখিয়া বাস্তবিকই সে সময়ে ইহা কৈলাসযাত্রীদিগের আশ্রয় লইবার মত স্থান বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মিল। ধর্ম্মশালাটি নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। নীচে চারিখানি ঘর ও তৎসংলগ্ন বারান্দা ; উপরেও সেইরূপ চারিখানি ঘর ও বারান্দা রহিয়াছে। তবে তাহার নির্ম্মাণকার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। ধর্ম্মশালার উত্তরাংশে খানিক দূরে, পাহাড়ের গায়ে দুইটি প্রাসাদ ছবির মত শোভা পাইতেছিল। তাহা দেখিলে তাহার অধিকারিগণকে সাধারণ অশিক্ষিত পাহাড়ী বলিয়া কখনই মনে হয় না। বাটী দুইখানির সম্মুখের সজ্জিত বারান্দাগুলি পুরাতন এবং কতকটা আজকালকার মত নূতন এই উভয় 'ফ্যাসানে' নির্ম্মিত বলিয়া এ প্রদেশে তাহা দেখিতে বেশ অভিনব ও রুচিসঙ্গত

বলিয়াই মনে হইতেছিল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, এই বাটীর মালিক এখানকার রাজওয়ারা সাহেব মহোদয়। তাঁহারই ধর্ম্মশালায় আজ আমরা আশ্রয় লইয়াছি। ধর্ম্মশালায় দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটি ও দরোয়ান ভূপ সিং ইতিপূর্ব্বে আসিয়া পৌছিয়াছেন। আমা-দিগকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা এইখানেই বিশ্রাম ও আহারাদি শেষ করিয়া যাইবার কথা তুলিলেন। দোকান হইতে চাউল, ঘৃত প্রভৃতি খরিদ করিয়া আনা হইল। ধর্ম্মশালা হইতে খানিক দূরে একটি আম-বাগানের মধ্য দিয়া গিয়া এক স্থানে একটি ঝরণার ধারায় আমরা সকলে একে একে স্নানাদি শেষ করিয়া আসিলাম। ন্যাসপাতি ও কাঁচা আম এখানেও প্রচুর দেখিতে পাওয়া গেল।

আহারাদি প্রস্তুত হইলে আমরা ভোজনে বসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে একজন চাপরাশী একটি বড় থালায় করিয়া চাউল, ডাল, ঘৃত, মশলা, আটা, চিনি ও নানারকমের আচারদ্রব্য প্রভৃতি ভেট লইয়া আমাদের সম্মুখে হাজির হইল। এ ব্যাপারে তখন আমরা সকলেই যুগপৎ বিস্মিত হইয়া পড়ায়, সেই অপরিচিত লোকটি এখানকার রাজওয়ারা সাহেবের, প্রতি বৎসরেই প্রত্যেক কৈলাসযাত্রীদের প্রতি এইরূপে তীর্থপথ-ক্লেশ দূর করিবার নিয়ম জ্ঞাত করাইল। শুধু তাহাই নহে, কোন বিষয়ে আমাদের অসুবিধা হইতেছে কি না, লোকটি সে সম্বন্ধেও পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এই দুর্গম অপরিচিত পার্ব্বত্যপ্রদেশে চিরপরিচিতের মত আত্মীয় রাজওয়ারা সাহেব মহোদয়কে তখনই দেখিয়া আসিবার যথেষ্ট আগ্রহ থাকিলেও, এ সময়ে রাজওয়ারা সাহেবের সহিত দেখা করার সময় নহে তাঁহার ভৃত্য এ কথা জানাইলে, আমরা নিরস্ত হইলাম। কৈলাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইব, এ কথা ভৃত্যটিকে জানাইয়া কিছু



খড়্গসিং পাল বাহাদুর

বখশিশ্ দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে আহারান্তে বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে আস্কোট পরিত্যাগের জন্য উদ্যোগী হইলাম। আস্কোটের এই রাজওয়ারা সাহেবের পরিচয়-সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর সংবাদ জানিয়াছিলাম। ইঁহারা রাজা গজেন্দ্রসিংহ পাল বাহাদুরের বংশধর, 'কুত্তুর' রাজবংশ বলিয়া ইঁহাদের খ্যাতি চলিয়া আসিতেছে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ঢাকা-বিক্রমপুরের পালবংশীয় রাজগণ মুসলমান-বাদশাহ বখ্তিয়ার খিলিজীর আমলে বিতাড়িত হইয়া এইখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই রাজওয়ারা সাহেব এক্ষণে তাঁহাদেরই বংশধর। এ সংবাদ কতদূর সত্য, তাহা ঐতিহাসিকগণই বলিতে পারেন। বর্ত্তমানে কুমার বিক্রমসিংহ পাল বাহাদুর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারা উপস্থিত চারি ভাই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার খুল্লতাত-ভ্রাতা কুমার খড়্গ সিংহ পাল বাহাদুর পিথোড়াগড়ের পলিটিক্যাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইঁহাদের জমিদারীর আয়তন সামান্য নহে মনে হইল। কারণ, ধারচুলার পরবর্ত্তী গ্রাম খেলা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত স্থানই ইঁহাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত, ইহা সে সময়ে শুনিয়া আসিয়াছিলাম।

আস্কোট পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতেই প্রথমে উত্রাই পড়িল। এ উত্রাই ক্রমশঃ এতই নিম্নমুখী হইয়া নামিয়াছে যে, অশ্বপৃষ্ঠে যাওয়া আমার পক্ষে অতীব কঠিন বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন। দেশে তিনি অভ্যস্ত অশ্বারোহী হইলেও এ ক্ষেত্রে তাঁহার সে অভ্যাস বোধ করি অসহ্য বোধ হইতেছিল। তাই তিনি মধ্যে মধ্যে এই অনভ্যস্ত ঘোড়সওয়ারের দুর্দ্দশা এক একবার আড়নয়নে দেখিয়া লইতেছিলেন। আমাদের অক্ষমতা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই ঘোড়াওয়ালা নিজেই আমাদের উভয়কে ঘোড়া হইতে নামিবার পরামর্শ দিতে আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এইবার পদব্রজে প্রায়

তিন কি সাড়ে তিন মাইল নীচে চলিয়া আসিতে পথিমধ্যে ডাণ্ডিওয়ালা ও দিদিদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। এরূপ কঠিন উত্‌রাইয়ে বাহকগণ খুবই সাবধানে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে লইয়া আসিতেছিল। তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আমাদের নামিয়া আসিবার সময়ে, সত্য কথা বলিতে কি, আমি নিজে একবার টাল সামলাইতে পারি নাই; ঢালু পথে সম্মুখপানে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম। সুখের বিষয়, ডাণ্ডিবাহকের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়া ফেলায় আমি সে যাত্রা আঘাত হইতে রক্ষা পাই। এইরূপে নীচে নামিয়া বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে "গৌরীগঙ্গা" নদীর পুল সম্মুখে পড়িল। এই নদী উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিতা। এইখানে আসিয়া আমরা সকলেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ডাণ্ডিওয়ালাগণ দিদিদের ডাণ্ডি হইতে নামাইয়া দিয়া নদীতে হস্ত-মুখ প্রক্ষালনের জন্য অগ্রসর হইল।

এই নদীর বিস্তৃতি পঁচিশ ত্রিশ হাতের বেশী হইবে না। তীরে দুই দিকেই আকাশস্পর্শী পাহাড় খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ের অঙ্গ নানাজাতীয় গাছ ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তাহারই মধ্য দিয়া নদীর তীরে তীরে একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ রাস্তা গিয়াছে। মনুষ্যসমাগমহীন সে রাস্তা দিনের বেলা অতি ভয়ানক বলিয়া মনে হইতেছিল। এইরূপ জঙ্গলের মাঝখানে নদীর ধারের সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া একাকী যাওয়া চলে কি না, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে একটু জল্পনা-কল্পনা চলিলে, দিদি ও আমি নিজ নিজ যানবাহনাদি ও বাহকগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া পদব্রজে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া চলিলাম। সঙ্গে উভয়েরই হস্তে পাহাড়ে উঠিবার সেই হাল্কা অথচ লম্বা যষ্টি। এইভাবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে মনে কতই না চিন্তাস্রোত আলোড়িত হইতে লাগিল। কোথায় 'কৈলাস', কোথায় 'মানস', কত দিনে পৌছিব, পৌছিতে পারিব কি না, এ দুর্গম

পথে শারীরিক সকলে কুশলে থাকিবে ত, না থাকিলে কি দুর্দ্দশাই না ভোগ হইবে—ইত্যাদি অনেক প্রকার ভাবনায় সে সময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। নদীর ধারে ধারে এইভাবে এক মাইল আন্দাজ চলিয়া আসিলে পশ্চাৎ হইতে শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ, ভূপ সিং এবং ডাণ্ডি ও ঘোড়া লইয়া বাহকগণ একে একে উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, আমরাও নিজ নিজ যান-বাহনে আবার উঠিয়া বসিলাম। এই নদীর ধারে ধারে অযত্নসম্ভূত কেবল ভাঙ্গের জঙ্গল রাস্তাকে এক প্রকার ঢাকিয়া রাখিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলিতে চলিতে একটি চড়াইয়ের মুখে নদীর ভীষণ গর্জ্জন কাণে পৌঁছিতে সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম, রাস্তার পূর্ব্ব দিক হইতে একটি নদী আসিয়া এই গৌরীগঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হওয়ায় উভয়ের সঙ্গমস্থল হইতে এই গর্জ্জনের উৎপত্তি হইতেছে। এই নদীর নাম "কালী"। এই কালী-নদী যে স্থলে গৌরীগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহারই পার্শ্বে "জোলজুবী" নামে একটি ছোট গ্রাম দেখিতে পাওয়া গেল। এখানে দশ বার ঘর ভুটিয়ার বসত-বাটী রহিয়াছে। তাহা ছাড়া এই উভয় নদীর মিলিত কোণে, তীরের উপরেই একজন ব্রহ্মচারীর একটি সুন্দর আশ্রম আছে শুনিতে পাইলাম। কিন্তু সে সময়ে পাছে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে আশ্রম দেখা স্থগিত রাখিয়া জোলজুবী পরিত্যাগ করিলাম। এই জোলজুবীতে কার্ত্তিকমাসে ভুটিয়াদিগের একটি বিশেষ মেলা বসিয়া থাকে।

এইবার আমরা কালী-নদীর তীরে তীরে চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই নদী প্রচণ্ড-বিক্রমে দুইটি পাহাড়ের মাঝখানে বহিয়া চলিয়াছে। ইহার ওপারে নেপালরাজ্য, এপারে বৃটিশ রাজত্ব। মধ্যে এই নদীই

একমাত্র ব্যবধান, এপার হইতে ওপারে নেপালরাজ্যের কিছুই দেখা যায় না। সম্মুখে শুধু প্রকাণ্ড আকাশচুম্বী পাহাড় রাজ্যটিকে দুর্গ-প্রাচীরের মত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে দেখা যায়। এপারে ঐ নদীর তীরে তীরে পাহাড়ের কোল দিয়া আমাদের রাস্তা আঁকাবাঁকা ভাবে চলিয়া গিয়াছে। কখনও বা কিছু চড়াই অতিক্রম করিয়া পরক্ষণেই উত্‌রাইয়ে নামিলাম, আবার উত্‌রাই হইতে ক্বচিৎ বা চড়াইয়ের পথে উঠিয়াছে। এই পথে কালী-নদীর গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে প্রায় ছয় মাইল অগ্রসর হইয়া সন্ধ্যা সাতটা আন্দাজ সময়ে আমরা "বালুয়াকোটে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এই বালুয়াকোট আলমোড়া হইতে উনআশী মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার তলদেশে কালী-নদীর জলই গ্রামবাসীদের অবলম্বনস্বরূপ বহিয়া চলিয়াছে। গ্রামে একটি স্কুলবাড়ী আছে। স্বামীজীরা অন্যান্য যাত্রিগণ সহ পূর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানে জনৈক মুসলমানের একটিমাত্র দোকান আছে। গ্রামে ভুটিয়াদিগের অনেকগুলি বাড়ী চাবিবদ্ধ অবস্থায় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া, প্রথমে আমাদের মনে খুবই ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। বুঝি বা গ্রামে মহামারীর উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, তাই গ্রামবাসিগণ এ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইয়া থাকিবে। কিন্তু প্রকৃত কারণ তাহা নহে জানিয়া পরে সে আশঙ্কা দূর হইল। শুনিলাম, ভুটিয়াবাসীরা এ সময়ে প্রতি বৎসরেই ব্যবসায়-উদ্দেশে উপরে অর্থাৎ গার্ব্বিয়াং ও তিব্বত অঞ্চলে বাহির হইয়া থাকে। গরমকালটা প্রায় পাঁচ ছয় মাসকাল ইহাদের উপরে ব্যবসায় চলে। কার্ত্তিক মাস হইতে সমস্ত শীতকাল ভরিয়া নীচেই থাকিয়া এখানে বসবাস করে। যাহা হউক্, অন্য কোন স্থানে আমাদের আশ্রয় খুঁজিয়া পাইলাম না। স্বামীজীরা অন্যান্য যাত্রিগণের সহিত পূর্ব্বেই আসিয়া এখানকার স্কুলবাড়ীর ঘর দুইখানি



:কাটের নীচে কালী নদী ২৮

অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের অন্য ঘর না পাওয়ায় অগত্যা দোকানের পার্শ্বে একটি দরজা-জানালা-বিহীন অশ্ব-বিষ্ঠা-পরিপূর্ণ ঘরে রাত্রিযাপনের সংকল্প করিতে বাধ্য হইলাম। ইহাই হইল যাত্রীদিগের সেখানকার ধর্ম্মশালা! উৎকট দুর্গন্ধে প্রথমে ইহাতে প্রবেশ করিতে সকলেরই নাসিকা সঙ্কুচিত হইতেছিল। বাহিরেই কম্বল মুড়ি দিয়া রাত্রিযাপনের ইচ্ছা থাকিলেও আকাশে সে দিন বিলক্ষণ মেঘের উৎপাত আরম্ভ হওয়ায়, বাধ্য হইয়া সেই ঘরই পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া হইল। ঘরটির এক পার্শ্বের দিকে সমস্ত আস্‌বাব রাখিয়া আর্দ্র মাটীর মেঝের উপরে পাতিবার জন্য একটি বড় নূতন "চাটাই" (পাটীর আকারে) দোকানদারের নিকট পাওয়া গিয়াছিল। তাহার উপরে আপন আপন বিছানাপত্রাদি যথাসম্ভব বিছাইয়া রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা গেল। দোকান হইতে আটা, ঘৃত প্রভৃতি খরিদ করিয়া বাহিরের চৌতারায় আহারাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এখান হইতে কেরোসিন তৈলের মূল্য মহার্ঘ্য হইতে আরম্ভ হইল। প্রতি বোতল আট আনা হিসাবে আমাদিগকে খরিদ করিতে হইয়াছিল।

সমস্ত দিনের অত্যধিক পরিশ্রমে রাত্রিতে আহারাদির পরে যখন সকলেই বিশ্রামের অবসর খুঁজিতেছিলাম, তখন আকাশে মেঘের সঙ্গে সঙ্গে দুই এক ফোঁটা করিয়া ক্রমশঃ প্রবল বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ হইল। সেই বৃষ্টির জল আমাদের তথাকথিত ধর্ম্মশালার শতচ্ছিদ্রময় ছাদ ভেদ করিয়া বিছানাপত্র সহ সমস্ত আস্‌বাবাদি একবারে ভাসাইয়া দিল। সে রাত্রি আমাদের সকলকেই বসিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। অন্ধকার রাত্রিতে জনমানবহীন পাহাড়-জঙ্গলের মাঝখানে দুর্গন্ধময় ঘরে বসিয়া বর্ষার দিনে রাত্রিজাগরণ সেই দিনই আমাদের প্রথম। এ দিনের দুর্দ্দশার কথা যখনই মনে হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে! এই

দারুণ দুর্য্যোগের দিনে আমাদের বিহারী-দারোয়ান ভূপ সিংএর সেই ঘরের একটি কোণে বসিয়া বসিয়া নাসিকাগর্জ্জন সে সময়ে কেবল আশ্চর্য্যরূপে শ্রুতি-সুখকর মনে হইয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে উঠা গেল। সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়া তখনও আকাশ মেঘমুক্ত হয় নাই। বর্ষার দিনে বৃষ্টি হইবে না, এ ব্যবস্থায় বিধাতা কেন সন্তুষ্ট রহিবেন? আমাদের কয়জনের দুর্দ্দশায় সারাজগতের কিছুমাত্র আসে যায় না। ঘোড়ার সাজের দ্রব্য বলিতে যেটুকু আমাদের বসিবার কম্বল-আসন, তাহাও ভিজিয়া গিয়াছে। রাত্রিকালে ঘোড়াওয়ালা ও ডাণ্ডিবাহক কেহই গাছতলা ভিন্ন অন্যত্র আশ্রয় পায় নাই। এমত অবস্থায় ঘোড়ার পৃষ্ঠের ভিজা কম্বল-আসনে বসিয়া এক হস্তে নিজ নিজ মস্তকোপরি ছাতা এবং অন্য হস্তে ঘোড়ার মুখের ভিজা দড়ি ধরিয়া বর্ষা-পিচ্ছিল পথে, বাধ্য হইয়া আমাদের রওনা হইতে হইল। দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী ডাণ্ডির উপরে ছিলেন। তাই ছাতা ধরিয়া যাইতে তাঁহাদের সেরূপ কষ্ট না হইলেও আমি ও শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ বড়ই বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। বৃষ্টিপাতে ঘোড়ার গা পিচ্ছিল হওয়ায় চড়াই উঠিবার কালে, কিম্বা পিচ্ছিল পথে উত্‌রাইয়ে নামিবার সময়ে—উভয় ক্ষেত্রেই খুব সাবধানে অশ্ব-বল্গা সংযত রাখিতে হইতেছিল। তবে সুখের বিষয়, এ দিনে বেশী দূরে যাইবার কথা ছিল না, মাত্র এগারো মাইল দূরে গেলেই ধারচুলা-"তপোবন"।

স্বামীজীরা অতি প্রত্যুষেই বর্ষা মাথায় করিয়া পদব্রজে রওনা হইয়াছেন। তাঁহাদের নিজেদের আশ্রমে পৌঁছিতে পারিলেই এ কয় দিনের সব ক্লেশ দূর হইয়া যায়। মনের মধ্যে আশা রহিয়াছে, আজই যে কোন উপায়ে সেখানে পৌঁছিতে পারিব। ভাগ্যক্রমে এ দিনে তেমন উচ্চ পাহাড় পথে পড়িল না। তিন চারি মাইল পথ অতিক্রম করিলে আকাশ



ধারচুলার ইশাহী খৃষ্টসঙ্গীত গাহিতেছে— ৩১

কিছু পরিষ্কার হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পথ প্রায় সমতল ক্ষেত্রের উপরে আসিয়া পড়িল। এইরূপে আট মাইল আন্দাজ আসিবার পরে "গোপালগাঁও" নামক গ্রামে আমরা প্রবেশ করিলাম। এ গ্রামে রাস্তার ধারে ধারে যথেষ্ট কলাবাগান, আম, পেয়ারা ও গোঁড়ালেবুর গাছ রহিয়াছে দেখিয়া আনন্দ-কৌতূহল-দৃষ্টিতে চারিদিক দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গ্রামের লোক সকলেই উৎসুক-নয়নে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ "কাঁহা জাতে হ্যাঁয়, কৈলাস ?" ইত্যাদি প্রশ্নে হর্ষমিশ্রিত উৎসাহ জ্ঞাপন করিতেছিল। গ্রামের দুই ধারে কোথাও ইক্ষুক্ষেত্র, আবার কোথাও বা ভুট্টার রীতিমত চাষ রহিয়াছে। তবে গ্রামের অধিকাংশ ঘরই তালাবদ্ধ রহিয়াছে দেখিলাম। এখানকার অধিবাসিগণও ব্যবসায়-উদ্দেশ্যে উপরে গিয়াছে। উপরে যাইবার সময়ে সাধারণতঃ ইহারা কাপড়, গম, চাউল, আটা প্রভৃতি এখান হইতে লইয়া যায় এবং সেখান হইতে তৎপরিবর্ত্তে উল, লবণ, সোহাগা প্রভৃতি আনয়ন করে। এইরূপে তাহাদের ব্যবসায় বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। আমরা বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে "ধারচুলা" গ্রামে পৌছিলাম। এ গ্রামখানিতে অনেক লোকেরই বসবাস রহিয়াছে। পঞ্জাব হইতে জনৈক দোকানদার ব্যবসায়-উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়া একবারে বসত-বাড়ী করিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সমভিব্যাহারে বাস করিতেছে দেখিলাম। একটি পাদ্রীর আড্ডাও দৃষ্টিগোচর হইল। আলমোড়া হইতে নিরানব্বুই মাইল দূরে পার্ব্বত্যপ্রদেশে আসিয়া তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই! সে সময়ে এই আড্ডায় একজন ইশাহী খৃষ্ট-সঙ্গীত গাহিতেছিল। গ্রামে তিন চারি খানি দোকান। একটি দোকান ও তৎসংলগ্ন পোষ্ট-আফিসের সম্মুখে আসিয়া ডাণ্ডিওয়ালারা ডাণ্ডি নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল, এ গ্রাম ছাড়িয়া তখন আর আগে

যাইতে চাহিল না। এখান হইতে আরও দুই মাইল দূরে স্বামীজীদের "তপোবন"। এই তপোবন পর্য্যন্তই ভাড়া দেওয়া ছিল। তহশীলদারী কাছারীর এজেন্সিতে টাকা জমা দেওয়ার রসিদপত্র দেখাইয়া, কিছুক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডার পরে স্থানীয় গ্রামবাসীদের তিরস্কারে অগত্যা কুলীরা পুনরায় অগ্রসর হইল। মনে হয়, কিছু বখ্‌শিশ্‌ পাইবার অজুহাত দেখাইয়া তাহারা এইরূপে আমাদিগকে গ্রামে রাখিবার মতলব করিয়াছিল। যাহা হউক্, বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে আমরা সকলেই তপোবনে প্রবেশ করিলাম। পথিমধ্যে কালী-নদীর উপরে ওপার হইতে এপারে আসিবার একটি দড়ির পুল দেখিয়াছিলাম। নেপাল-রাজ্যের লোক এই দড়ির পুল দিয়া এপারে অর্থাৎ বৃটিশ রাজত্বে আসা-যাওয়া করিয়া থাকে।



স্বামী অনুভবানন্দ

তৃতীয় পর্ব্ব

তপোবন

এখানে পৌঁছিতেই তপোবনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ অনুভবানন্দজী মহারাজ বিশেষ আদর-আপ্যায়ন সহযোগে আমাদিগকে তাঁহাদের আশ্রমে স্থান দিলেন। একসঙ্গে যুগপৎ অনেকগুলি মূর্ত্তি আমাদের আগমনে হর্ষধ্বনি প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্ব-পরিচিত যাত্রীর দল ব্যতীত আরও তিনজন বাঙ্গালী সে সময়ে এখানে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হইল। শুনিলাম তাঁহারাও কৈলাসযাত্রী, এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে আসিয়া এ যাবৎ আমাদেরই অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। আনন্দের মাত্রা দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইল। কিছুক্ষণ পরে ভারবাহী ঘোড়াগুলি আমাদের বোঝা প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইল। ডাণ্ডিওয়ালা, ঘোড়া-ওয়ালা প্রভৃতি সকলেই প্রসন্ন-চিত্তে বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, স্বামীজী মহারাজের কথামত তাহাদিগের আপন আপন প্রাপ্য মজুরী চুকাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

সওয়ার ঘোড়াওয়ালা দুই জনের প্রাপ্য মজুরী বাহান্ন টাকার মধ্যে দুই টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাদে পঞ্চাশ টাকা এবং দুই জনের আট আনা হিসাবে একটাকা বখশিশ্ দেওয়া হইল। ভারবাহী তিনটি ঘোড়ার প্রতি ঘোড়া দুই মণ হিসাবে মোট ছয় মণ লগেজ আনার মজুরী বিয়াল্লিশ টাকা চুকাইয়া দিলাম। ডাণ্ডিওয়ালারা প্রথমেই মজুরী লইয়া তবে ডাণ্ডি তুলিয়াছিল। তাহারা এক্ষণে বখশিশ্ চাহিল। দিদির ইচ্ছা মত তাহাদের বারো জনের প্রত্যেককে চারি আনা হিসাবে মোট

তিন টাকা বখশিশ্ দিলাম। এই তীর্থপথে যাহা কিছু খরচপত্র হইবে, তাহার হিসাব রাখিবার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত ছিল। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণকে টাকা কড়ি রাখিবার জন্য প্রথমটা পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি এ বিষয়ে ওস্তাদের মত জবাব দিয়াছিলেন যে, টাকা-কড়ি দিলে তিনি আনন্দের সহিত রাখিবেন, পরন্তু খরচের হিসাব তাঁহার নিকট কেহই লইতে পারিবেন না। দুঃখের বিষয়, এ প্রস্তাবে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী আদৌ সম্মত হয়েন নাই। কাযেই এ বোঝা আমাকেই আগাগোড়া বহন করিতে হইয়াছিল।

এই স্থানে আমার একটি কথা বলিবার আছে। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, পথিমধ্যে দিদির ডাণ্ডিখানি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নূতন একখানি ডাণ্ডি বারিছিনা হইতে প্রত্যহ আট আনা হিসাবে ভাড়ায় চুক্তি করিয়া আনা হয়। ধারচুলা পর্য্যন্ত তাহার মজুরী পাঁচ দিনে আড়াই টাকা এবং এখান হইতে পুনরায় বারিছিনা পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া যাওয়ায় পাঁচ দিনের মজুরী দুই টাকা আট আনা মোট, পাঁচ টাকা কুলীদিগের হস্তেই দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়া যে ভাঙ্গা ডাণ্ডিখানি বারিছিনায় রাখিয়া আসা হইয়াছিল, তাহা ওখান হইতে আলমোড়ার দোকানে লইয়া যাইবার জন্য স্বতন্ত্র মজুরী আট টাকা পাঁচ আনা আমাদের অতিরিক্ত লাগিয়াছিল। খরিদ-করা ডাণ্ডিখানি দোকানে ফেরত দিবার কারণ এই, যদি দোকানদার ইহার ভগ্নাবস্থা দেখিয়া কিছু মূল্য ফেরৎ দিতে স্বীকৃত হন। এ সকল বিষয়ে যাহা কিছু বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক, সমস্তই আমাদের তপোবনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ অনুভবানন্দ মহারাজ স্বেচ্ছায় ভার লইয়াছিলেন। আমাদের মত গৃহী ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট হইতে শুধু উপকারই গ্রহণ করিয়া আসিল; এজন্য তাঁহার নিকট চিরদিনের জন্য ঋণী হইয়াই রহিয়া গেলাম।

সকলের প্রাপ্য মজুরী শেষ করিয়া দিয়া আমি ও শ্রীমান্ নিত্য-নারায়ণ পূর্ব্ব হইতেই আগত তিন জন কৈলাসযাত্রীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। ইঁহাদের নাম, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নলিন-বিহারী গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত শীতাংশু সরকার। প্রথমোক্ত দুই জনের কলিকাতায় নিবাস। বয়সে নবীন হইলেও, ইঁহারা মেডিকেল কলেজ হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার এবং শেষোক্ত ভদ্রলোকটিও এই ডাক্তারী বিদ্যা উক্ত কলেজেই এখনও শিক্ষা করিতেছেন। ইঁহার নিবাস উলুবেড়িয়ায়। বিদেশে, বিশেষতঃ কৈলাসের মত দুর্গম পার্ব্বত্য পথে, হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত হিমের রাজ্যে একসঙ্গে এই আড়াই (?) জন ডাক্তার আমাদের সহযাত্রী হইবেন, এ সংবাদে সমতলবাসী আমরা—একে বাঙ্গালী, তায় স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে "কৈলাস"-দর্শনোৎসাহী হইয়াছি, এ ক্ষেত্রে সে সময়ে মনে কিরূপ সাহস লাভ করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে।

রুমা দেবী এইখানেই আছেন শুনিয়া তাঁহার দর্শনাভিলাষে মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। আমরা পাহাড়ের কোলে সরকারী রাস্তার অতি নিকটেই, তপোবনের চারিখানি ঘর-সংলগ্ন-বারান্দায় উপস্থিত ছিলাম। ঘরগুলির দুইখানিতে ঔষধপত্রাদি ও ডাক্তারের রোগী দেখার ব্যবস্থা ছিল ; এবং অপর দুইখানিতে স্বামীজী ও আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখান হইতে প্রায় দেড় বিঘা জমি আন্দাজ দূরে, একটু নীচে আসিয়া আশ্রমের মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহারই নিকটে রান্নাঘরের সহিত আরও তিনখানি ছোট ছোট ঘর সংলগ্ন রহিয়াছে। তাহারই একটি ঘরে দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটির থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রুমা দেবী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কৈলাসযাত্রীদিগের মধ্যে এই

রুমা দেবী চিরদিনই প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। উড্ ষ্ট্রীট-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে সময়ে "কাশ্যপের" সহিত "কৈলাস" প্রভৃতি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন এই রুমা দেবীর ইতিবৃত্ত "মডার্ণ রিভিউ"এ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি নিজে এই যাত্রায় বাহির হইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রমুখাৎ এই রুমা দেবীর ও কৈলাসযাত্রার আবশ্যক-দ্রব্যাদি কি কি লাগে, তাহার ইতিবৃত্ত শুনিয়াছিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয়ও তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনীতে এই রুমা দেবীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। সেইজন্যই এই তীর্থ-সেবী আশ্রমবাসিনীর দর্শনলাভের আশায় ব্যগ্র হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমরা যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, দিদি ও সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটিকে লইয়া তিনি তখন আশ্রমের সমস্ত "খুঁটিনাটী" অর্থাৎ কোথায় কোন্ ঘর, কোন্খান দিয়া কালী-নদীতে স্নানে যাইবার পথ, কোন্খানে বা রান্না করিবার স্থান ইত্যাদি দেখাইতে ব্যস্ত ছিলেন।

আমরা তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলে এই "আমাদের রুমা দেবী" বলিয়া দিদি তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমাদের দেখিয়া রুমা দেবী যেন চির-পরিচিতের মত কত মিষ্ট স্বরে "আইয়ে, বৈঠিয়ে, আপলোগ কৈলাসযাত্রী—ভাগ্যবান্ হ্যাঁয়" ইত্যাদি নানাপ্রকার আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে মন্দিরাদি দেখিয়া সেখান হইতে উপরে ফিরিবার কালে তিনি "দেখিয়ে, আপলোগ নয়া আদমী," "কুছ তক্লীফ ন হোয়," "আপলোগোঁকে সেবা মে হম্ হাজির হ্যাঁয়" ইত্যাদি বিনয়-মধুর বাক্যে অল্পক্ষণ মধ্যে আমাদিগকে আপন করিয়া লইলেন।

স্বামীজীদের মধ্যে এ সময়ে কালিকানন্দজী মহারাজ এখানে যাত্রীদিগের সুখ-সুবিধার যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটি না হয়, তজ্জন্য বিশেষ তৎপর ছিলেন। এখানে যে কয় দিন আমাদের থাকিতে হইয়াছিল, আমরা বেশ আনন্দেই দিনযাপন করিতে পারিয়াছি। কালিকানন্দজী মহারাজ আশ্রমের জন্য প্রত্যহই গ্রামের মধ্য হইতে হাট-বাজার-দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া আনিতেন। তরকারীর মধ্যে সে সময়ে কেবল কাঁচকলারই যথেষ্ট আমদানী ছিল। আমাদের মত নিরামিষাশীর পক্ষে তাহা অতীব উপাদেয় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইত। যাত্রীদিগের মধ্যে পাবনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন সদাচারসম্পন্ন, প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি। আসিয়া অবধি মন্দির-ঘরের বারান্দার এক পার্শ্বে এক স্থান লইয়া, প্রত্যহই একবারমাত্র স্বপাক নিরামিষ আহারে দিনযাপন করিতেন। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ চিরদিনই আমিষপ্রিয়, এ জন্য সেখানে তিনি প্রায়ই আহারকালে স্বামীজী ও ডাক্তারদিগের দলে যোগদান করিতেন।

চারিধারে পাহাড় থাকিলেও অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে শীত অপেক্ষাকৃত কম। কারণ, এখানকার উচ্চতা তিন হাজার ফুটের বেশী হইবে না। আশ্রমে তিন-চারিটি গরু আছে, মধ্যে মধ্যে রুমা দেবী আমাদিগকে তাহার খাঁটি দুগ্ধ খাইতে দিয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। এ দিকের পাহাড়ীরা অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে খাঁটি ঘৃত বিক্রয় করিয়া থাকে। স্বামীজীর কথামত আমরা এখান হইতে কিছু ঘৃত, আটা ও চিনি খরিদ করিয়া তৎসংযোগে একপ্রকার মিঠাই প্রস্তুত করিয়া কৈলাসের পথে ব্যবহার জন্য সঙ্গে রাখিলাম। এখানে এই তপোবনের একটু ইতিবৃত্ত পাঠকবর্গকে জানান আবশ্যক মনে করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই তপোবনটি ধারচুলা হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে, সরকারী রাস্তার

নিকটেই অবস্থিত। আশ্রমের নীচে অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে কালী-নদী বিপুলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিকেই উন্নত পাহাড়। সে সকল পাহাড়ের উপরে প্রায়ই মৃগাদি দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে কতকটা সমতল ক্ষেত্রের উপরে আশ্রমটি স্থাপিত হইয়াছে। নিকটেই গরম জলের একটি ঝরণা আছে। আশ্রমের এই জমি, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত আস্কোটের রাজওয়ারা সাহেবের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমৎ অনুভবানন্দজী মহারাজ ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া, বহু কষ্টে আশ্রমের নামে উক্ত রাজওয়ারা সাহেবের নিকট হইতে এই জমির দান-পত্র লিখাইয়া লইয়াছেন। ইং সন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উক্ত অনুভবানন্দজী মহারাজ ও স্বামী বীরেশানন্দজী শ্রীকৈলাস ও মানস দর্শনের আশায় যখন এই অঞ্চলে আসেন, তখন এখানকার ভুটিয়াবাসী-দিগের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া ইহাদের যত্নে ও সাহায্যে এতদঞ্চলবাসী ও কৈলাস-যাত্রীদিগের সেবার্থে তপোবন-প্রতিষ্ঠার প্রথম আয়োজন হয়। এই শুভ আয়োজনে আমাদের এই রুমা দেবী ও শ্রীমতী হিমতী পাধানী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও সাহায্য না পাইলে ইঁহারা এত শীঘ্র এ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এই আশ্রমে ইং সন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শিবপ্রতিষ্ঠা করা হয়। সে সময়ে দ্বিতীয়া মহিলা হিমতী পাধানী একখানি পাকাঘর ও মন্দির নির্ম্মাণজন্য সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ভুটিয়াবাসিগণের চেষ্টায় এইরূপে আরও একখানি পাকা বাড়ী তৈয়ার হইয়াছে। আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ অনুভবানন্দজী মহারাজ অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রমে এই আশ্রমে বর্ত্তমান সময়ে একটি চিকিৎসালয় গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। আজ চারি বৎসর যাবৎ এই হাঁসপাতালের কার্য্য সুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছে। এতদঞ্চলে

প্রায় আড়াই শত, তিন শত মাইল পথ অর্থাৎ তিব্বত পর্য্যন্ত আর কোন চিকিৎসালয় নাই। সুতরাং ইহার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় পাহাড়ীরা ও কৈলাস-যাত্রীরা খুবই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই চিকিৎসালয়ের ডাক্তার একজন উদীয়মান বাঙ্গালী যুবক, নাম শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পালধি এল্, আর, এফ্, মহাশয়। ইনি হুগলী জেলার ঠাকুরাণীচক গ্রামের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র পালধি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইং সন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি এই হাঁসপাতালে মেডিকেল অফিসার হইয়া আসিয়াছেন। ইনি আসা পর্য্যন্ত তপোবনটির শ্রী আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। যাহাতে এই আশ্রম ও হাঁসপাতালের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, রোগীদিগের সেবা-শুশ্রূষা ও থাকিবার জন্য যথোচিত সুব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য স্বামীজী মহারাজ এ সময়ে ভিক্ষাঝুলি হস্তে দ্বারে দ্বারে প্রার্থী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার এই শুভ উদ্দেশ্যে সকলেরই শক্তি অনুসারে সাহায্য করা উচিত। আশ্রমের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, ঔষধপত্রাদি খরিদ করিবার জন্য আলমোড়ার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রতি বৎসরে তিন শত ষাট টাকা এবং যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট্ মেডিকেল বোর্ড বার্ষিক চারি শত টাকা ডাক্তারের বেতনের জন্য সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। আলমোড়া হইতে এত দূরে পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝখানে মিশনের এই সেবাব্রতের আয়োজন বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসার্হ।

এই ধারচুলা তপোবন হইতে সকল কৈলাসযাত্রীরই একযোগে যাত্রা করিবার কথা হইয়াছিল। এখান হইতে আগে যাইয়া যে সকল গ্রাম বা মণ্ডি পড়িবে, সেখানে খাদ্যদ্রব্যাদির মধ্যে দুই এক স্থানে ঘৃত, আটা, গুড় বা মিছরী পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কৈলাস হইয়া পুনরায় ধারচুলা পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিতে মাসাধিককাল পথে খুঁটিনাটি অনেক কিছুরই আবশ্যক হইতে পারে, এই মনে করিয়া আমাদের মধ্যে প্রত্যেক যাত্রীই

অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া লইলেন, কাহার কোন্ কোন্ জিনিষ লওয়া এখনও বাকী রহিয়াছে। আমরা একে গৃহী, তায় দুই দুইজন স্ত্রীলোক সঙ্গে, এই দুর্গম পথের পথিক হইয়া না জানি কতই না কষ্ট ভোগ করিব, এ ধারণা স্বতঃই আমাদের মনে উদয় হইতেছিল। কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীজী পাঁচজনেরও এ সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা যে কম চিন্তা ছিল, ইহা যেন পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ মনে না করেন। কেরোসিন তৈল হইতে, পথে পরিধানের কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার সাবান পর্য্যন্ত খরিদ করিয়া লওয়া হইল। তপোবনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ অনুভবানন্দজীর নিকটে এ সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু উপদেশ পাইয়াছি, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক কৈলাসযাত্রীর কৈলাসযাত্রার পূর্ব্বে, পথে এই তপোবনে বিশ্রামলাভ করিয়া, উক্ত স্বামীজীর নিকট হইতে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জানিয়া তবে কৈলাস যাইবার ব্যবস্থা করিলে যাত্রিগণ পথের কষ্ট অনেকটা বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইবেন।

যাত্রিগণ যাঁহারা আমিষভক্ত অর্থাৎ মাংস-প্রিয়, তাঁহাদের এ পথে অগ্রসর হওয়া তাদৃশ কষ্টসাধ্য নহে। তাঁহারা অল্পমূল্যেই ছাগ বা ভেড়ার মাংস সংগ্রহ করিতে পারেন। একটু মশলা সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেই ওখানে সুলভ ঘৃত ও লবণসংযোগে তাঁহাদের এই মাসাধিককাল যাত্রার পথে, রসনায় এক প্রকার উপাদেয় বস্তুই লাভ হইয়া থাকে। তাহাতে বিশেষ কিছু অরুচি জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না। অধিকন্তু দুর্গম শৈল-শিখরে চড়াই-উতরাই করিতে তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত হইতেই দেখা যায়। কিন্তু আমাদের মত নিরামিষাশীর পক্ষে এ পথে কোথায় আলু, কোথায় বড়ি (মশলাযুক্ত), কোথায় অরুচির মুখে তেঁতুল বা আচার—এই সব সংগ্রহ করিয়া রাখা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামীজীদের মধ্যে কালিকানন্দজী এবং গৃহস্থ যাত্রীর

মধ্যে পাবনানিবাসী শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এবং উত্তরপাড়া-নিবাসী ঘোষ মহাশয় নিরামিষাশী ছিলেন। বাকী সকলেরই অর্থাৎ কলিকাতা-নিবাসী ডাক্তার কয় জন, অপরাপর স্বামীজীরা, শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ ও ভূপ সিং—ইঁহাদের এ পথে মাংসের আস্বাদ খুবই তৃপ্তিকর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এ ব্যাপারে আমিষ-প্রিয় স্বামীজী, তথা ডাক্তারদিগের দলে শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ যোগদান করিয়া যেমন তাঁহাদের নিকট ক্রমশঃ প্রিয় হইয়া উঠিতেছিলেন, এ দিকে কালিকানন্দজীও আমাদের দলে ভিড়িয়া আমাদিগকে ততোধিক আনন্দ দান করিতে বিরত ছিলেন না। এইরূপে আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়া যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিলাম। এ কয় দিনে শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আমাদের সহযাত্রী ডাক্তারদিগের "এমিটিন্ ইন্জেকসনে" (যদিও আমাদের সঙ্গে বেঙ্গল কেমিকেলের ঔষধাদির বাক্স ছিল) সে যাত্রায় অল্পেই রোগের নিবৃত্তি হইয়াছিল। জিনিষপত্র যাহার যাহা খরিদ করা বাকী ছিল, কালিকানন্দজীর দ্বারা এখানে ক্রমশঃ তাহা সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইল। দেখিলাম, বাজারদর মোটের উপর এখানে মন্দ নহে! যাহা এ পথে মূল খাদ্য বলা যায়, অর্থাৎ ঘৃত, আটা এখানে উৎকৃষ্ট ও সুলভ। খাঁটি ঘৃত টাকায় তের ছটাক, আটা টাকায় নয় সের, মিছরি ও চিনি টাকায় দেড় সের; গুড় (ভেলি) বারো আনায় আড়াই সের, লবণ তিন আনায় এক সের হিসাবে যাত্রিগণ পাইতে পারেন। চাউল খুব পুরাতন না পাওয়া গেলেও নূতন পাওয়া যায়। তরকারীর মধ্যে আলু পাইলাম না। আলমোড়া হইতে ক্রীত আলুই আমাদের ভরসা ছিল। এখানে শুধু কাঁচা ও পাকা কলার রাজত্ব বলা যাইতে পারে। যাত্রিগণ ছয় গণ্ডা মাত্র পয়সা খরচ করিলেই এক কাঁদি কলা পাইতে পারেন। পথে আর যদি কোথায়ও আলু না

পাওয়া যায়, এই ভয়ে, যে কয় দিন এখানে থাকা হইল, বাঙ্গালাদেশের মত "মোচার ঘণ্ট," "থোড়ের ছেঁচ্‌কি" এবং কাঁচকলার তরকারীই আমাদের প্রধান খাদ্য হইয়াছিল। এখান হইতে যাত্রার সময়েও এক কাঁদি কাঁচকলা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। 'অযাত্রা' বলিয়া যদিও ইহার একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে, তথাপি এই কাঁচকলা সঙ্গে ছিল বলিয়া শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের আমাশয় রোগে ইহা ধ্বন্বন্তরীর মত কার্য্য করিয়াছিল।

এই সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া লইতে ৩।৪ দিন বিলম্ব হইয়া গেল। পথে আসিতে সরযূতটে (শেরাঘাটে) একদল পঞ্জাবযাত্রী কৈলাস-উদ্দেশে আসিতেছিলেন দেখিয়া অবধি আমরা সকলেই তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহারা আসিয়া না পৌছায়, আর কেহই বিলম্ব করিতে চাহিলেন না; যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অগত্যা অনুভবানন্দজী এইবার "খেলা" নামক গ্রামের 'জুম্মা' হইতে কুলী সংগ্রহ করা আবশ্যক মনে করিলেন। গার্ব্বিয়াং প্রভৃতি স্থানে যাইতে গেলে সাধারণতঃ এখান হইতেই কুলী ভাড়া করা হইয়া থাকে। এই কুলীদিগের সর্দ্দার-শ্রেণীকে এ সকল দেশে 'প্রধান' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। প্রধানকে ডাকা হইলে তদনুসারে প্রধান আসিয়া তপোবনে উপস্থিত হইল এবং যাত্রীর দল, তথা তাঁহাদের প্রত্যেকের লগেজের বহর দেখিয়া প্রথমটা সে এক গাল হাসি হাসিয়া, সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ ও ভাড়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল। যাত্রীদিগের মধ্যে দুইজন স্ত্রীলোক-যাত্রী দেখিয়া, তাঁহারা কিরূপে যাইবেন, এ কথাটা প্রথমেই প্রশ্ন করায় স্বামীজী বলিলেন, "ইঁহারা আলমোড়া হইতে বরাবর ডাণ্ডিতে আসিয়াছেন।" গার্ব্বিয়াংএ ডাণ্ডি সহযোগে তোমরা লইয়া যাইতে পারিবে কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে প্রধান একবারেই অস্বীকার করিল।

চড়াই-উতরাইয়ের সংকীর্ণ পথে ডাণ্ডি লইয়া যাওয়া একবারেই চলে না, এ কথা স্পষ্টতঃ জানাইয়া দিলে স্বামীজী অগত্যা এক অভিনব বাহনের ব্যবস্থা করিলেন। সে বাহনের ব্যবস্থা শুনিয়া আমরা সকলেই একযোগে হাসিয়া উঠিলাম। পাঠকবর্গ, আপনারাও এই অভিনব বাহনের ব্যবস্থা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কারণ, এ বিষয় কল্পনা করিতে গেলে, একমাত্র মহাপ্রস্থানেরই চিন্তা আসিয়া মনে উদয় হইয়া থাকে। আর পাঠিকার মধ্যে যদি কাহারও কৈলাস-দর্শনের সাধ হইয়া থাকে, তবে যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহারও একবার এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া লওয়া আবশ্যক।

কৈলাস মহাপ্রস্থানের পথ বলিয়া, হয় ত সে পথে যাইবার ব্যবস্থা তাহারই অনুরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। ছয় সাত হাত লম্বা একটি বাঁশের দুই দিকে মজবুত দড়ীর দ্বারা একটি মজবুত সতরঞ্চি বা কম্বলের দুই দিক বাঁধিয়া একটি ঝোলা প্রস্তুত করা হয় তারপর সেই ঝোলায় আরোহী পা ঝুলাইয়া বসে এবং সেই বাঁশেই বাম হাতের ভার রাখিয়া একটু কুব্জ হইয়া আগাগোড়া পথ অর্থাৎ গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ মাইল তাহাকে একইভাবে যাইতে হয়। অবশ্য বাঁশটিও সেরূপ মজবুত হওয়া আবশ্যক। এ ব্যবস্থার কথায় আমাদের সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকদ্বয় উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং উপায়ান্তর না থাকায় অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এ যাবৎ নব্বুই মাইল পথ তাঁহারা ডাণ্ডিতে আসিয়াছিলেন। ইহাতে আসার একটা সুবিধা ছিল। ইহার অগ্রে ও পশ্চাতে দুইজন করিয়া চারিজন লোক বাহক থাকায় আরোহী "তম্-জমে" যাইবার মত বসিয়া এক প্রকার আরামেই যাইতে পারেন। ইহাতে কেবল প্রশস্ত পথের আবশ্যক করে। গার্ব্বিয়াংএর মত সংকীর্ণতর—অপ্রশস্ত পথে চড়াই-উতরাই অতিক্রম করিতে এইভাবে

পাশাপাশি দুইজনে যাইবার উপায় না থাকায় এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ সে সময়ে অসুস্থ থাকায় তাঁহার সম্বন্ধেও যাইবার এই উপায় স্থির হইয়া গেল। তিনজনের তিনটি বাহনের জন্য তিনটি বাঁশ তিন টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া তাহাতে বাঁধিবার উপযোগী দড়ি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইল। প্রত্যেক বাহনের জন্য এই সুদীর্ঘ পথে চারিটি করিয়া কুলী নিযুক্ত করা আবশ্যক, এ কথা প্রধান জানাইল। প্রথম কুলীদ্বয় শ্রান্ত হইলে অন্য কুলীদ্বয় আবার বাহক হইবে, এই নিয়মে তিনটি বাহনে মোট বারোটি কুলীর আবশ্যক-স্থলে প্রধান আরও একটি কুলী অতিরিক্ত লইয়া যাইবার পরামর্শ দিল। তাহার কারণ, পথে কেহ অসুস্থতা বোধ করিলে এই কুলী তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। তাহা ছাড়া এই কুলীর স্কন্ধে কুলীদিগের নিজ নিজ আস্‌বাব ও খাদ্যাদি রাখাও চলিতে পারে। এস্থলে একটি কথা পাঠকবর্গের জানা উচিত যে, আরোহীর শরীরের বহর বা ওজন বেশী হইলে বা বাহকগণের মধ্যে সেরূপ শক্তিসম্পন্ন না থাকিলে প্রতি আরোহী পিছু বাহকের সংখ্যা ঊর্দ্ধতম ছয়জন পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইয়া থাকে।

দুর্গম পার্ব্বত্য পথে অপ্রত্যাশিত বিপদ আসা অস্বাভাবিক নহে, তাই সব দিক বিবেচনা করিয়া আমরা প্রধানেরই কথার সমর্থন করিলাম। গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত যাইতে প্রত্যেক কুলীর ছয় টাকা হিসাবে মজুরী চুক্তি হইল। এই তেরটি কুলী ছাড়া আমাদের বোঝা লইবার জন্য আরও সাত জন কুলীর আবশ্যক হইবে, এ কথা প্রধান জানাইলে, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রতি কুলী কত ওজন আন্দাজ মাল লইতে পারিবে?" উত্তরে ত্রিশ সের পর্য্যন্ত মাল লইয়া যাইতে পারিবে, এ কথা বলায়, আমাদের পাঁচ মণের অধিক মাল আছে, ইহা সে অনুমানে বুঝিয়া লইয়াছিল। বোঝা দেখিয়া তাহার ওজন

সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্ম ধারণা তাহাদের কিরূপে হইয়াছে, ইহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। স্বামীজীর কথামত এই কুড়িজন কুলীর প্রত্যেককে এক টাকা হিসাবে কুড়ি টাকা বায়না দিবার কথা উঠিল, এবং কৈলাস হইতে ফিরিবার কালেও যাহাতে এই কুলীগণই এখান হইতে আবার গিয়া গার্ব্বিয়াং হইতে আমাদিগকে লইয়া আসে, তজ্জন্য স্বামীজী ছয় টাকা হিসাবেই মজুরী ঠিক করিয়া অগ্রিম এক টাকা হিসাবে দিবার পরামর্শ দিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময়ে খাদ্যদ্রব্যাদির মোট কিছু কমিয়া যাইবে বিবেচনায়, আমরা ফেরতকালীন সর্ব্বসমেত আঠারো জন কুলীর ব্যবস্থা রাখিয়া আটত্রিশ জনের যাতায়াতের মজুরী হিসাবে মোট আটত্রিশ টাকা অগ্রিম দিয়া প্রধানের টিপ-সহি লইয়া রাখিয়া দিলাম। গার্ব্বিয়াং হইতে কবে আমরা ধারচুলার দিকে ফিরিতে পারিব, তাহা যথাসময়ে কুলীদিগকে জানাইবার ব্যবস্থা হইবে এ কথা স্বামীজী বলিয়া রাখিলেন।

ফিরিবার সময়ের কুলীর ব্যবস্থা এত আগে হইতে কেন করা হইতেছে, এ কথা যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে তিনি বলিলেন, "গার্ব্বিয়াং হইতে ফেরতকালে সেখান হইতে কুলী সংগ্রহ করিতে অনেক সময়ে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। বিশেষতঃ "নীরপানির" পুল ভাঙ্গিয়া গেলে গার্ব্বিয়াংএর কুলীগণ এ পথে সহজে আসিতেই চাহে না।" এমত অবস্থায় এ ব্যবস্থা করা তিনি শ্রেয়ঃ মনে করেন। সুতরাং প্রত্যেক যাত্রীরই ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, ধারচুলা হইতে গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত যাইবার কুলী ঠিক করিবার সময়ে উহাদের মজুরী একেবারে যাতায়াত হিসাবে চুক্তি করিয়া রাখিলে একদিকে যেমন সময়ে আসিবার সুবিধা হইয়া থাকে, অন্য দিকে মজুরী সম্বন্ধেও দেখিতে গেলে আসিবার সময়ে সমান মজুরীতেই কুলীগণ ফিরিয়া আসিবার

শ্রম স্বীকার করে। গার্ব্বিয়াং হইতে ধারচুলায় আমদের ফিরিবার সময়ে এই কুলীগণই আমাদিগকে আনয়ন করিয়াছিল। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে নীরপানির পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কুলীদিগকে কিছু অতিরিক্ত বখশিশ্ দিতে হইয়াছিল। পাঠকবর্গ এ বিষয় পরে জানিতে পারিবেন।

উত্তরপাড়া হইতে কয়েকজন কৈলাস-যাত্রী গত বৎসরে স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে আসিয়া এসকল স্থানের কুলীদিগকে যথেষ্ট অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া কুলীদিগের মজুরী সম্বন্ধে বাজার (Rate) খারাপ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, এ কথা স্বামীজী এবং প্রধানের মুখেও ব্যক্ত হইয়া পড়িল। যাহা হউক্, এইরূপে সকল যাত্রীরই বোঝা অনুযায়ী মজুর ও মজুরী ঠিক হইয়া গেল। প্রত্যেক যাত্রীই প্রত্যেক কুলীর জন্য অগ্রিম দিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যাত্রার পূর্ব্বদিনে পূর্ব্ব-পরিচিত পঞ্জাবী-যাত্রীর দল হইতে জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত বিপদের সংবাদ জানাইলেন। তাঁহাদের যাত্রীর দলে প্রায় সকলেরই "হৈজাকা বিমারীর" (কলেরার) প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, এবং সকলেই বালুয়াকোটে নিরাশ্রয় অবস্থায় মৃতবৎ অপেক্ষা করিতেছেন। সেখানে সেবা-শুশ্রূষা-চিকিৎসাদির কিছুই ব্যবস্থা নাই। নিরুপায় হইয়া তিনি এখানে স্বামীজীকে সংবাদ দিবার জন্য আগেই চলিয়া আসিয়াছেন।

এ দুর্গম তীর্থযাত্রার পথে যাত্রীর মুখে "হৈজাকা বিমারী"র কথা "কাগজে-কলমে" বহু দিন হইতেই শুনিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আজ চোখের সম্মুখে সহসা তাহার বাস্তব অবস্থা অনুভব করিয়া, আমাদের তপোবনের সকল যাত্রীই যুগপৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং বালুয়াকোটের সেই জঙ্গলের মাঝখানে দুর্গন্ধ-পরিপূর্ণ উন্মুক্ত ঘরে রোগীদের সে সময়ে কিরূপ অবস্থা হইতে পারে, মনে মনে কল্পনা করিয়া সকলেই শিহরিয়া

উঠিলেন। স্বামীজী উপস্থিত এ বিষয়ে কি সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহারই আলোচনা চলিতে লাগিল। অবশেষে রোগীদিগকে এখানে আনাই যুক্তিযুক্ত, ইহাই সাব্যস্ত হওয়ায়, স্বামীজী আমাদিগের কুলীর দলকে ডাকিয়া মজুরী স্থির করিয়া লইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিনব যানের দরুণ ক্রীত তিনটি বাঁশ এবং আমাদের সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটির ডাণ্ডিখানি লইয়া সেই সকল কুলী সমভিব্যাহারে বালুয়াকোট অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কোথায় সে দিন কৈলাস-অভিমুখে অগ্রসর হইবার সুব্যবস্থা হইতেছিল, সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া যাত্রা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, তাহা না হইয়া, সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত বিপদ্। কৈলাসযাত্রার পথে সে দিন কৈলাস-পতির মনের ইচ্ছা কি ছিল, তাহা তিনিই একমাত্র বলিয়া দিতে পারেন। স্বামীজীর কথামত আমাদের যাত্রা সে দিন স্থগিত রহিয়া গেল।

পরদিন পঞ্জাবী-যাত্রী-রোগীর দল লইয়া স্বামীজী তপোবনে ফিরিলেন। দলের মধ্যে দলের কর্ত্তা "সিয়ারামজী" একজন সাধকবিশেষ। তিনিই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহার ভক্ত শিষ্যমণ্ডলী অপরাপর কৈলাসযাত্রিগণের মধ্যে আরও দুইজন এই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া, তাঁহাদের আগমনে এখানকার হাঁসপাতালে সাড়া পড়িয়া গেল। স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত পালধি মহাশয় স্বীয় স্বভাব-সিদ্ধ বিচক্ষণতার সহিত রোগিগণের চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে তৎক্ষণাৎ তৎপর হইলেন। সেবাব্রতধারিণী রুমা দেবীর তখন আবার দ্বিগুণ উদ্যমে সেবাকার্য্য চলিতে লাগিল। সে সময়ে তাঁহাদের অসাধারণ শিষ্টতা, ধৈর্য্য ও রোগীদিগের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করার তৎপরতা দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা সকলে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

পঞ্জাবীদলের রোগের সংবাদদাতা অর্থাৎ যিনি প্রথমে আসিয়া এখানে রোগের সংবাদ দিয়াছিলেন, পরিচয়ে জানা গেল, তিনি একজন বাঙ্গালী সাধুবিশেষ, নাম বিবেকানন্দ স্বামী। তাঁহার সাধুজনোচিত অমায়িক ব্যবহারে এই পঞ্জাবী-যাত্রীর দল সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল দেখিলাম। স্বয়ং সিয়ারামজী তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন। তিনিই এই সাধুটিকে স্নেহের আতিশয্যে এই সুদূর কৈলাস পর্য্যন্ত সঙ্গের সাথী করিয়া আনিয়াছেন, এ সংবাদে সে সময়ে আমরা বাঙ্গালী-যাত্রীর দল সকলেই মনে মনে গৌরব অনুভব করিয়াছিলাম।

একে আমরা সংখ্যায় নিতান্ত কম নহি, তাহার উপর এই রোগীর দল তপোবনে ভর্ত্তি হওয়ায়, তপোবনের প্রায় সকল ঘরই যাত্রিপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে দিন কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইয়া দেওয়া হইল। পরদিন যাত্রা সাব্যস্ত হওয়ায়, আমাদের দল শীঘ্র শীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া কুলীদিগকে লইয়া তাহাদের হিসাবমত আপন আপন আস্‌বাব-পত্রাদি বাঁধিবার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পঞ্জাবী-যাত্রীর দলের যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও, রোগীদের আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীজী তাঁহাদের এখানে হাঁসপাতালেই থাকিবার পরামর্শ দিলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত পালধি মহাশয়কে এই সকল রোগীর চিকিৎসা ও পথ্যাদি সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থার ভার দিয়া স্বামীজী নিজে আমাদেরই সঙ্গে যাইবেন, এইরূপ স্থির হইয়া গেল। যাত্রার পূর্ব্বে রুমা দেবীর জন্য আমরা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম, বিশেষতঃ দিদি এখানে আসিয়া অবধি তাঁহার প্রতিদিনের প্রতি কার্য্যের সাহচর্য্যে এতই অভিভূত ছিলেন যে, রুমা দেবীকেও কৈলাসে সঙ্গিনী করিবার মতলব আঁটিতেছিলেন। রুমা দেবী যদিও বহুবার কৈলাসতীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি এ বয়সে

আমাদের সহিত তাঁহাকে কৈলাসে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাবে, তাঁহাকে সে সময়ে যথেষ্ট উৎসাহিত ও আনন্দিত হইতে দেখিয়া মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত প্রমোদ বাবু কৈলাসযাত্রার পথে তাঁহাকে সঙ্গিনীরূপে পাইয়া, তাঁহার প্রতি কেন এতদূর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন। পরোপকার-সেবা-ধর্ম্মে, জগতের মাঝে যাঁহারা এইরূপ প্রসন্নচিত্তে নিজের সুখদুঃখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে সমর্থ হ'ন, এ যুগে তাঁহারা মানবী হইয়াও দেবী। তাঁহাদের নিকট স্বতঃই আমাদের চিত্ত শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়ে। যাহা হউক্, আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, শ্রীমদ্ অনুভবানন্দজী ও রুমা দেবী উভয়ের একযোগে এই রোগীর দল ত্যাগ করিয়া কৈলাসে যাওয়া কোন-মতেই এ সময়ে সম্ভবপর নহে।

চতুর্থ পর্ব্ব

ধারচুলা হইতে গার্ব্বিয়াং

৩রা জুলাই, বুধবার, বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে আমরা সকলেই যাত্রা করিলাম। আমাদের সহিত পূর্ব্বপরিচিত আড়াই জন ডাক্তার (কারণ, একজন ছাত্র-ডাক্তার ছিলেন), উত্তরপাড়ার যাত্রী তিনজন, পাবনার ভদ্রলোকটি এবং পাঁচজন স্বামীজী সহযাত্রী হইলেন। সকলেই নিজ নিজ আস্‌বাবপত্রাদি প্রথমে কুলীদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিলেন। তাহারা আপন আপন বোঝা লইয়া আগেই অগ্রসর হইয়া গেল। ইহাদের বোঝা লইয়া যাইবার রীতি দার্জ্জিলিংএর কুলীদের অনুরূপ দেখা গেল। ইহারা পৃষ্ঠদেশে বোঝা ঝুলাইয়া দড়ির দ্বারা বাঁধিয়া দড়িকে নিজ নিজ মস্তকের সহিত ললাটে সংলগ্ন রাখিয়া আগে চলিতে থাকে। পর্ব্বতের কঠিন চড়াই-উত্‌রাইয়ের পথে এইভাবে বোঝা লইয়া যাওয়া বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হইবে। তবে বোঝা লইয়া কুলীদের উপরে অবিশ্বাস করিবার (যেমন আমরা সচরাচর এ দেশে করিয়া থাকি) কোন কারণ এখানে নাই। বোঝা বুঝাইয়া দিয়া একা ছাড়িয়া দিলে যথাসময়ে খুঁটিনাটি জিনিষপত্র সমেত গন্তব্য স্থানে তাহাকে আপনি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন। তাহা না হইলে এই সকল পার্ব্বত্য-প্রদেশে বোঝার উপরে লক্ষ্য রাখিয়া কুলীদের সহিত পথে চলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। বোঝা লইয়া কুলীগণ চলিয়া গেলে স্ত্রীলোকদের ও শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের যাইবার তিনটি অভিনব যান প্রস্তুত হইল। তার পর সেই যানে আরোহিত্রয়কে যখন উঠাইবার কথা উঠিল, সে সময়ে

তাঁহাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা একমাত্র তাঁহারাই বলিতে পারেন। তাঁহাদের এই বাঁশের দোলায় যাত্রা দেখিয়া সে সময়ে একটি বাউলের গান আমার মনে হইয়াছিল,—

"বাঁশের দোলাতে চ'ড়ে, কে হে বটে,
শ্মশানঘাটে যাচ্ছ চ'লে।"

ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব তখনকার যুগে সংসারের মায়া কাটাইয়া যে পথের পথিক হইয়াছিলেন, আজ সেই পথে এ যুগের সংসারাসক্ত ভ্রান্তমতি নগণ্য মনুষ্য আমরা—স্ত্রীলোক-যাত্রী লইয়া অগ্রসর হইতে চলিলাম ; জানি না, আগে যাইবার এই অজানা পথে, অতর্কিতে আমাদের অদৃষ্টে কতই না বিপদের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এইরূপ নানা চিন্তায় আমরা একবার কৈলাসপতির উদ্দেশে সে সময়ে সকলেই "কৈলাসপতিকী জয়" রবে সমস্বরে প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিয়া লইলাম। ধারচুলার সম্মুখস্থিত প্রকাণ্ড পাহাড় হইতে তদুত্তরে তাহারই প্রতিধ্বনি যেন ফিরিয়া আসিল। এইরূপে আরোহিত্রয়কে তিনটি দোলায় তুলিয়া দিয়া আমরা আর আর সকলেই পদব্রজে রওনা হইলাম।

কালী-নদীর ধারে ধারে পাহাড়ের পাশ দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। এ পারে বৃটিশ-সীমায় পথের বাম দিকে মস্তকোপরি প্রকাণ্ড পাহাড়, মধ্যে কালী-নদী প্রচণ্ডবিক্রমে অনন্তের উদ্দেশে বহিয়া যাইতেছে ; আর ওপারে নেপালের সীমায় অভ্রভেদী অন্য একটি পাহাড় চোখের সম্মুখে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাস্তা জন-মানবশূন্য, কেবল আমরা কয় জনই যাত্রী—কত দূরের যাত্রী, তাহা জানি না! দিবা প্রহরেও কেমন একটা আতঙ্ক আমাদের সকলের প্রাণ মুহুর্মুহুঃ মুচ্‌ড়াইয়া ধরিতেছিল। নিঃশব্দপদসঞ্চারে সম্মুখের পথ ধরিয়া কখন্ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিব, তাহারই আকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়া একমনে অগ্রসর হইতে-

ছিলাম। ক্বচিৎ দুই একটি কালোবর্ণের পাখী অস্ফুট কাকলী-ধ্বনিতে এ পাহাড় হইতে ও পাহাড়ে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। এখন আর পাহাড়ের গায়ে সেরূপ ঘন ঘন চীর-গাছের শ্রেণী দেখা যায় না। নানা জাতীয় ছোট ছোট পাহাড়ী গাছ কোন স্থানে জঙ্গল, কোথায়ও বা ঝোপের মত করিয়া রহিয়াছে। কোথাও বা দুই একটি পাহাড়ী বৃক্ষ উন্নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া সেখানকার স্বাভাবিক নিস্তব্ধতা প্রচার করিতেছিল। মনে হইতেছিল, ভোগবিলাসবর্জ্জিত শিবের সমাধিক্ষেত্রে কৈলাস দর্শন করিতে গেলে মনুষ্য-জীবনকে বুঝি বা এইরূপ নিস্তব্ধতার উপাসক হইয়াই অগ্রসর হইতে হয়। এইরূপ নানা চিন্তায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ইতঃপূর্ব্বে ধারচুলা পর্য্যন্ত নব্বুই মাইল পথ আমি অশ্বপৃষ্ঠেই আসিয়াছিলাম, এজন্য চড়াই-উত্‌রাই পথে এ পর্য্যন্ত পদব্রজের ক্লেশ আমাকে ভোগ করিতে হয় নাই। সুখের বিষয়, আজিকার এই পাঁচ মাইল আন্দাজ পথ দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়া প্রথমটা বরাবর সমতলভাবেই গিয়াছে। তবে তাহার আশে-পাশে মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট 'বিছুটি'-জঙ্গল পড়িয়াছিল। হাতে পায়ে অতর্কিতে ইহার জ্বালাময় স্পর্শ হইতে আমরা কেহই সে দিন নিষ্কৃতি পাই নাই। এই প্রথম পাঁচ মাইল পথ পদব্রজে যাইতে তেমন ক্লেশ না হইলেও, শেষের দিকে যখন সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ের চড়াই চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, তখন কিন্তু আমার পদদ্বয় আর একটুও অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। আর আর যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ সে সময়ে সেই চড়াইয়ের মাথার উপরে উঠিয়া গিয়াছেন, কেহ বা মাঝখান হইতে আমাদিগকে নীচে দেখিতে পাইয়া, মহোল্লাসে বিজয়ী বীরের মত সম্বোধন করিয়া অনুগমন করিবার সাহস দিয়া আগে উঠিতেছেন; কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি, প্রথম দিনে এই

চড়াই উঠিবার ক্লেশ স্মরণ হইলে আজও আমার হৃদয় "ধুক্-ধুক্" করিয়া উঠে। তবে সে দিন সকলের পশ্চাতে কেবল একা আমিই ছিলাম না। উত্তরপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ঘোষ দুইজনেই আমার সহিত সমান দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছিলেন। বিশেষতঃ চট্টোপাধ্যায়ের পায়ের 'চট্টরাজ' (যাহাকে লইয়া তিনি কৈলাস পর্য্যন্ত যাইতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ) এ চড়াই উঠিতে কিন্তু কিছুতেই 'বাগ' মানিতেছিল না। আমাদের পূর্ব্ব-প্রেরিত কুলীর দল দেখি—বোঝা লইয়া এই চড়াইয়ের মাঝখানে এতক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বোঝা পৃষ্ঠে, ঘর্ম্মাক্তকলেবরে পরিশ্রান্ত ঘোড়ার মত তাহাদের সেই মুহুর্মুহুঃ দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আমাদিগকে আরও কাতর করিয়া তুলিতেছিল। যাহা হউক্, এইরূপে ধারচুলা হইতে প্রায় আট মাইল অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা সকলেই "খেলা"য় আসিয়া পৌঁছিলাম।

খেলায় আট দশ ঘর লোকের বসবাস আছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট কুঠারী আছে। গ্রামের আশ-পাশ দিয়া দুই একটি ঝরণা গ্রামবাসীদিগকে পানীয় জল সরবরাহ করিয়া থাকে। এখানে সরকারের একটি ডাকঘর আছে। তৎসংলগ্ন পর্ব্বতগাত্রে আমাদের অন্যান্য সহযাত্রিগণ ইতঃপূর্ব্বে আসিয়া কেহ কেহ পদদ্বয় ধৌত করিয়া সবেমাত্র বসিয়াছেন, কেহ বা একবারে লম্বমান হইয়া নির্জীবের মত শুইয়া পড়িয়াছেন, আবার শঙ্করনাথ স্বামীজীর মত কঠিন চড়াই-উত্‌রাই-পথে অবাধ-ভ্রমণশীল ব্যক্তি এ পথ-ক্লেশে কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ না করিয়াই নিকটস্থ একটি ন্যাসপাতি বৃক্ষের ফলের উপরে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি সেই সন্ধ্যাকালে ইহারই উপাসনা করিবার মতলব আঁটিতেছিলেন। এমন সময়ে আমাদের সেখানে আগমন দেখিয়া "কৈলাস-পতিকী জয়" ধ্বনি-প্রতিধ্বনি উঠিল। দেখিলাম, বাঁশের

দোলার তিনজন যাত্রী তৎপূর্ব্বে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তবে দোলার আরোহী শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ অসহিষ্ণু হইয়া, শরীরকে সোজা রাখিবার নিমিত্ত পথিমধ্যে দুই তিনবার এই দোলা হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে সময়ে ইচ্ছা করিয়া দুই এক মাইল পথ পদব্রজে যাইবার তাঁহার বিশেষ চেষ্টাও হইয়াছিল। এইরূপে এই দোলার জন্য অতিরিক্ত চারিটি কুলীর ব্যয় একবারেই অকারণ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। যাহা হউক্, আমরা এখানে আসিয়া কিছু দূরে আর একটি আশ্রয়-ঘর খুঁজিয়া লইতে বাধ্য হইলাম। কারণ, এ ডাকঘরে এতগুলি যাত্রীর এককালীন সমাবেশ বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হইল।

এ স্থলে পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সুদূর কৈলাসের মত কঠিন দুর্গম তীর্থে যাইতে গেলে যদি একসঙ্গে যাত্রীর দল কিছু বেশী থাকে, তবে পথের ক্লেশ অনেকটা কমিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে একের উৎসাহ বা সাহস কমিয়া গেলে হয় ত দলের উৎসাহ ও সাহস লইয়া তাহা পরিপূরণ করাও যাইতে পারে। তথাপি এ তীর্থের পথে, গ্রামবাসীদের দয়া ভিন্ন থাকিবার বাসোপযোগী সেরূপ ধর্ম্মশালা বা 'চটির' ব্যবস্থা না থাকায়, যেখানেই রাত্রিযাপনের আয়োজন হইয়া উঠে, একটু বেশী কষ্ট স্বীকার বা সহ্য করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, ইহা প্রত্যেক যাত্রীরই বেশ স্মরণ রাখা উচিত। আলমোড়া হইতে ধারচুলা পর্য্যন্ত আসিতে আমরা প্রায় প্রত্যেক দিনই যেখানে রাত্রিকালে বিশ্রাম করিতে গিয়াছি, আমাদের দলের মধ্যে যাঁহারা গন্তব্যস্থানে আগে পৌঁছিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই অপরাপর যাত্রী অপেক্ষা রাত্রিবাসের ঘর বা দুগ্ধাদি-সংগ্রহ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সুবিধা করিয়াই লইতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং দলে বেশী

লোক থাকিলে বিভক্ত হইয়া পর পর দিনে যাইতে পারিলে যাত্রীর পক্ষে কষ্ট কম হইতে পারে। অবশ্য ধারচুলার "তপোবনে"র কথা স্বতন্ত্র। সেখানে সকল যাত্রীই সুখ-সুবিধা পাইয়াছিলেন। একে সেখানে ঘর যথেষ্ট, তায় স্বামীজীদের নিজের বাসস্থান বলিয়া সকলেই সকল বিষয়ে আশানুরূপ সমাদর উপভোগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক্, আমরা একটি দ্বিতল বাটীর নীচের কাষ্ঠাদি আবর্জ্জনা-পূর্ণ কুঠারীর সম্মুখভাগ পরিষ্কার করাইয়া তাহারই এক পার্শ্বে আস্বাবাদি রাখিয়া দিয়া কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হইলাম। বিশ্রামান্তে ষ্টোভে প্রস্তুত খানকয়েক লুচি ও একটু হালুয়া রাত্রিতে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিল।

প্রভাত হইতে না হইতেই সকলেই গাত্রোত্থান করিলাম। রাত্রিতে পিশুর উপদ্রবে কাহারও আদৌ নিদ্রা হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা উঠিলেই কুলীগণ আপন আপন বোঝা ঠিক করিয়া লইয়া আগে চলিবার জন্য ব্যস্ত হইল। আমরা যথাসম্ভব সত্বর হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে আবার গন্তব্য পথে একে একে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এবারে প্রথমেই সম্মুখে দেড় মাইল আন্দাজ পথ উত্‌রাই ছিল। এই উত্‌রাই শেষ করিয়া "ধৌলীগঙ্গা" পার হইলাম। এই ধৌলীগঙ্গা কিছু দূরে গিয়া কালী-নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। চোখের সম্মুখে এইবার একটি প্রকাণ্ড চড়াই আকাশ পর্য্যন্ত ঠেকিয়া রহিয়াছে মনে হইল। উহার পশ্চাতে কোন গ্রাম বা লোকালয় থাকিতে পারে, তাহা এ পাহাড় দেখিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিলাম না। এই চড়াইয়ের পরে "পঙ্গু" গ্রাম আছে বলিয়া পাহাড়ীরা ইহাকে সাধারণতঃ পঙ্গুর পাহাড়ই বলিয়া থাকে। এই উচ্চ পাহাড়ে উঠিবার রাস্তাগুলি এমনভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া উপরে গিয়াছে যে, নিম্ন হইতে ঠিক যেন সর্পের মত বোধ হইতেছিল—বক্রগতি রেখাগুলি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই ভীষণ

চড়াইয়ের পথ মানুষ হইয়া কিরূপে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব, তাহা চিন্তা করিলে কখনই উপরে উঠিতে পারিতাম না। কৈলাসপতির নাম লইয়া দীর্ঘযষ্টি হস্তে, কম্পিতপদে একে একে সকলে পঙ্গুর মত ধীরে ধীরে স্বর্গের সিঁড়ি ধরিলাম। মনে হইতেছিল, কৈলাস যাইবার জন্য এই সিঁড়ি ত্রেতাযুগে রাবণের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। নগণ্য মনুষ্যের দ্বারা ইহার নির্ম্মাণ কোনমতেই সম্ভবপর নহে ইত্যাদি কতই না কল্পনা লইয়া মন আলোড়িত হইতেছিল। যতই উপরে উঠিতেছি, এই পর্ব্বতগাত্রের এক এক স্থানের রাস্তা এতই সঙ্কীর্ণ ও ঢালু হইয়া রহিয়াছে যে, তদুপরি বিস্তৃত উপলখণ্ডে একবার যদি অসংলগ্নভাবে পদদ্বয় পিছলাইয়া যায়, তাহা হইলে আর নিষ্কৃতি নাই। একবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় পাতালগর্ভে বিলীন হইতে হইবে। মনে হইতেছিল, কেনই বা আত্মীয়-স্বজন, সংসার, লোকালয় ত্যাগ করিয়া এই ভয়ঙ্কর পথের পথিক হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল!

যাহা হউক্, প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল একাদিক্রমে চড়াই পথ উঠিতে উঠিতে দূরে পঙ্গু গ্রাম দেখা গেল। বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে এখানকার স্কুল-বাড়ীতে আমরা আসিয়া পৌঁছিলাম। পথক্লেশে সে সময়ে শরীর খুবই গরম ছিল। তথাপি এখানে আসিবামাত্র শীতের অনুভূতি যেন বাড়িয়া উঠিল। সমুদ্রগর্ভ হইতে পঙ্গুর উচ্চতা সাত হাজার ফুটের কম নহে। এখানকার স্কুলবাড়ীটি দ্বিতল এবং অপেক্ষাকৃত সৌষ্ঠব-সম্পন্ন। গ্রামখানি নিতান্ত ছোট নহে। পনেরো কুড়ি ঘর লোকের বসত-বাটী রহিয়াছে। আমরা পৌঁছিতেই গ্রামবাসীরা আমাদিগকে একবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, যেন আমরা তাহাদের নিকটে নূতন জীব হইয়া উদয় হইয়াছি। "কৈলাসযাত্রী"—এই সংবাদ শ্রবণে সেখানকার পাটোয়ারী আমাদিগকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়া দ্বিপ্রহরে স্নান-ভোজন এখানেই

শেষ করিয়া যাইবার পরামর্শ দিল। কুলীরা ইতঃপূর্ব্বে এখানে আসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিল। অবস্থা বুঝিয়া আমরা এখানে বিশ্রামান্তে নিকটস্থ একটি ঝরণায় স্নানাদি শেষ করিয়া ভোজনের অয়োজন করিতে লাগিলাম। নীচে ভয়ঙ্কর মাছির উপদ্রব দেখিয়া পাটোয়ারীর নির্দ্দেশমত স্কুলবাড়ীর দ্বিতলের কুঠারীতে একটা যা' হয় তরকারী ও ভাত রন্ধন শেষ করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইলাম।

আসিবার সময় ডাক্তার কয় জন ভান্‌সিং নামক এক ব্যক্তিকে আলমোড়া হইতে পাচক নিযুক্ত করিয়া বরাবর লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে যথেষ্ট শীত বোধ হওয়ায় ভান্‌সিং তাহার মালিকদের শরীর 'তাজা' রাখিবার নিমিত্ত একটা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। স্থানীয় একজন পাহাড়ীর নিকট হইতে সে এক টাকা মূল্যে একটি জীবন্ত "সীতাপতি-বিহঙ্গম" কিনিয়া আনিয়া লুকাইয়া তাহাকে 'জবাই' করিবার অবসর খুঁজিতেছিল ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জনৈক পাহাড়ী দর্শক তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী বিধবা স্ত্রীলোকটি এ ব্যাপারে পাচককে লইয়া সে সময়ে হৈ-চৈ করিয়া উঠিলেন। ফলে মুরগীটা তাহার চিরপরিচিত মালিকের নিকটেই ফিরিয়া গেল। কিন্তু পাচকের দেওয়া টাকাটি, দুঃখের বিষয়, আর ফিরিয়া আসিল না। এই ব্যাপারে পাচককে লইয়া সে দিন যাত্রীদিগের মধ্যে একটু হাস্য-পরিহাস চলিয়াছিল। বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে আমরা পুনরায় রওনা হইলাম। পঙ্গু হইতে প্রথমেই এক মাইল আন্দাজ পথ উত্‌রাইয়ে নামিয়া আবার একটি চড়াই সম্মুখে পাইলাম। সে চড়াইটি অতিক্রম করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। তথাপি সে চড়াই দুই মাইলের কম হইবে না, ইহা সে সময়ে বেশ বুঝা গিয়াছিল। কারণ, পাঁচটা আন্দাজ সময়ে এই চড়াইয়ের অতিক্রম শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে এবারে যখন উত্‌রাই-পথ

নামিতে আরম্ভ করিলাম, তখন দূরে সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে তুষারবেষ্টিত এক অপরূপ পার্ব্বত্য-সৌন্দর্য্যরাশি অপ্রত্যাশিতভাবে সকলের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে নয়ন-মনোহর দৃশ্যের সমস্ত মাধুরীই এক নিমেষে পান করিয়া যেন নিঃশেষ করিবার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের সে রক্তরাগরঞ্জিত কিরণমালা সেই গগনস্পর্শী পর্ব্বতের তুষার-গাত্রে 'বায়স্কোপের' মত প্রতিক্ষণে যেন নূতন চলচ্চিত্রের অভিনয়চাতুর্য্য দেখাইয়া আপনার অলক্ষ্যে আপন সৌন্দর্য্যে আপনিই বিমোহিত হইয়া পড়িতেছিল। দুঃখের বিষয়, এই অভিনয়-চাতুরীর অনন্ত সৌন্দর্য্য মর-জগতের যাত্রীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই; অজানিত-ভাবে পর্ব্বতের আড়ালে সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানবের দৃষ্টি হইতে একবারে দূরে এইরূপে ছড়াইয়া রহিয়াছে। পাছে আমাদের এই পথশ্রান্ত অন্ধ-নয়ন মোহান্ধকার হইতে চিরোজ্জ্বল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে একবারে চির-নিবিষ্ট হইয়া যায়, তাই বুঝি স্রষ্টা যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মনোরম, সমস্তই কৌশল করিয়া এই চির-দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণীর মাঝখানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

শুনিলাম, এই পাহাড়ের নাম "কালী।" ইহারই তলদেশে "সির্‌দাং।" উত্‌রাইয়ের মুখে নীচে এই গ্রামখানি ছোট ছোট খেলনার মত পরিষ্কার-ভাবে কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে। পার্শ্বে বামদিকে উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে একস্থানে একটি "মিশনরী"দের আড্ডা হইতে ঢং ঢং করিয়া একটি বৃহৎ ঘণ্টা উচ্চরবে বাজিয়া উঠিল। মনে ভাবিলাম, স্থান বুঝিয়া ইহারা আসিয়া উপাসনা-মন্দির এবং ফাঁদ পাতিবার অপূর্ব্ব কৌশল করিয়া রাখিতে বিস্মৃত হয় নাই। সন্ধ্যা ছয়টা আন্দাজ সময়ে আমরা সির্‌দাংএ আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে আসিয়াই শীতে কাতর হইতে হইল। পাটোয়ারীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আমরা নিজেদের রাত্রিতে



সিরদাংএর পথে পাহাড়ের দৃশ্য

থাকিবার একটি বড় ঘরের বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। সে ঘরটি অন্যান্য স্থানের ঘরগুলি অপেক্ষা কিছু বড়। ঘরের একপার্শ্বে আমাদের আপন আপন আস্‌বাবপত্রাদি রাখিয়া দেওয়া হইল।

উত্তরোত্তর আমরা যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই এ সকল গ্রামের ভুটিয়া অধিবাসীদের সাজ-সজ্জার বেশ-একটু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। কার্পাস-বস্ত্রের পরিবর্ত্তে ইহারা এখানে প্রায়ই পশমী বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের আকৃতির রুক্ষতা এবং সাজ-সজ্জার অপরিচ্ছন্নতা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কোনকালে স্নান ইত্যাদি করার অভ্যাস ইহাদের আদৌ নাই। ফলে ইহাদের নিকটে গিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেই, একটা বিষম দুর্গন্ধে নাসিকাদ্বয় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। আরক্ত চোখের কোলে রাশীকৃত 'পিচুটি' সর্ব্বদাই যেন লাগিয়া রহিয়াছে। এই হস্তপদবিশিষ্ট মনুষ্যকে চোখের সম্মুখে দেখিলে, ইহাদের প্রকৃতি সাধারণ মনুষ্য-প্রকৃতি হইতে যে কিছু পৃথক্‌, তাহা সহজেই বুঝা যায়। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ খুব কমই লজ্জাশীলা মনে হইল। ইহাদের সাজ-সজ্জা পুরুষদের অপেক্ষা কিছু পরিষ্কার, এবং স্নানাদি বিষয়ে ইহাদের লক্ষ্যও আছে। অন্যান্য যাত্রিগণ এখানে আসিবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই আমরা এ স্থানে আসিয়াছিলাম। অন্ধকার বুঝিয়া, লণ্ঠনের জন্য কেরোসিন তৈলের আবশ্যক, এ কথা পাটোয়ারীকে জানাইলে সে এক টাকা মূল্যে এক বোতল কেরোসিন তৈল আনাইয়া দিল।

ধারচুলা হইতে স্বামীজীর কথামত আমরা একটি খালি পেট্রোলের টিন ভরিয়া কেরোসিন তৈল খরিদ করিয়া এ যাবৎ বরাবর কুলী-পৃষ্ঠে লইয়া আসিতেছিলাম। শেষের পথে কেরোসিন তৈলের একবারে অভাব পড়িতে পারে, এই বোধে এখনও পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহার বন্ধ

রাখিয়াছিলাম। রাত্রিতে জলযোগের সময়ে একটু দুগ্ধও পাওয়া গিয়াছিল, তাহা আমাদের সের হিসাবে লইতে গেলে আট আনার কমে কোনমতেই পাওয়া যায় না। স্বামীজীরা অপরাপর যাত্রিগণসহ এখানে আসিয়া স্থানীয় স্কুল-বাড়ীতে সে দিন আশ্রয় লইয়াছিলেন।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় রাত্রিকালে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষেই হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া কুলীদিগকে আস্‌বাবাদি বুঝাইয়া দিয়া আবার আগে চলিলাম। প্রথমে প্রায় আড়াই মাইল পথ উত্‌রাই নামিয়া আসিয়া বেলা সাড়ে সাতটা আন্দাজ সময়ে একটি জঙ্গল-পরিপূর্ণ পাহাড়ের মধ্যে একটি চড়াইয়ের পথ ধরিয়া চলিতে হইল। নানা জাতীয় ঘন ঘন বৃহৎ পাহাড়ী বৃক্ষ সে পথ দিনের বেলায় সাধারণতঃ অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। তাহা ছাড়া সে স্থানের হাওয়া এত আর্দ্র যে, পাহাড়ের গায়ে এবং পথে সর্ব্বত্রই একপ্রকার শৈবাল জমিয়া পথগুলিকে খুবই পিচ্ছিল করিয়া তুলিয়াছে। আরও দেখিলাম, আর্দ্রতার আতিশয্যে বড় বড় বৃক্ষগুলির গুঁড়ি এবং প্রত্যেক শাখায় সেই 'শৈবাল' লাগিয়া সে স্থান হইতে পুনরায় ছোট ছোট আগাছা জন্মিয়াছে। এ অবস্থায় গাছের আসল স্বরূপ যেন ঢাকিয়া গিয়া কিম্ভূতকিমাকার বোধ হইতেছিল।

এক স্থানে আসিয়া এই জঙ্গলের মাঝখানে, এই সকল বৃক্ষের উপরে এত দিন পরে একদল লাঙ্গুলধারীকে বেশ লম্ফ-ঝম্প করিতে দেখিতে পাইয়া, এখানেও জীবজন্তুর অস্তিত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হইলাম। এই জন-মানব-শূন্য জঙ্গলাকীর্ণ অন্ধকার পথে, ইহারা বোধ হয়, বিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্ত আমাদের মত সভ্য-ভব্য যাত্রীর দল কখনও দেখে নাই, তাই সে সময়ে আমাদের আগমনে স্বীয় স্বভাব-সুলভ দন্তবিকাশ করিয়া কতই না স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতে প্রবৃত্ত হইতেছিল। আমরা



খেলার নিকটবর্ত্তী ঝরণা



সামখেলার নিকটবর্ত্তী অরণ্য

দীর্ঘ যষ্টিহস্তে নির্ভীকের মত (যদিও এ জঙ্গলে তাহাদের প্রভাবে মনে মনে ভীত হইতেছিলাম) সেই পিচ্ছিল পথে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। চলিবার কালে পায়ে এক প্রকার ছোট ছোট মশক একসঙ্গে অনেকগুলি কামড়াইয়া ধরিয়া, আমাদিগকে ত্যক্ত-বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল। আবার কখনও বা কোথা হইতে রক্তপিপাসু জলৌকা পায়ের উপরে নিঃশব্দে ষ্টকিং ভেদ করিয়া বিনা-যুদ্ধেই রক্ত বাহির করতঃ আমাদের এ উত্তমে কতই না অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল! এই সকল বাধা-বিপত্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমরা ধীর-পদবিক্ষেপে তুই মাইল আন্দাজ চড়াই শেষ করিয়া উত্‌রাইয়ে পড়িলাম। এই উত্‌রাইয়ের পথও অত্যন্ত পিচ্ছিল ছিল। সুতরাং সে দিন কতদূর তুর্দ্দশাভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা একমাত্র যাত্রিগণই বলিতে পারেন।

তিন মাইল আন্দাজ উত্‌রাই-পথ নামিয়া আসিতে প্রায় তুই ঘণ্টাকাল বিলম্ব করিতে বাধ্য হইলাম। দীর্ঘ যষ্টিধারী হইয়াও 'চট্টরাজ'-পরিহিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত দীর্ঘ ব্যক্তিকেও তুই তিনবার পদস্খলিত হইয়া প্রস্তরালিঙ্গন করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক্, বেলা বারোটা আন্দাজ সময়ে আমরা নীচে নামিয়া একটি প্রশস্ত ঝরণা দেখিতে পাইলাম। ঝরণার স্রোতের গতি খুব দ্রুত হইলেও ইহার তুই পার্শ্বের তীরে যথেষ্ট প্রস্তরখণ্ড সাজান থাকায় বিশ্রাম করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। দেখিলাম, স্বামীজীরা অপরাপর যাত্রী সহ ঝরণার অতি নিকটে বসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন।

আমরা নিকটে আসিলে স্বামীজী বলিলেন, "আজ উত্‌রাই নামিতে সকলেরই কষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এইখানে—এই ঝরণার পার্শ্বে স্নানাহার শেষ করিয়া বিশ্রামান্তে তুই মাইল দূরে "গালায়" গিয়া রাত্রিযাপন করা হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।" এ স্থানের নাম "সামখেলা"। এমন

প্রশস্ত ঝরণা সম্মুখে পাইয়া এখানে সকলেই স্নানাহার শেষ করিয়া লইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমাদের এ ব্যবস্থা দেখিয়া অগত্যা কুলীগণও সকলেই এই মতের অনুসরণ করিল।

এইরূপে আহারাদি শেষ করিয়া বেলা চারিটা আন্দাজ সময়ে আবার সেখান হইতে যাত্রা করা হইল। এবারের পথ প্রায়ই চড়াই-উত্‌রাই-হীন। সুতরাং এই ঝরণার পাশ দিয়া দুই মাইল আন্দাজ পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা গালায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এখানে দুই তিন ঘর মাত্র লোকের বাস। তাহাদের বাসার এক পার্শ্বে তৃণাচ্ছাদিত একটি বড় লম্বা ঘর—ডাক-হরকরার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই লম্বা ঘরই আমাদের সকলের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সে রাত্রিতে আমরা সকলেই সেই লম্বা ঘরটিতে প্রথম এক-সঙ্গে থাকিতে বাধ্য হইলাম।

এই গালা গ্রামখানি একটি উচ্চ পর্ব্বতের কোণে অবস্থিত। রাস্তার উপর হইতে ইহার তলদেশ নিরীক্ষণ করিলে সেই সামখেলার প্রশস্ত ঝরণাই আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোথায় মিশিয়া গিয়াছে মনে হইয়া থাকে। এত দূর হইতে তাহার অবিরাম ঝর্‌-ঝর্‌ শব্দ দূরশ্রুত সঙ্গীতের মত অস্পষ্ট সুরে যেন কর্ণে বাজিতে থাকে। চারিদিকেই অনন্ত পাহাড়। সেই সকল পাহাড়ের উপরে ঘন-সন্নিবিষ্ট ছোট ছোট গাছগুলি দূর হইতে দেখিয়া মনে হইতেছিল, আবছায়ার মত পাহাড়গুলিকে কি একটা ঢাকিয়া দিয়াছে। এই সকল পাহাড় অতিক্রম করিয়া কোনদিকে যাইবার যেন কোন পথই নাই। অজানা রাজ্য! সে রাজ্যে স্বপ্নের মত আমরা প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি! এ কয়জন যাত্রী ব্যতীত সঙ্গের সাথী আর কেহই নাই এবং কত দিনে যে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছিব, তাহারই বা ঠিক কি, এইরূপ কতই না চিন্তা সে সময়ে মনে হইতেছিল।

আমরা যে ঘরে আশ্রয় লইলাম, তাহার প্রায় এক ফার্লং নীচে একখানি পুরাতন জীর্ণ পাকা ঘর দেখা যাইতেছিল। শুনিলাম আজ দুই দিন হইল, তাহাতে একজন আগন্তুক 'হৈজা' (কলেরা) রোগে মরিয়া গিয়াছে। মৃতদেহ অদ্যাবধি সে ঘরেই পড়িয়া আছে। সে দেশের প্রথামত ইহার মৃত্যু-সংবাদ পাটোয়ারীকে দেওয়া হইয়াছে। পাটোয়ারী তদন্ত শেষ করিয়া গেলে তার পরে ইহার সৎকার হইবে। দুঃখের বিষয়, আজ দুইদিন ধরিয়া পাটোয়ারীর তদন্ত চলিতেছে।

আমাদের ঘরের পার্শ্বে পাহাড়ের গায়ে একটা আলুর ক্ষেত ও কুমড়ার চাষ দেখিতে পাইলাম। যাত্রীদিগের মধ্যে সে সময়ে এখান হইতে কিছু আলু খরিদ করিয়া লইবার প্রস্তাব উঠিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার মালিক কিন্তু আলু-বিক্রয়ে রাজী হইল না; কেবল দুই এক সের আলু ব্যবহারের জন্য দিয়াছিল। এ সময়ে আমাদের মধ্যে জনৈক সহযাত্রী ক্ষেতের উপর দিকে দূর-পাহাড়ের গায়ে সকলকে একবার নজর দিতে বলিলেন, তদনুসারে আমরা এককালীন সে দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম। কিন্তু দেখিবার মত কিছুই না দেখিতে পাওয়ায়, পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিবামাত্র একজন বলিয়া উঠিলেন, "অসংখ্য ভেড়ার দল পাহাড়ের উপরে চরিয়া বেড়াইতেছে।" ইহা অতি সামান্য ব্যাপার মনে হইলেও দেখিলাম, এত উচ্চ পাহাড়ে ঢালু জমির উপরে ইহাদের অবাধ-বিচরণ একটু বিস্ময়জনক বটে! কিন্তু তদপেক্ষা বেশী আশ্চর্য্য মনে হইল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখা। অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসীবিন্দুর মত কেমন তাহারা ধীরে ধীরে পাহাড়ের গায়ে নড়িয়া বেড়াইতেছে। এ দৃশ্যে আমরা কিন্তু সে সময়ে বেশ কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম।

যাহা হউক্, সেই একটিমাত্র তৃণাচ্ছাদিত লম্বা ঘরের মধ্যে আজ

পনেরো ষোল জন যাত্রীকেই একসঙ্গে রাত্রি কাটাইতে হইবে। এদিকে সন্ধ্যা ক্রমশঃ গাঢ় অন্ধকার জমাইয়া তুলিল। হঠাৎ ডাক-হরকরা স্বামীজীর নামে একখানি চিঠি দিয়া গেল। চিঠিখানি ধারচুলা হইতে ডাক্তার পালধি মহাশয় লিখিয়াছেন অবগত হইয়া, পঞ্জাবী-যাত্রিদলের কুশল সংবাদ জানিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইলেন। দুঃখের বিষয়, চিঠিখানিতে "সিয়ারামজী" ও তাঁহার সহযাত্রী দুইজন রোগীরই মৃত্যু-সংবাদ লিখিত ছিল। বহু যত্ন লইয়া চিকিৎসা করিলেও ডাক্তার তাঁহাদিগকে বাঁচাইতে পারেন নাই। এ সংবাদে সকলেই মর্ম্মাহত হইলাম। আর আর যাত্রিগণ ভাল আছেন, কিন্তু সিয়ারামজীর (তাঁহাদের গুরু ও নেতার) মৃত্যুতে তাঁহারা কেহই 'কৈলাস' যাইতে চাহিতেছেন না। এ সংবাদে যাত্রার পথে তাঁহাদের এই অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন দেখিয়া আমরা খুবই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। এই সব দেখিয়া শুনিয়া সকলেরই মনে উৎসাহ আনিবার জন্য স্বামীজী এবং অন্যান্য যাত্রীরা সে দিন কৈলাসপতির উদ্দেশে কিছুক্ষণ ভজন গাহিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। আমাদের মধ্যে এ রসে প্রায় সকলেরই সমান বোধ! কাযেই এ বিদ্যা 'জাহির' করিতে কাহারও আপত্তি রহিল না। ভজন আরম্ভ হইল। স্বামীজীর দল হইতে একটা ভজনের প্রথম চরণ গাওয়া হইলে আবার অন্যান্য সকলে সেই সুরে গাহিয়া উঠিলেন। এইরূপে গানের "কোরাস্" চলিতে লাগিল। সে দিন প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আমাদের "ভজন-সাধন" রীতিমত অগ্রসর হইয়াছিল। একটি গানের কয়েক চরণ মাত্র আমার মনে আছে, তাহা সে সময়ে খুবই মিষ্ট লাগিয়াছিল। তাই এ স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। গানটি এই :—

কর্ণাট—একতাল।

"তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা,
বম্—বব—বম্ বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে,
দুলিছে কপাল-মাল।
গরজে গঙ্গা জটা-মাঝে
উগরে অনল ত্রিশূল রাজে
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলি-বিন্দু
জ্বলিছে শশাঙ্ক-ভাল।"

এই গানটি কোরাসে গাহিবার সময়ে আমাদের যাত্রীদের মধ্যে সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন আর এই মহা-যাত্রার পথে নিরবচ্ছিন্ন পথ-ক্লেশ বা গৃহত্যাগী গৃহস্থ-জীবনের দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগের বিষয় একবারেই মনে স্থান পায় নাই। এইরূপে সে রাত্রি গালায় কাটাইয়া পরদিন প্রভাতে আবার রওনা হইলাম। প্রথমেই রাস্তার পার্শ্বে একটি পাহাড়ের চত্বরে দুই তিনটি পাহাড়ীর সহিত দেখা হইল। তাহারা অগণিত ভেড়ার দল (যাহারা গতকল্য সন্ধ্যাকালে পাহাড়ের কোলে চরিয়া বেড়াইতেছিল) লইয়া, এই রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইবার আয়োজন করিতেছে, এবং প্রত্যেক ভেড়ার পৃষ্ঠদেশে দুই দিকেই চামড়ার থলি-ভরা আটা, গুড় প্রভৃতির ছোট ছোট বোঝা তুলিয়া দিতেছে। এই সকল বোঝার ওজন কত, জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম, এক একটি ভেড়া ন্যূনকল্পে দশ বারো সের পর্য্যন্ত বোঝা লইয়া এই চড়াই-উত্‌রাই-পথ অবাধে অতিক্রম করিতে পারে। ইহারা ব্যবসাদার। প্রতি বৎসরে এই সময়ে এই সকল দ্রব্যাদি লইয়া ইহারা এ পথে তিব্বত পর্য্যন্ত যায় এবং সেখান হইতে ইহার

পরিবর্ত্তে উন (উল), লবণ, সোহাগা প্রভৃতি লইয়া, এই সকল ভেড়ার পৃষ্ঠেই বোঝাই দিয়া ফিরিয়া আসে। যাহা হউক্, এই সকল সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য-পথে ভেড়ার দ্বারা ইহারা কতদূর উপকৃত, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। এই সকল ভেড়ার পাশ দিয়া কোনরূপে আমরা অগ্রসর হইলাম। ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর উত্‌রাই পড়িল। আজ পর্য্যন্ত যত উত্‌রাই অতিক্রম করিয়া অসিয়াছি, তাহাতে "মালপা" যাইবার পথের এইরূপ অসম্ভব উত্‌রাই আর কোনদিনই দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে সকলেই খুবই সন্তর্পণে নামিয়া আসিতেছি। বামদিকে আকাশ-চুম্বী পাহাড়ের সহিত সংলগ্ন এই পথ এক এক স্থানে গভীর নিম্নমুখী হইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সিঁড়ির আকারে নীচে নামিয়াছে। কোথাও বা রাস্তার পরিসর এক হস্তের বেশী হইবে না। সে সকল স্থানে বামদিকে ঝুঁকিয়া যাইতে হয় এবং প্রত্যেক যাত্রীই এই পথে পাহাড়ী যষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

পাহাড়ী কুলীদের এ সকল পথে আসা-যাওয়া অভ্যাস আছে, কিন্তু আমাদের মত সমতলবাসী বাঙ্গালী যাত্রীদের এ পথে যাইতে প্রতিপদে পদস্খলিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। পাঠকবর্গ! আপনারা একবার এ সময়ে মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখুন,—এই গগনস্পর্শী পাহাড়ের গাত্র-সংলগ্ন একটি সঙ্কীর্ণ পথের উপর দিয়া, বাঁশের দোলায় বসিয়া পরের স্কন্ধে যাইতেছেন, স্ত্রীলোক-যাত্রী! একে ত তাঁহাদিগকে কুব্জ হইয়া বসিতে হইয়াছে। পদদ্বয় নীচের দিকে ঝুলানো রহিয়াছে। আবার পাছে নীচের দিকে তাকাইলে জ্ঞানহারা হইতে হয়, তাই বাহকের উপদেশমত তাঁহারা একপ্রকার চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই রহিয়াছেন। এ অবস্থায় এরূপ যাত্রাকে 'মহাপ্রস্থান' ভিন্ন সে সময়ে আর কিছু মনে



মালপার পথে পাহাড়ের চত্বরে উপবিষ্ট লেখক- ৬৬

করিতে পারেন কি না, তাহার বিচার আপনারাই করিয়া লইবেন। এই সকল পথে, সব দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পদব্রজে যাওয়াই প্রশস্ত এবং যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

এইরূপে তিন কি সাড়ে তিন মাইল উত্‌রাই নামিয়া আসিয়া কালী-নদীর পুল পাইলাম। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে পুল পার হইয়া এবার নেপাল-সীমানার পথ ধরিলাম। কালী-নদীর তীর ধরিয়া এ পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, দক্ষিণদিকে পাহাড় ভেদ করিয়া দুই তিনটি ঝরণা প্রবলবেগে কালী-নদীর উপর পতিত হইতেছে। সে স্থানের দৃশ্যগুলি দেখিয়া বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। এইরূপে দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিলে আবার এই নদীর পুল পার হইয়া এপারে (বৃটিশ এলাকায়) আসিলাম। দুই পাহাড়ের মাঝখানে এ পথে কেবলই নদীর দু-কূল-ভাঙ্গা জলকল্লোলের শব্দ যাত্রীদিগকে একপ্রকার বধির করিয়া দেয়। কুলীদিগের প্রমুখাৎ শুনিলাম, এখানকার পুল প্রায় প্রতি বৎসরেই বর্ষার স্রোতে ভাঙ্গিয়া যায়। সে সময়ে যাত্রীদিগের "নীরপানি" পাহাড়ের অত্যুচ্চ শিখর দিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না। এই প্রকারে নদীতীর ছাড়িয়া আবার মাইল ব্যাপী চড়াই পড়িল। সেখান দিয়া খানিক দূর উপরে উঠিলে, বামদিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতগাত্র দিয়া একটি প্রশস্ত ঝরণার জলধারা উদ্দাম গতিতে নীচে প্রবাহিত হইতেছে। যাত্রীদিগের যাইবার জন্য সেখানে একটি কাঠের পুল রহিয়াছে। এই পুল দিয়া আগে যাইতে আমাদের পদদ্বয় মুহুর্মুহুঃ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে কিয়দ্দূর চলিলে কুলীরা দূরে নীরপানি-পাহাড়ের উপর দিয়া যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। আমরা সে সময়ে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন মনে করি নাই, তাই ধীরে ধীরে কখনও চড়াই, কখনও বা উত্‌রাই শেষ করিয়া বেলা সাড়ে

এগারোটা আন্দাজ সময়ে "মালপায়" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গালা হইতে মালপা আট মাইল আন্দাজ দূর হইবে। এখানে ডাক-হরকরার বিশ্রাম করিবার একটিমাত্র 'আটচালা' ভিন্ন গ্রাম বা ঘর কিছুই দেখিলাম না।

এখানে কাষ্ঠ পর্য্যন্ত পাওয়া দুর্ঘট দেখিয়া স্বামীজী এবং অপরাপর সকলেই আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন। মনে ভাবিলেন, সেখান হইতে আরও আট মাইল আগে গিয়া 'বুধি'তে বিশ্রাম ও আহারাদি করাই যুক্তি-যুক্ত হইবে। আমরা কিন্তু কিছু না খাইয়া আগে যাইতে পারিলাম না। কুলীদিগকে বখশিশের লোভ দেখাইয়া দুই আনা পয়সা নগদ দিয়া বহু কষ্টে কিছু ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া 'খিচুড়ী' তৈয়ার করিয়া লইলাম। আমাদের বিলম্ব হইবে দেখিয়া কালিকানন্দজী মাত্র আমাদের সঙ্গে রহিয়া গেলেন।

আহারান্তে বেলা দেড়টা আন্দাজ সময়ে আবার আমরা রওনা হইলাম। আলমোড়া হইতে এত দূরে আসিয়া এতদিন পরে একটি ঝরণার কাছে বিস্তৃত উপলখণ্ডের পার্শ্বে একটি কালোবর্ণের পাহাড়ী সাপ চোখে পড়িল। এই সকল পথ দিয়া যাইতে দুই পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে যেরূপ ঘন ঘন ঝোপ বা জঙ্গল দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে এ লোকালয়-বর্জ্জিত পথে সর্পের কথা শুনিলে আতঙ্ক হইবারই কথা। সুখের বিষয়, কৈলাস হইয়া ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত এ পথে এই একদিন একটি সর্প চোখে পড়িলেও অন্য কোন দিন কোনপ্রকার সর্প দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। এ জন্য আমরা জঙ্গলের মাঝখানেও তাঁবু ফেলিয়া রাত্রিযাপনে কোন প্রকার দুর্ভাবনা বোধ করি নাই।

কুলীগণ নিজ নিজ যানের যাত্রী লইয়া চলিয়া গেল। আমি, কালিকানন্দজী এবং ভূপ সিং সকলের পশ্চাতে ধীরে ধীরে যাইতেছিলাম। মধ্যাহ্নে খিচুড়ী ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে বিনা বিশ্রামে পাহাড়ের চড়াই-



মালপার পথে ঝরণা

উত্‌রাই-পথ অতিক্রম করিতে সে দিন বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছিল এবং প্রায় দশ মিনিট অন্তর কঠিন তৃষ্ণায় জিহ্বা শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল। সুখের বিষয়, এ পথে তুষার-গলিত ঝরণার ধারা এত শীতল যে, সে ধারা পান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত তৃপ্ত হইয়া উঠিত।

বিহারী-দরোয়ান ভুপ সিংএর কষ্টের অবধি ছিল না। সকলের সহিত একযোগে যাত্রা করিলেও সে প্রতিদিন গন্তব্য স্থানে সকলের পশ্চাতেই পৌঁছিত। উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের অধিবাসীদিগকে আমাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শক্ত মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু এ যে বিহার-অঞ্চলের হৃষ্টপুষ্ট জীব-বিশেষ, তায় জমিদার-প্রাসাদের দেউড়ীরক্ষক সশস্ত্র প্রহরী। শুধু "ছাতু-রুটীর যম" ছাড়া কোন বিষয়েই ইহাদের কর্ম্ম-কুশলতা দেখিতে পাওয়া কঠিন ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। বিশ হাত লম্বা মাথার পাগড়ীই তাহার একমাত্র শোভা। এই চড়াই-উত্‌রাই পথে মরিয়া গেলেও সে নিজ সাজসজ্জার একদিনও ত্রুটি হইতে দেয় নাই। মালিককে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বন্দুক স্কন্ধে করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু মালিক কোথায়!. তিনি ত এতক্ষণ তিন মাইল পথ আগে গিয়াছেন। তবে ভুপ সিং যাইতেছে কি জন্য? বন্দুক স্কন্ধে শুধু শোভা বাড়াইবার জন্যই বোধ হয়। তাহার যেরূপ সৎসাহস, তাহার প্রমাণ ধারচুলায় ইতঃপূর্ব্বে একবার নমুনা পাওয়া গিয়াছিল। স্বামীজীরা সেখানে মৃগশিকার করিবার নিমিত্ত একদিন ভুপ সিংকে সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যদি বা তাঁহারা তাহার মালিকের অনুমতি পাইলেন, ভুপ সিং সে সময়ে বলিয়াছিল, "আমি আসল টোটা আনি নাই, যাহাতে অনায়াসে মৃগশিকার করা যাইতে পারে" ইত্যাদি।

আমি ও কালিকানন্দজী উভয়ে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছি। মধ্যে মধ্যে দূর হইতে পশ্চাতে ভুপ সিংএর কাতর আহ্বান আসিতেছে, "বাবু!

বাবু!" অবশ্য বাবুদের চিন্তা তখন কে করে! তাহারা নিজেদের লইয়াই অস্থির রহিয়াছে। কতক্ষণে "বুধি" গিয়া পৌঁছিব, সে চিন্তা অপেক্ষা বলা বাহুল্য, ভূপ সিংএর সেই কাতর আহ্বান সে সময়ে আমাদিগকে বেশী চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কতক্ষণ চলিবার পরে এমন একটি স্থানে উপস্থিত হইলাম, যাহা অতিক্রম করা আমদের পক্ষে কিছু বিপজ্জনক বলিয়াই মনে হইল। দেখিলাম, উপরের পাহাড় হইতে এই সঙ্কীর্ণ পথের কতকটা অংশে, বৃষ্টির শতধারার মত প্রবাহ আসিয়া ঝর্‌-ঝর্‌ শব্দে পতিত হইতেছে। ইহার ফলে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাত পথ খুবই পিচ্ছিল হইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় এ পথটুকু অতিক্রম করিতে প্রতি পদে পদস্খলিত হইবার সম্ভাবনা। বহু নীচে কালী-নদীর জল তর্‌-তর্‌ বেগে দুই পাহাড় প্রকম্পিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। শুনিলাম, এই সঙ্কটজনক পথের ওপারে দাঁড়াইয়া স্বামীজীরা চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "খুব সাবধানে লাঠি ভর দিয়া পাহাড়ের গায়ে ঝুঁকিয়া চলিয়া আসিবেন, নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।" অগ্রে কালিকানন্দজী, মধ্যে আমি ও পশ্চাতে ভূপ সিং। তিনজনেই ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সে স্থানটি ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া নিশ্বাস ফেলিলাম। গায়ে 'ওয়াটারপ্রুফ' থাকায় শুধু মস্তকটিই ঝরণার জলে একবারে ভিজিয়া গেল। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া পিচ্ছিল পথ হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য, পদদ্বয়ের উপরেই সমধিক লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল। ইহার উপর সে স্থানটিতে আবার একপ্রকার বড় বড় মশক অতর্কিতভাবে সে সময়ে আমাদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল। মনে ভাবিতেছিলাম, কৈলাস যাইবার যদি এইরূপ পথ দুই চারিবার অতিক্রম করিতে হয়, তবেই কৈলাস যাইবার সাধ মিটিয়া যাইবে।

আমাদিগকে পার হইতে দেখিয়া, স্বামীজীরা আবার গন্তব্য পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। আমরা তিনজনে কেবল তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া সন্ধ্যা সাতটা আন্দাজ সময়ে "বুধি" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এ পথে আসিতে অনেকগুলি ঝরণা পাইয়াছিলাম। প্রায় ষোল সতেরো মাইল পথ আজ অতিক্রম করায় সকলেই খুব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বুধির উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় নয় হাজার ফুট হইবে। গ্রাম হইতে কিছু দূরে একটি অশ্ববিষ্ঠা-পরিপূর্ণ লম্বা ঘরে (তাহাই সেখানকার ধর্ম্মশালা!) সকলেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায় শতচ্ছিদ্রময় ছাদ হইতে জল পড়িয়া আমাদের বিছানা ও আস্‌বাবাদি ভিজাইয়া দিল। তার উপরে পিশুর যথেষ্ট উপদ্রব থাকায় সে রাত্রিতে না-ঘুম না-জাগা অবস্থায় কাটাইতে হইল।

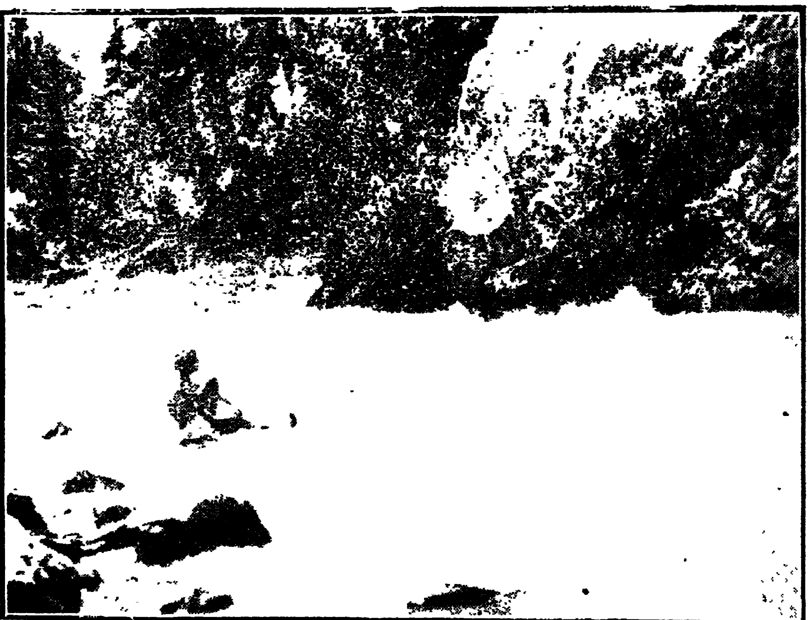
প্রভাতে আমরা প্রত্যেক যাত্রীই যথেষ্ট শীত অনুভব করিলাম। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই একে একে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চোখের সম্মুখেই এখানে পাহাড়ের গায়ে গায়ে মাঝে মাঝে কেবল পুঞ্জীভূত তুষার জমিয়া রহিয়াছে। রৌদ্রকিরণে কোথাও বা তাহা গলিত হইয়া শুভ্র রজত-ধারার ন্যায় পাহাড়ের গা দিয়া ইতস্ততঃ নামিয়া গিয়াছে। এ স্থানের এই সকল পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়া তখন মনে হইল, এইবার বুঝি অমল-ধবল তুষারের মাঝখান দিয়াই আমাদিগকে যাইতে হইবে। সকলেই মনে মনে আশা ও উৎসাহ লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

গার্ব্বিয়াং এখান হইতে চারি মাইল আন্দাজ পথ হইবে। মধ্যে একটি অত্যুচ্চ পাহাড়ই কেবলমাত্র ব্যবধান। স্বামীজীরা দুই তিন জনে সে দিন প্রভাতে গার্ব্বিয়াং উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য, একসঙ্গে

এতগুলি যাত্রীকে গার্ব্বিয়াংএ না লইয়া গিয়া ইহাদের সেখানে কোথায় থাকিবার সুব্যবস্থা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া শুনিয়া ঠিক করিয়া আসিবেন। তাহা ছাড়া যাইবার আর এক কারণ ছিল। তাঁহাদের আশ্রমের রুমা দেবীর ভগিনী সুরমা দেবী সেখানে থাকেন। তাঁহাকে আমাদের এই সদলে আগমন-বৃত্তান্ত জানাইয়া রাখিলে তিনি গার্ব্বিয়াং হইতে অগ্রসর হইবার উপযোগী ঘোড়া, ঝব্বু প্রভৃতি আবশ্যক-বাহনগুলির পূর্ব্ব হইতে জোগাড় রাখিতে পারিবেন। সেরূপ অবস্থায় আমাদের গার্ব্বিয়াংএ বেশী দিন অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না। অগত্যা আমরা সে দিন স্বামীজীদের সঙ্গ লইলাম না; বুধিতেই রহিয়া গেলাম। সন্ধ্যার মধ্যে স্বামীজীদের ফিরিয়া আসিবার কথা রহিল।

সেইদিন বৈকালে একজন গেরুয়াধারী আগন্তুক বাঙ্গালী যুবক আমাদের আড্ডায় আসিয়া দেখা দিলেন। জিজ্ঞাসায় জানা গেল, ইনি একজন কৈলাস-ফেরত। এ সংবাদে যাত্রীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। তাঁহাকে ঘিরিয়া সকলেই প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিরক্ত করিয়া তুলিলেন। ইঁহার নাম শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীর প্রমুখাৎ কৈলাস-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা গেল না। তবে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এই :—

"গত ৬ই আষাঢ় অর্থাৎ যে দিন তিব্বতী বণিকগণ ভেড়া লইয়া তিব্বত-অভিমুখে যাত্রা করে, সেই দিনই তিনি তাহাদের সাথী হইয়া কৈলাসযাত্রায় বহির্গত হ'ন। দুঃখের বিষয়, 'লিপুলেক পাস্' সে সময়ে গলিত তুষারে (melting ice) একবারে আচ্ছন্ন ছিল। বণিকগণ তাঁহাকে খুব যত্নসহকারে প্রতিদিন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু এই লিপু অতিক্রমের দিনে তাঁহার পদদ্বয় (ঊরুদেশ পর্য্যন্ত) গলিত বরফের মধ্যে বসিয়া গিয়াছিল এবং পদে পদে আঘাত পাইয়া কোনরূপে প্রাণ



বুধির নিকটে কালী নদী

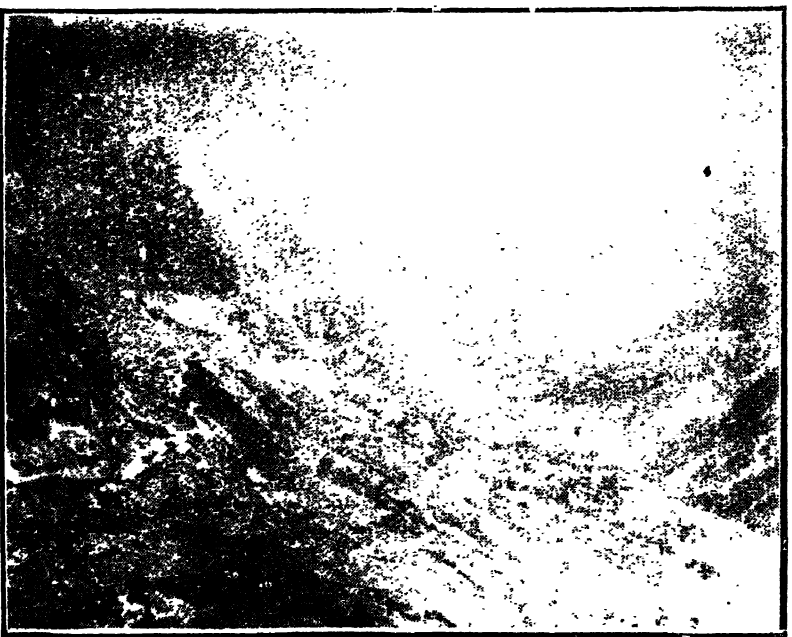
৭২

লইয়া যখন আগে পৌঁছিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার দেহের মধ্যে একবারেই সাড়া ছিল না। অজ্ঞান অবস্থায় বণিকগণের তাঁবুতে কয়েকদিন কাটাইতে হইয়াছিল। অগ্নির উত্তাপ প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে, বণিকদের যত্নে ও শুশ্রূষায় সে যাত্রায় প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হাঁটু হইতে নীচের দিকে সম্মুখভাগে খানিকটা অংশের ক্ষত (আমাদিগকেও দেখাইলেন) এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন প্রকারে তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি ফিরিতেছেন! আরও বলিলেন, আপনারা ঠিক সময়েই যাইতেছেন। এ সময়ে লিপুলেকের পথ বেশ গমনোপযোগী হইয়াছে" ইত্যাদি।

সন্ধ্যাকালে স্বামীজীরা গার্ব্বিয়াং হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতেই গার্ব্বিয়াংএ যাওয়া হইবে, ইহাই স্থির হইল। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে একদিন বিলম্ব হইয়া গেল দেখিয়া আমাদের কুলী-সর্দ্দার 'প্রধান' প্রধানতঃ আপত্তি উঠাইল। উদ্দেশ্য, একদিনের মজুরী প্রত্যেক কুলী পিছু অতিরিক্ত ধরিয়া দেওয়া। তাহার আবেদনমত কার্য্য করিতে গেলে একসঙ্গে আমাদিগকে অনেকগুলি টাকা বাহির করিতে হয়, বিশেষ আমরা বড় কম কুলী সঙ্গে আনি নাই। অগত্যা প্রধানকে লইয়া সে দিন স্বামীজী মহারাজকে যথেষ্ট বাগবিতণ্ডা-কলহ স্বীকার করিতে হইল। পরিশেষে প্রধান ও প্রত্যেক কুলীকে কিছু কিছু পুরস্কার দেওয়া হইবে বলায় সে যাত্রায় আমরা পরিত্রাণ পাইলাম।

ইং ৮ই জুলাই, ২৪শে আষাঢ়, সোমবার প্রভাতে ছয়টা আন্দাজ সময়ে আমরা বুধি ছাড়িলাম। কুলীরা সকলেই আপন আপন বোঝা লইয়া আগে আগে চলিল। অল্পদূর যাইতেই প্রায় দেড় মাইল চড়াই পাহাড় সম্মুখে পড়িল। শুনিলাম, ইহার উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় এগারো হাজার ফুট হইবে। তিন ঘণ্টাকাল এই চড়াই শেষ করিয়া উপরে উঠিলাম।

এত উচ্চে উঠিয়া এইবার একটি শ্যামশষ্প-শোভিত বিরাট্ ময়দান পার হইতে হইল। কোথায় সেই সমুদ্র-বেলাভূমি সুজলা সুফলা সুদূর বাঙ্গালা-দেশের সমতল ক্ষেত্র—যেখানে শ্যামতৃণাচ্ছাদিত ময়দান বহুদিন হইল দেখিয়া আসিয়াছি, আর আজ এই হিমালয়ের শিরোভাগে অত্যুচ্চ পাহাড়ের কঠিন প্রস্তরভূমির উপরে সেইরূপ চির-সুন্দর নয়ন-মনোহর ময়দানের বিস্তৃতি! চোখের সম্মুখে এ দৃশ্য সে সময়ে খুবই রমণীয় মনে হইয়াছিল। বিশেষ এ দৃশ্যের একটু নূতনত্ব এই যে, এই বিস্তৃত ময়দানের চারিদিকেই কেবল তুষারমণ্ডিত রজতশুভ্র পর্ব্বত-প্রাসাদ উন্নত মস্তকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। লোহিত, হরিত, পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের 'মর্‌শুমী' ফুল (season-flower) এই শ্যাম তৃণশোভিত ময়দানে অগণিত ফুটিয়া থাকায় সৌন্দর্য্যের চরম আবিষ্কার মনে করিয়া এই পার্ব্বত্য-প্রদেশে আমরা প্রত্যেকে তখন গর্ব্বানুভব করিতেছিলাম। দেখিলাম, সেই ময়দানে কোথায়ও অসংখ্য ভেড়ার দল চরিতেছে, কোথায়ও বা পাহাড়ী ঘোড়া একসঙ্গে অনেকগুলি দিকে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের সঙ্গের ছোট ছোট বাচ্ছাগুলি কখনও বা ত্বরিত গতিতে তাহাদের নিকট হইতে দূরে পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত 'কুলেল্' (Prance) করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। এক স্থানে বৃহদাকার ঝব্বুর দল নিশ্চিন্তমনে তৃণ-চর্ব্বণে নিযুক্ত রহিয়াছে দেখিয়া সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হইল। মহিষাকৃতি বৃহৎ লোমবিশিষ্ট এই বিপুল-কায় জন্তুর পৃষ্ঠে বসিয়া কৈলাস যাইতে হইবে মনে করিয়া কেহ বা অল্পবিস্তর শিহরিয়া উঠিলেন। এইরূপে নানা চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্তের মত এ ময়দান অতিক্রম করিয়া বেলা এগারোটা আন্দাজ সময়ে আমরা "গার্ব্বিয়াং" এ প্রবেশ করিলাম। এই সেই গার্ব্বিয়াং—যেখানে প্রবাদ, এক সময়ে ভগবান্ ব্যাসদেব বহুকাল তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, এবং এই পার্ব্বত্য-



গার্ব্বিয়াং

প্রদেশের কোন্ এক নির্জ্জন গুহা হইতে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজি এক-কালে লিখিত হইয়াছিল! এই জন্যই ইহার অপর একটি নাম "ব্যাস-ক্ষেত্র।"

গ্রামের মধ্য দিয়া গ্রামবাসী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের উৎসুক দৃষ্টি এড়াইয়া ক্রমশঃ আমরা গ্রামের উত্তরদিকে স্কুলবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। স্কুল-বাড়ীর সংলগ্ন বিস্তৃত ময়দানে থাকিবার ব্যবস্থা হওয়ায়, সকলেই আপন আপন তাঁবু খাটাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, এখান হইতেই যাত্রীদিগের প্রত্যহ তাঁবু-ব্যবহার আরম্ভ হইল। স্কুলের শিক্ষক মহাশয় খুবই যত্ন-সহকারে আমাদিগকে আদর-আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, "ইতনা বড়া পার্টি একসাথ্ কৈলাস-জানেকো মৈঁ নে কভী নহী দেখা, আপলোগ ধন্য হৈঁ" ইত্যাদি। ফল কথা, আমাদের আগমনে তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ব্যবহারে বেশ বুঝা গেল।

দলে স্ত্রীলোক দেখিয়া সে সময়ে কতকগুলি গ্রাম্য স্ত্রীলোক-দর্শক আসিয়া জুটিল। তাহাদের হাব-ভাব-চাহনিতে বেশ একটু বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল—এরূপ স্ত্রীলোক-যাত্রী যেন তাহারা আর কখনও দেখে নাই!

শিক্ষক মহাশয় তাঁবু-খাটানো ব্যাপারে সকলকেই যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কুলীদের হিসাব মিটাইতে প্রধানকে ডাকা হইল। আমাদের কুড়িটি কুলীর মজুরী প্রত্যেকের ছয় টাকা হিসাবে পাওনা এক শত কুড়ি টাকার মধ্যে কুড়ি টাকা অগ্রিম দেওয়া ছিল। তদ্বাদে বাকী এক শত টাকা এবং প্রত্যেক কুলীর বখশিশ্ চারি আনা হিসাবে পাঁচ টাকা এবং প্রধানের স্বতন্ত্র বখশিশ্ এক টাকা মোট এক শত ছয় টাকা দিয়া প্রধান ও কুলীদিগকে বিদায় দিলাম। যাইবার

সময়ে তাহারা "অতি-ভদ্রের" মত প্রত্যেকেই আমাদিগকে সেলাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে কৈলাস হইতে ফিরিতে পারি, তজ্জন্য দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাইয়া চলিয়া গেল।

স্কুলবাড়ীর একটি ঘরে রান্নার আয়োজন চলিল। গ্রামের নীচে রাস্তার ধারেই একটি ঝরণা আছে। সেখানে গিয়া সকলে স্নানাদি শেষ করিলেন। জল এখানে খুব ঠাণ্ডা, এজন্য কেহ কেহ 'সোয়েটার' গায়ে দিয়াই French bath অর্থাৎ হাত, পা ও মাথা ধৌত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুরমা দেবীর নিকট হইতে স্বামীজীদের জন্য কিছু ভেট-দ্রব্য আসিল। উহা বড় সামান্য নহে। প্রায় সাত আট সের আটা এবং তদুপযোগী ডাল, আলু, মশলা, ঘৃত ও আচার প্রভৃতি সমস্তই সাজান রহিয়াছে। তার সঙ্গে দুইটি নূতন জিনিষ ছিল। ভেট-দ্রব্য-আনয়নকারী তাহা দেখাইয়া সকলকে বর্ণন করিলেন, এ দুইটি 'মান-তালাব কা হাঁস কা অণ্ডা।' প্রত্যেক ডিম প্রায় আট আঙ্গুল লম্বা হইবে। এত বড় ডিম দেখিয়া তখন সকলেরই মনে হইল, মানস-সরোবরের হাঁসের আকৃতিও বোধ হয় ইহার অনুপাতে বড় হইবে।

সে দিন অপরাহ্ণে এখানকার পাটোয়ারী দিলীপ সিং, নন্দরাম, ভগৎ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ লোকেরা একে একে আসিয়া "আপলোগ কৈলাস-যাত্রী, ধন্য হৈঁ" ইত্যাদি মিষ্ট বাক্যে আপ্যায়িত করিয়া গেলেন।

বৃটিশ রাজত্বে এ পথে গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্তই শেষ পোষ্ট আফিস্, এ কথা জানিয়া যাত্রিগণ অনেকেই ডাকঘর হইতে পোষ্টকার্ড কিনিয়া আপন আপন বাটীতে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। সুখের বিষয়, স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ই আবার পোষ্ট-মাষ্টার। চিঠিপত্র লিখিবার সময়ে তাহার জবাবাদি "কেয়ার অফ পোষ্ট-মাষ্টার, গার্ব্বিয়াং" এই ঠিকানায় লিখিবার

জন্য মাষ্টার মহাশয় নিজেই পরামর্শ দিলেন। কৈলাস হইতে ফিরিয়া আমরা যেন প্রত্যেকেই বাটীর সংবাদ পাই, এজন্য পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয়কেই একপ্রকার দায়ী করিয়া রাখিলাম।

সে দিন আরও তুইজন কৈলাস-যাত্রী আসিয়া দেখা দিলেন। এক-জনের নাম, মিথু বাবা। ইনি একজন গুজরাটী সৌম্যদর্শন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। ইঁহার পরিধানে গৈরিক বেশ, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ বড় বড় চিক্কণ কেশগুলি পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ এলায়িত। বিনয়ী এবং খুবই মিষ্টভাষী। পরিচয়ে জানা গেল, ইনি এককালে বোম্বে প্রেসিডেন্সীর কোন কলেজে এগ্রিকাল্‌চারের স্পেশাল বিষয়ে (subject) বি. এস্-সি. পাশ করিয়া লেক্‌চারার (Lecturer) হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি, আলমোড়া হইতে আগত জনৈক "পেস্কার সাহেব" (নামটি ঠিক মনে নাই)। ইনি ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্কার। সাধারণতঃ আলমোড়ার আশ-পাশের সকল গ্রামই ইঁহার করায়ত্ত থাকে। গ্রামের পাটোয়ারী, কে কিরূপ লোক, কোন্ জমির নক্‌সায় কে কতখানি 'গলদ' করিয়া রাখিতেছে, সকল বিষয়ে তদন্ত করিবার ভার ইঁহারই উপর ন্যস্ত। খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রামে ক্বচিৎ গিয়া থাকেন! তাই ইঁহাদের প্রভাব গ্রামের মধ্যে অনন্যসাধারণ। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে ইঁহাকেই মালিকের মত ভয়, শ্রদ্ধা ও খাতির করিয়া থাকে। কৈলাসের পথে আরও তুইজন যাত্রী দেখিয়া উৎসাহ ও আনন্দ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

গার্ব্বিয়াং গ্রামটি বেশ বড়। প্রায় একশত ঘর লোকের বসবাস আছে। গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এখানে থাকে. অধিকাংশ লোকের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। স্কুলের উত্তরাংশে কিছু দূরে একটি ডাক-বাংলো আছে। ক্বচিৎ তুই একটি উচ্চ-পদস্থ সাহেব এখানে ভ্রমণের জন্য আসিয়া থাকেন। এই ডাক-বাংলো

ও স্কুলটির মাঝখানে কতকটা চাষ-আবাদের জমি রহিয়াছে। গ্রামবাসীরা সেখানে সাধারণতঃ গম, ভুট্টা প্রভৃতি চাষের আবাদ করিয়া থাকে। শস্যাদি সমস্ত কাটা হইয়া গেলে (কার্ত্তিক মাসে) শীত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকেরা নীচে অর্থাৎ ধারচুলা অঞ্চলে চলিয়া যায়। সে সময়ে দুই চারি জন লোক গ্রামটি চৌকি দিয়া থাকে। কারণ, বাড়ী-ঘর প্রভৃতি সমস্তই বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। গ্রামের পার্শ্বে রাস্তার ধারে দুইটিমাত্র ঝরণার ধারা (তন্মধ্যে একটি ধারা অতি ক্ষীণ) গ্রামবাসীকে পানীয় জল সরবরাহ করে। বহু নীচে কালী-নদী বহিয়া চলিয়াছে। ইহার প্রবাহ-শব্দ গ্রাম হইতে অস্পষ্ট শুনা যায়।

গ্রামবাসীরা এখানে অত্যন্ত ম্লেচ্ছভাবাপন্ন, তাহা গ্রামে আসিতেই প্রথমে নজর পড়ে। রাস্তার ধারে, ঝরণার আশে-পাশে যেখানে সেখানে মলত্যাগ করিয়া রাখে। নিজেদের যে এ পথ দিয়া যাইতে হয়, সে বিচার ইহাদের আদৌ নাই। ইহারা অলস, মদ্যপায়ী এবং যথেচ্ছাচারী। নেশাই যেন ইহাদের জীবন। রাস্তার ধারে একটি সমচতুষ্কোণ ঘেরা যায়গা এই নেশাখোরদের প্রধান আড্ডাস্থল। ঝরণার জল আনিতে গেলে 'স্কুল-কম্পাউণ্ড' হইতে বাহির হইয়া, এই আড্ডার সম্মুখ দিয়াই আমাদিগকে যাইতে হইত। সে সময়ে দেখিতাম, হয় কেহ হুঁকায় নল লাগাইয়া তামাকু টানিতেছে, কেহ বা খোস-গল্প, হাসি-তামাসা করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে, আবার কেহ বা চুপ-চাপ দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতেছে। ইহাদিগের লাল চক্ষুর বিহ্বল চাহনি সে সময়ে আমাদের বাস্তবিকই অসহ্য মনে হইত। ব্যবসায় দ্বারা ইহারা কিরূপে জীবিকা অর্জ্জন করে, এ ধারণা আদৌ করিতে পারিতাম না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুরমা দেবী তাঁহার দশ এগারো বর্ষ-বয়স্কা কন্যা (নাম

দাশরথা)কে সঙ্গে লইয়া দিদির সহিত পরিচয় করিয়া গেলেন। "কৈলাস জানে মে বহুত তক্‌লীফ্‌ হৈ, আউর্‌ ন জানে কিত্‌নী তক্‌লীফ্‌ উঠাও না পড়েগা" ইত্যাদি কত প্রকার সহানুভূতিসূচক শব্দ তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল। তার পরে, এখানে আসিয়া কোন কিছু অসুবিধা ভোগ হইতেছে কি না, সকল বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আবার চলিয়া গেলেন। এই সুরমা দেবীই আমাদের যাইবার সমস্ত সুব্যবস্থা করিতেছিলেন। তাঁহার সৌজন্য ও অমায়িক ব্যবহারে আমরা এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, এ স্থলে তাঁহার একটু পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ইনি রুমা দেবীর ছোট ভগিনী। স্বামীর নাম গোপাল সিং কুঠিয়াল। শ্বশুরবাড়ী এখান হইতে দশ মাইল দূরে "কুঠি" নামক গ্রামে। এই গার্ব্বিয়াংএ বাপের বাড়ী। পিতৃধনে ধনশালিনী হইয়া এখানে বাস করিয়া থাকেন। ইঁহার দুইটি পুত্র; একটির নাম তঞ্জন সিং, অপরটি নন্দন সিং। গোপাল সিংএর প্রথম বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে আর এক সন্তান আছে, নাম দৌলত সিং। ধারচুলায়ও ইঁহাদের বাড়ী আছে। উচ্চ ব্যবসাদার বলিয়া এ সকল প্রদেশে ইঁহাদের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতি-পত্তি। তাকলাকোটে ও জ্ঞানিমামণ্ডীর (জোহারের রাস্তায়) বাজারে সাধারণতঃ ইঁহাদের ব্যবসায় চলে। স্বামী এবং বড় ছেলেরাই এই কারবারাদি চালাইয়া থাকে। ছোট ছেলে আলমোড়ায় এক্ষণে পড়িতেছে।

এখানকার স্ত্রীলোকেরা 'পর্দ্দানশীন' না হইলেও স্বভাবতঃ একটু লজ্জাশীলা মনে হইল। গৃহস্থালীর একটা-না-একটা কার্য্য লইয়া তাহারা প্রায়ই ব্যস্ত। ঝরণার কাছে গেলেই প্রায় কোন না কোন স্ত্রীলোক-যুবতীকে বৃহৎ বৃহৎ তামার ঘড়া ভরিয়া জল লইয়া যাইতে দেখা যায়। ঘড়ার মুখে বড় বড় 'আংটা' লাগানো থাকে। জল লইয়া যাইবার সময়ে ইহারা ঘড়াটি পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া, আংটায় পশমী রজ্জু বাঁধিয়া মস্তকের

সহিত সংলগ্ন রাখে। কোন কোন স্ত্রীলোক এইরূপে এই বৃহৎ ঘড়া একটি পৃষ্ঠে ও একটি কাঁখে লইয়া একসঙ্গে জল লইয়া যাইতে অণুমাত্র কষ্টবোধ করে না। ইহাঁদের পরিধানে উলের ঘাঘরা, গায়ে উলের জামা এবং পায়ে উলেরই এক প্রকার জুতা সমেত ষ্টকিং। ইহাদের তৈয়ারী এই 'জুতা-সমেত ষ্টকিং' খুবই কোমল এবং শীতের দেশে বেশ আরাম-দায়ক। এখানে উহা কিনিতেও পাওয়া যায়। মূল্য আড়াই টাকা, তিন টাকা আন্দাজ হইবে।

অলঙ্কার-বিষয়ে ইহারা প্রবালের মালাই বেশীর ভাগ পছন্দ করে। রৌপ্যের অলঙ্কারও কিছু কিছু আছে। বালিকাদের কণ্ঠে রূপার আধুলি, সিকি প্রভৃতি গাঁথিয়া সাধারণতঃ ঝুলানো থাকে। সধবারা কেহ কেহ সিঁদুর পরিয়া থাকে। কাণ ফুঁড়িয়া তাহাতে অলঙ্কারের শোভা এখানে সধবার একপ্রকার চিহ্ন শুনা গেল।

ইহাদের গায়ের রং মোটামুটি না-কালো না-ফরসা। গালে ঈষৎ লাল আভা সংযুক্ত। একটু খর্ব্বাকৃতি। কর্ম্মিষ্ঠা বলিয়া পুরুষদের অপেক্ষা ইহাদের গঠনসৌন্দর্য্য বেশী। যাহাদের চাষের জমি আছে, তাহাদের ঘরে স্ত্রীলোকেই প্রায় ক্ষেতের সমস্ত কার্য্য করে। একমাত্র হল-চালনা কার্য্য এখানকার নেশাখোর পুরুষদের দ্বারা সাধিত হয়।

কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনা এখানকার স্ত্রীলোকদের একটা নিত্য কার্য্য। প্রভাতে উঠিয়া ঝুড়িপৃষ্ঠে তাহারা কালী-নদীর ধারে ধারে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া থাকে। উলের বস্ত্রাদি সমস্তই প্রায় ইহারা নিজেই অবসরমত তৈয়ার করিয়া লয়। চরকা কাটিয়া পশম ও সূতা বাহির করে। আমাদের মত ইহাদিগকে বিদেশীর মুখ চাহিতে হয় না! পাহাড়ী "থুল্‌মা' (পশমের মোলায়েম কম্বল) ইহাদেরই হাতের বয়ন-শিল্প।

ইহাদের মধ্যে বিবাহ-পদ্ধতি এক প্রকার "কোর্টশিপের" মত চলিয়া

আসিতেছে। গ্রামের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট ঘর আছে, তাহাকে "রাম্‌বাং" বলে। বিবাহের পূর্ব্বে যুবক-যুবতীরা বেশভূষা করিয়া সেখানে রাত্রিকালে মিলিত হয়। মদ্যপান, নৃত্যগীত ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়া, এই সকল যুবক-যুবতীর মধ্যে যিনি যাহার সহিত প্রেম-বিনিময় করিয়া বসিলেন, তাঁহারাই যথাক্রমে বর ও কন্যা সাব্যস্ত হ'ন। যুবতীর সম্মতি পাইলে সে-সময়ে তাহার প্রণয়াস্পদ একটি আংটী উপহার দিয়া থাকে। এইরূপে প্রণয়ি-যুগলের মধ্যে প্রেম-সম্বন্ধ গাঢ় হইলে, উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেন। তার পর, ভালবাসার পরিণাম—পাত্র মহাশয় একদিন রাত্রিতে পাত্রীকে লইয়া নিজ বাটীতে চলিয়া আসেন। সেইখানে 'ভেড়ু-বকরা' মারিয়া ভোজ-উৎসব দেওয়া হয় এবং তখন হইতেই উভয়ে দম্পতিরূপে দশের সমক্ষে বাহির হইয়া থাকে।

মরিলেও এখানে উৎসব আছে। কাহারও মৃত্যু হইলে মৃতদেহকে শোভাযাত্রা (Procession) করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়, ইহাও আমরা একদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অধ্যাত্মের দিক দিয়া সে সময়ে আমার মনে এই ধারণা হইয়াছিল—কৈলাস-পতি শিবের সমাধিক্ষেত্রের আশে-পাশে এই উত্তরাখণ্ডে মৃত্যু হইলে শবের শিবত্ব-প্রাপ্তিই হয়। তাই কাশীর মত শবের শোভাযাত্রা এ দেশেও প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এ সকল ধারণা পাহাড়ীদের মধ্যে নিশ্চয়ই নাই। তবে একদল পুরুষ ও একদল স্ত্রীলোক পদ ও মর্য্যাদাক্রমে সে সময়ে পর পর শবোৎসবে শ্মশান পর্য্যন্ত মৃতদেহের অনুগমন করিয়া থাকে।

গার্ব্বিয়াংএ আমরা তিন দিনমাত্র ছিলাম। সে সময়ে ইহাদের রীতি-নীতি সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

এখানে নূতন চাউল, আটা, ঘৃত, মসুর ডাল, ভেলি গুড়, ছাতু

প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানকার লোকের হাতে তৈয়ারী কাপড়ও কিছু কিছু বিক্রয় হইয়া থাকে। চাউল সাধারণতঃ প্রতি টাকায় সওয়া চারি সের, আটা প্রতি টাকায় পাঁচ সের, ছাতু প্রতি টাকায় আট সের এবং ভেলি গুড় বারো আনায় আড়াই সের পাওয়া যায়। কেরোসিন তৈল দুর্লভ, এক টাকায় এক বোতলমাত্র পাইবেন। আমরা যে সময়ে গিয়াছিলাম, তরকারী কিছুই পাই নাই। গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ মাংসাহারী। মাংস এখানে সুলভ। ডাক্তারের দল এবং স্বামীজীরা একদিন এখানে চারি টাকা মূল্যে একটি ভেড়া ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রায় আট নয় সের মাংস হইয়াছিল, শুনিয়াছি।

আমরা যে কয়দিন ছিলাম, মিথু বাবা প্রতিদিনই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গল্পাদি করিতেন। একদিন তাঁহার সহিত আমরা একটি ঝরণা দেখিতে গিয়াছিলাম। পথে যাইতে যাইতে উত্তরপূর্ব্বদিকের তুষারাবৃত পাহাড়গুলি দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহাদের নাম 'আপি'; মানচিত্রের হিসাবে সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহাদের উচ্চতা বাইশ হাজার ফুট। এই গার্ব্বিয়াংএর উচ্চতা দশ হাজার তিন শত কুড়ি ফুট হইবে।"

এই গ্রামের বামদিকে পশ্চাদ্‌ভাগে একটি দুর্গম অত্যুচ্চ পাহাড় বিস্তৃত আছে। গ্রামবাসীদের ধারণা, সেখানে অনেকগুলি গুহা আছে এবং সেই সকল গুহামধ্যে মুনি-ঋষিরা তপস্যা করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে এই পাহাড় হইতে হরিণ নীচে নামিয়া থাকে। সে সময়ে শিকারের সুযোগ ঘটে। দুঃখের বিষয়, সে সকল সাধু মহাত্মার দর্শন-সৌভাগ্য আমাদের কাহারও অদৃষ্টে ছিল না।

আমাদের পুরাতন কৈলাসযাত্রী ডাক্তার ভি. কৌশিক পণ্ডিত মহাশয় আরও দুইজন যাত্রী সহ ইতঃমধ্যে আসিয়া পৌছিলেন। এ দুই-জন যাত্রীর মধ্যে এক জন (নাম, স্বামী রামনন্দন) ফরক্কাবাদ হইতে

আসিয়াছেন, আর একজন (নাম, শান্তিপ্রকাশ) ইয়েটা হইতে। এই-রূপে কৈলাসযাত্রীর দল ভরপূর হইয়া উঠিল।

এই "ডাক্তার-পণ্ডিত" মহাশয় স্কুলের একটি ছোট ঘরে স্থান লইয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথিকের একটি ঔষধের বাক্স তাঁহার সঙ্গে ছিল। তিনি যে একজন ভাল ডাক্তার, তাহা এখানকার লোকে জানিতে পারায়, তাঁহার ঘরটি 'ডাক্তারখানা' হইয়া উঠিয়াছিল। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, অনেকেই রোগের অবস্থা জানাইয়া ঔষধ লইয়া গেল। রোগ কি, তাহা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, শতকরা ৮০ জনের উপদংশ (Syphilis) ও ধাতুঘটিত বিকার। মদ্যপানাসক্ত, ব্যভিচার-দোষদুষ্ট, চরিত্রহীন জাতির এই সকল সাংঘাতিক রোগ থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে।

এইখানে আমার কিছু সর্দ্দি ও জ্বরভাব হওয়ায় সঙ্গে আনীত মকরধ্বজ এক মাত্রা আদা ও মধু সহ খাইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, আদা, মধু, খল ও নুড়ি সমস্তই আমরা বাটী হইতে সঙ্গে লইয়াছিলাম। মিথু বাবার সহিত একদিন আমি পেস্কার সাহেবের (তাঁহার সহযাত্রীর) নিকট গিয়াছিলাম। সে সময়ে তিনি কতকগুলি ব্যবসাদারের সহিত 'মৃগনাভি' সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। হাতে মৃগের নাভি সমেত কস্তূরী তিন চারিটি ছিল। তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তির বহর দেখিয়া আমি নিজের জন্য একটি নাভি সমেত কস্তূরী পঁচিশ টাকা মূল্যে (তাঁহার দ্বারা দর করাইয়া) সংগ্রহ করিলাম। অনেক সময়ে ব্যবসাদারেরা কৃত্রিম মৃগনাভি দেখাইয়া ক্রেতাদিগকে প্রতারণা করিয়া থাকে। পেস্কার সাহেবের প্রতিপত্তিতে তাঁহার করতলগত গ্রামের অধিবাসীরা কখনই নকল জিনিষ দিয়া দাম লইবে না, এই বিশ্বাসে আমি এতগুলি টাকা গণিয়া মৃগনাভি ক্রয় করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে এতগুলি যাত্রীর এককালীন সমাবেশ দেখিয়া, স্কুলের শিক্ষক মহাশয় বৈকালে একটি সভার আয়োজন করিলেন। ছাত্রদিগকে কিছু উপদেশ দেওয়া হয়, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। আমাদের "ডাক্তার কৌশিক" এ সকল কার্য্যে খুবই অগ্রগামী ও উৎসাহী ছিলেন; তৎক্ষণাৎ মিথু বাবাকে সভাপতি মনোনীত করিয়া একটা নোটিশ বাহির করিলেন। ছাত্র সমেত অভিভাবকদিগের উপস্থিতির জন্য সংবাদ প্রেরিত হইল।

যথাসময়ে সভা বসিল। সভাপতির জন্য একখানি চেয়ার এবং তৎসম্মুখে একটি টেব্‌ল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

দর্শক ও ছাত্রবৃন্দের জন্য ময়দানের উপর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সতরঞ্চি ও কম্বল পাতা ছিল।

ছাত্রসংখ্যা প্রায় ষাট সত্তর জন হইবে। তন্মধ্যে আট দশ জন ছাত্রীকেও দেখিলাম। আমাদের দল ছাড়া প্রায় পনেরো যোল জন স্থানীয় দর্শক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সভা-প্রারম্ভে ছাত্রদের দ্বারা দুইটি সঙ্গীত গীত হইল। তন্মধ্যে একটির প্রথম চরণ আমার মনে আছে—"মেরে প্যারে ভারত, জাগো জাগো।" পাহাড়ীদের মধ্যেও স্বদেশের অনুপ্রাণতা জাগিয়াছে! ডাক্তার কৌশিক মহাশয় হিন্দীভাষায় দুই ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার প্রধান উপদেশ ছিল, "চরিত্রসংশোধন ও সফাই (পরিচ্ছন্নতা)।" এ দেশে এই দুইটিরই একবারে অভাব, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মদ্য-পানাসক্ত এই সকল পাহাড়ীকে মদ্য পরিত্যাগ করিবার জন্য নানারূপ রসপূর্ণ গল্পের অবতারণা করিয়া বক্তা মহাশয় বাস্তবিকই সকলকে মুগ্ধ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে প্রায় নব্বুই বৎসর-বয়স্ক খদ্দর-পরিহিত সেখানকার একজন "সাধক বাবা" নগ্ন-গাত্রে, নগ্ন-পদে "গান্ধীজী" সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তাঁহার ভাষা কতকটা হিন্দী এবং কতকটা

পাহাড়ীর সংমিশ্রণ হইলেও সে সময়ে সকলেই নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ ছিলেন। ধন্য সেই মহাত্মা! যাঁহার পূত নাম, শুধু সহর কেন, কৈলাসের পাদদেশ পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে মুখরিত হইতেছে।

সন্ধ্যার পর হইতেই এ দিন বেশ বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। আহারান্তে সকলের তাঁবুতে রাত্রি কাটিল। প্রভাতে দুই তিনবার উপর্য্যুপরি বন্দুকের শব্দে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ কম্পাউণ্ডের বাহিরে গেলেন; কিন্তু কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে, ঠিক বুঝিতে না পারায় আবার ফিরিয়া আসিলেন। পরে জানা গেল, গ্রামবাসীদের মধ্যে কাহারও কোন কঠিন অসুখ হইলে রোগীর স্কন্ধে ভূত চাপে, তাই তাহারা সে সময়ে ভূত তাড়াইতে মধ্যে মধ্যে এইরূপ ভাবে বন্দুক ছুড়িয়া থাকে। পাহাড়ী জাতির রোগপ্রতিকারের আজও এইরূপ ঔষধ প্রচলিত রহিয়াছে!

সুরমা দেবীর ব্যবস্থামত আজকালই পাহাড় হইতে ঝব্বু ও ঘোড়া প্রভৃতি বাহকগণের আসিয়া পৌঁছিবার কথা। 'গোছগাছ' কি বাকী আছে, আমাদের মধ্যে সেই সব আলোচনাই হইতেছিল। প্রথমতঃ কৈলাস যাইতে এক জন 'দোভাষী'র (Interpretor) আবশ্যক শুনিলাম। তিব্বত স্বাধীন দেশ, তাহার ভাষা একবারে স্বতন্ত্র। আমরা তাহার এক অক্ষরও বুঝিতে পারি না, এজন্য এখান হইতেই যাত্রিগণ সাধারণতঃ দোভাষী লইয়া যান। দোভাষীরাই কৈলাসের দূতরূপে পথ দেখাইয়া লইয়া চলে।

"রঞ্জন" নামক একজন হুনিয়া দোভাষীরূপে আমাদের সহিত যাইতে চাহিল। ইনি সুরমা দেবীরই প্রেরিত, সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য। লোকটি হাস্যপ্রফুল্ল, রঙ্গপ্রিয় অথচ কার্য্য-কুশল। হিন্দীভাষায় বিলক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে জানে। খোরাক ছাড়া প্রতিদিন তাহাকে দেড় টাকা হিসাবে দিতে হইবে স্থির হইল। এক্ষণে একটি কথা বলা আবশ্যক, দুই

একজন কৈলাসযাত্রীর কৈলাস যাইতে গেলে এই দোভাষীর সমস্ত খরচাদি একাকীই বহন করিতে হয়। সুবিধার বিষয়, আমরা এই খরচ তিন দলে (ডাক্তারের দল, উত্তরপাড়ার দল এবং আমাদের দল) সমান ভাগে বহন করিয়াছিলাম।

কৈলাস হইয়া পুনরায় গার্ব্বিয়াংএ ফিরিতে আন্দাজ কুড়ি দিন লাগিবে, ইহা জানিতে পারিয়া দোভাষীর জন্য তদুপযোগী খোরাক তিন দলের খরচায় খরিদ করা হইল।

ভূপ সিংএর অবস্থা দেখিয়া দোভাষী আমাদিগকে এখান হইতে একটি পাহাড়ী চাকর লইবার পরামর্শ দিল। কৈলাসে অত্যন্ত শীত পড়িবে। এ পথে প্রতিদিন তাঁবু খাটানো ব্যাপার হইতে বোঝা বাঁধা, খোলা, জল গরম করা, কাপড় কাচা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য 'হুসিয়ারের' মত সম্পন্ন করা ভূপ সিংএর দ্বারা কোনমতেই সম্ভব নহে। তাই বাধ্য হইয়া "পান সিং" নামক একজন পাহাড়ীকে সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা হইল। মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে তাহাকে দিতে হইবে। তাহা ছাড়া খোরাক। এই সকল কারণে গার্ব্বিয়াং হইতে আমরা আটা সাড়ে বারো সের, মসুর ডাল এক টাকার, চাউল সাড়ে আট সের এবং গুড় আড়াই সের অতিরিক্ত খরিদ করিয়া লইলাম ; তাহার সহিত ছাতু পাঁচ সেরও লওয়া হইল, সেটা কেবল ভূপ সিংএর অনুরোধে। সে বলে; ছাতু না পাইলে কৈলাসের শীতে মারা পড়িবে! এত বড় পার্টির সহিত একসঙ্গে আসিয়া যদিও তাহার রসনায় এপর্য্যন্ত কোন জিনিষ বাদ পড়ে নাই, তথাপি সে সময়ে দিদি তাহার এই অকাট্য অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কি জানি, আহার্য্য দ্রব্যে কম পড়িলে হয় ত সিং মহাশয় বন্দুকটি পর্য্যন্ত স্কন্ধ হইতে নামাইয়া চাকরকে দিতে চাহিবে! চাকর নিযুক্ত হওয়ায় তাহার আনন্দের সীমা ছিল না।

চাকর নিযুক্ত হইল, কিন্তু কৈলাসে যাইবার পোষাক তাহার ছিল না। শীতে মরিবে কি? তাই তাহার জামা ও পায়জামার জন্য এক টাকা সাড়ে তের আনা মূল্য দিয়া দুই গজ বারো গিরা কাপড় কেনা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার দরজীকে আট আনা পয়সা মজুরী দিয়া তাহার পোষাক তৈরী করান গেল। তাহা ছাড়া তাহার জুতার জন্য আরও এক টাকা নয় আনা খরচ পড়িল।

আমাদের সঙ্গে ছোট ছোট দুইটি তাঁবু ছিল। দূরদেশে লইয়া যাইবার পক্ষে সুবিধা হইবে মনে করিয়া হাল্কা ও ছোট দেখিয়া উহা যাত্রার পূর্ব্বে কাণপুর এল্‌গিন্‌ মিল (Elgin Mill) হইতে খরিদ করা হইয়াছিল। একটি তাঁবু আস্‌বাবের বোঝায় ক্রমশঃ ভরিয়া উঠিল। বাকী একটি তাঁবুতে ছয় জন লোক কোনমতেই ধরে না, বিশেষ তিব্বতের পথে ঘর নাই। তাঁবুর ভিতরেই রান্না-খাওয়া সবই সম্পন্ন করিতে হইবে। বাহিরে কেবল ঝড় বহিয়া থাকে। এইরূপ নানা অসুবিধার কথা শুনিয়া দোভাষীর কথামত আমরা কুড়ি পঁচিশ দিনের উপযোগী একটি মাঝারী সাইজের (size) তাঁবু ছয় টাকা ভাড়ায় চুক্তি করিয়া সঙ্গে লইলাম। স্বামীজীরাও এখান হইতে একটি তাঁবু ভাড়া করিলেন। এইখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। চেষ্টা করিলে এখানে দুই চারিটি তাঁবু ভাড়া মিলিতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে বেশী যাত্রী হইলে সকলেই যদি পৃথক্ পৃথক্ তাঁবু ভাড়া করিতে চান, তবেই মুস্কিল হইয়া উঠে। এ জন্যই বাটী হইতে তাঁবু সঙ্গে লইতে পারিলে পথে কোন চিন্তার কারণ থাকে না। এইরূপে সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ইংরাজী ১৩ই জুলাই বা ২৯শে আষাঢ় শনিবার গার্ব্বিয়াং হইতে আমরা রওনা হইলাম।

পঞ্চম পর্ব্ব

গার্ব্বিয়াং হইতে তাকলাকোট

আমাদের সমস্ত যাত্রীর আস্‌বাবাদি লইয়া যাইবার জন্য পাহাড় হইতে কালো রংএর বাইশটি ভীষণাকার ঝব্বু আসিয়া স্কুল-সমক্ষে উপস্থিত হইল। তাহাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টার এককালীন রুণু-ঝুণু শব্দ আমাদিগকে সে দিন কোন্ এক অজানা দুর্গম পথের যাত্রা সূচিত করিয়া দিতেছিল। আমরা আপন আপন আস্‌বাবাদি (মায় তাঁবু পর্য্যন্ত) তাহাদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিলাম। আহারান্তে বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে একে একে যাত্রা করা হইল।

দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী ঝব্বুর উপরে এই প্রথম সওয়ার হইলেন। ঝব্বুর পৃষ্ঠদেশে প্রথমে কয়েকটি কম্বল বিছাইয়া মধ্যস্থলে জিনের মত কাষ্ঠের একটি আধার (যাহার উপরে বসিতে হইবে) স্থাপিত হইল, পরে তাহার উপরে আরও দুই একখানি কম্বল ঢাকা দিয়া একটু গদির মত হইলে, মজবুত দড়ির দ্বারা দুই দিকে দুইটি 'রেকাব' প্রস্তুত করিয়া ঝব্বুর মালিক যখন এই দুইজন নারী-যাত্রীকে তৎপৃষ্ঠে উঠিয়া বসিতে বলিল, তখন বলিতে কি, ইঁহাদের এক দফা গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিল। রঞ্জনের সাহায্যে ইঁহাদিগকে বসাইয়া, প্রত্যেকেরই কটিদেশে একটি কাপড়ের বেড় ঝব্বুর পৃষ্ঠদেশের সহিত সংলগ্ন রাখা হইল।

এই সকল ঝব্বু অতি ভীষণকায় জন্তু। আরোহিগণ উঠিবার কালে ইহারা প্রথমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুবই সঞ্চালন করিয়া বাধা দিয়া থাকে। একবার চড়িয়া তাহাদের নাকের সহিত সংলগ্ন দড়িটি (লাগাম) ধরিতে



ঝব্বু-পৃষ্ঠে

পারিলেই আরোহী কতকটা নিশ্চিন্ত মনে করে। ঝব্বু ছাড়া চারিটি ঘোড়াও পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ, ভূপ সিং, গঙ্গাধর ঘোষ এবং আমি এই চারিজনে তাহাতে সওয়ার হইলাম। আর আর সকলেই পদব্রজে গেলেন। গার্ব্বিয়াং হইতে তাকলাকোট পর্য্যন্ত এই ঝব্বু বা ঘোড়ার ভাড়া প্রত্যেকটি সাড়ে চারি টাকা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছিল। তাহা ছাড়া সওয়ার-ঝব্বু ছুইটি ধরিয়া লইয়া যাইতে ছুই জন চালক প্রত্যেকের আড়াই টাকা হিসাবে এবং কুড়িটি ভারবাহী ঝব্বুর পাঁচজন চালক প্রত্যেকের ছুই টাকা হিসাবে ভাড়া চুক্তি ছিল।

এখান হইতে আগে যাইতে যে সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সেখানে কাষ্ঠ পাওয়া দুর্ঘট জানিয়া যাত্রিগণের মধ্যে স্বামীজীরা তিন চারি জন রঞ্জনকে সঙ্গে করিয়া, আগের পথে এক স্থান হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বেই রওনা হইয়াছিলেন। এজন্য রঞ্জন একটি কুঠার (টাঙ্গি) সঙ্গে লইয়াছিল। যাত্রার পথে এখানে সকলেই সঙ্গে অস্ত্র রাখে। আমাদের ঝব্বু-চালক প্রত্যেকেরই কটিদেশে একটি করিয়া তীক্ষ্ণধার ভোজালী শোভা পাইতেছিল। কালী-নদীর তীরে তীরে কখনও এপারে, কখনও বা ওপারে অর্থাৎ নেপাল-সীমানা দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে পাহাড়ী গাছ (দেবদারুর মত) এবং ছোট ছোট জঙ্গলী গাছের ঝোপ অতিক্রম করিতে হইল। এক স্থানে একটি ঝরণা পার হইয়া, সম্মুখে খাড়া উঁচু রাস্তা পড়িল। ঝব্বুরা বোঝা লইয়া সে রাস্তা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। মহিষাকৃতি এই সকল জানোয়ারের পৃষ্ঠে স্ত্রীলোক দেখিয়া তখন মনে হইতেছিল, বুঝি বা মায়ের জাতি মহিষ-মর্দ্দিনীরূপে এই দুর্গম শৈল-শিখরে কৈলাস-পতি সন্দর্শনে চলিয়াছেন। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। রাস্তায় জীব-জন্তু-পাখী কাহারও কোন সাড়া-শব্দ

পাওয়া যাইতেছিল না। শুধুই পাহাড়ের পর পাহাড় দুর্গের মত চারিদিকে আড়াল করিয়া দিয়াছে। তাহাদের মাথার উপরের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলি সৌরকিরণপাতে উজ্জ্বলতর হইয়া চোখের সমক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছিল, ঠিক যেন মহাদেবের রজতশুভ্র অট্টহাসিরই মত।

ঘোড়া লইয়া আমরা এই উঁচু রাস্তায় উঠিবার সময়ে, হঠাৎ ভূপ সিং ঘোড়ার সাজ সমেত লেজের দিক্ দিয়া নীচে গড়াইয়া পড়িল। রণে ক্ষান্ত না দিয়া "সিংহ-প্রবর" সে সময় বোধ করি লেজ ধরিয়াই স্বর্গে যাইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তাই যে মুহূর্ত্তে লেজটি ধরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গলাভের উপক্রম অর্থাৎ ছিট্কাইয়া একবারে পাশের দিকে শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের ঘোড়ার পায়ের উপর পড়িয়া গেলেন! এ ব্যাপারে সে নিজে ত যথেষ্ট আঘাত পাইল-ই, অধিকন্তু শ্রীমানের ঘোড়াও এই অতর্কিত আঘাতে লাফাইয়া রাস্তার একদম কিনারে আসিয়া পৌছিল। সুখের বিষয়, শ্রীমান্ তাহার ঘোড়াটির রাশ খুবই সংযতভাবে ধরিয়াছিল, নতুবা ঘোড়া সমেত নীচে নদীগর্ভে পড়িতে বাধ্য হইত। এই সব অপ্রত্যাশিত বিপদের সূচনা দেখিয়া, আমি মনে মনে ভগবান্‌কে স্মরণ করিলাম। আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আমি নিজেই ঘোড়া হইতে নামিয়া পদব্রজে যাওয়াই স্থির করিয়া লইলাম। চালকের বহু পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আর আমি সে যাত্রায় ঘোড়ায় উঠি নাই। ভূপ সিং (বেচারী!) আঘাত পাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল, পরক্ষণে আবার হাসিমুখেই ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল!

বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে পথের পার্শ্বে একটা জঙ্গলের মাঝে স্বামীজীদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইতঃমধ্যেই তাঁহারা অনেকগুলি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত্যেক ঝব্বুর বোঝার সহিত দুই চারিটি করিয়া মোটা মোটা কাষ্ঠ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আমার



কালাপাণিতে ভুটিয়া-ব্যবসায়ী

ঘোড়াটি—আমার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ বহিয়াই লইয়া চলিল। কালী-নদীর ধার দিয়া বরাবর আমরা এইরূপে সন্ধ্যা নাগাইদ "কালাপানি"তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

কালাপানি নাম শুনিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল, বুঝি বা জলের রং এখানে কালো হইবে (অবশ্য আন্দামানের কালাপানি ভাবি নাই।), কিন্তু এখানে আসিয়া সে ভ্রম দূর হইল। যেখানে আমাদের তাঁবু পড়িল, তাহার পার্শ্বেই একটি ঝরণা বহিয়া যাইতেছিল। ঝরণাটির জল একবারে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার, তায় তুষারবৎ শীতল, নীচে কালী-নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানে দুই এক ঘর মাত্র লোকের বাস। এখানকার উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে তেরো হাজার ফুট হইবে। শীতে এখানে অনেকেরই ঠোঁট ফাটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। যে সকল কাষ্ঠ সঙ্গে করিয়া আনা হইয়াছে, তাহা হইতে কতক কতক কাষ্ঠ চিরিয়া লইয়া রঞ্জন রান্নার যোগাড় করিয়া দিল। কেহ চা খাইলেন, কেহ খিচুড়ী, কেহ বা লুচি-হালুয়া তৈয়ার করিলেন, আবার একাহারী পাবনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের মত লোক না খাইয়াই হয় ত রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার সহিষ্ণুতা অসীম। ইচ্ছা করিয়া এ পর্য্যন্ত তিনি বরাবর পদব্রজে নগ্নপদেই (যদিও একজোড়া নূতন জুতা তাঁহার সঙ্গে ছিল) চলিয়া অসিতেছেন। অসম্ভব না হইলে পায়ে জুতা ব্যবহার করিবেন না, আবার পদব্রজে যাওয়া ছাড়া ঝব্বু বা ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠিয়া তাহাদিগকে কষ্টও দিবেন না, তীর্থযাত্রায় তাঁহার মনের ইহাই সংকল্প ছিল।

গার্ব্বিয়াং হইতে আজ আমরা প্রায় এগারো মাইল পথ আসিয়াছি। পরদিন অর্থাৎ ইং ১৪ই জুলাই বা ৩০শে আষাঢ়, রবিবার আহারাদি শেষ করিয়া বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে কালাপানি হইতে যাত্রা করি। এখনও

পর্য্যন্ত পথের ধার দিয়া সেই কালী-নদীই বহিয়া আসিতেছে। তবে পাহাড়ের অঙ্গ বনস্পতিহীন অর্থাৎ একবারে অনাবৃত। মস্তকের উপরে কেবল তুষারের শুভ্র সৌন্দর্য্য পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সূর্য্য-কিরণে উজ্জ্বল-তর হইয়া সে সৌন্দর্য্য স্থানে স্থানে উথলিয়া পাহাড়ের কোল দিয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে। রাস্তার আশে-পাশে তৃণশোভিত নাতিপ্রশস্ত পর্ব্বতের জমির উপরে কোথাও বা 'মরশুমী' ফুল চিত্র-বিচিত্ররূপে আমাদের উৎসুক নয়ন মোহিত করিতেছিল। সে ফুলগুলি অনেকটা 'এ্যাষ্টার' জাতীয়। তবে তাহার সৌন্দর্য্য আমাদের কৃত্রিম উপায়ে অবলম্বিত গাছের ফুল অপেক্ষা আরও মধুর ও উজ্জ্বল। নানারূপ নূতন কল্পনা লইয়া আমরা এই পথে বেলা দেড়টা আন্দাজ সময়ে একটি ঝরণা সম্মুখে পাইলাম। ঝরণাটির প্রশস্ত ধারা পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া কালী-নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এ ঝরণা আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হয় নাই। ঝরণার পরপারেই একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বত। তুষার-মালায় তাহার সমস্ত গাত্রটি প্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এখান হইতে কালী-নদী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ মনে হইয়া থাকে। কারণ, এই ঝরণা ও কালী-নদীর সঙ্গমস্থল এপার হইতে যতদূর দেখা যাইতেছিল, তাহাতে ঐ তুষার-ধবল পাহাড়ের গা দিয়াই এই নদী-প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে, ইহা স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে।

এইবার আমরা কালী-নদীকে পশ্চাতে রাখিয়া ঝরণাটির ধারে ধারে অগ্রসর হইব। এখান হইতে সম্মুখের পাহাড়টির দৃশ্য এতই নয়নরঞ্জক যে, দেখিবার জন্য আমরা সকলেই সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। জটাজূটধারী যোগিশ্রেষ্ঠের নির্ব্বাণের প্রতিমূর্ত্তি সজীব হইয়া সে দিন যেন নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। রজত-প্রভা-সমন্বিত এই সকল হিম-গিরির নির্জ্জন প্রদেশে হিমালয়-পতির চিরবিশ্রামের আবাস-স্থল মনে

করিয়া ক্ষণেকের জন্য এই বিচিত্র শৈলমালার তুষারের মাঝখানে আমাদের মন একেবারে হারাইয়া গিয়াছিল। উদ্‌ভ্রান্তের মত সে দিন আমরা এই দৃশ্য বিহ্বলনেত্রে দর্শন করিয়াছি। যতই অগ্রসর হইতেছি, প্রকৃতির সুরম্য নিকেতনে ততই নিত্য নূতন দৃশ্য দেখিয়া পিপাসিত নয়ন চরিতার্থ হইতেছে। ঝরণাটির পাশে পাশে কিছু দূর গিয়া বেলা দেড়টা আন্দাজ সময়ে আমরা "সঙ্‌চিং"এ আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পথিমধ্যে বাম-দিকের পাহাড় হইতে নামিয়া-আসা দুই তিনটি ঝরণার অতিক্রম-সময়ে ইহার তুষার-শীতল ধারায় প্রত্যেক যাত্রীই পায়ের অস্তিত্ব প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

সঙ্‌চিংএর উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় পনেরো হাজার ফুট হইবে। এখানে ঘর-বাড়ী কিছুই দেখিলাম না। সম্মুখেই চির-দুর্গম "লিপুলেক" পাহাড়। নীচে ঝরণার ধারেই একটু সমতল ক্ষেত্রের উপরে তাঁবু খাটাইবার ব্যবস্থা হইল।

এত বড় দলের মধ্যে তাঁবু বড় কম ছিল না। স্বামীজীদের একটি বড় তাঁবু (তাহাতে ডাক্তারের দলও শয়ন করিতেন), উত্তরপাড়া-দলের একটি তাঁবু, রায় মহাশয়ের একটি, আমাদের তিনটি এবং রঞ্জন ও চাকর প্রভৃতির একটি—মোট সাতটি তাঁবু একস্থানে গোলভাবে খাটান হইল। তাহা ছাড়া ঝব্বু-চালকদিগেরও ছোট ছোট দুইটি কম্বলের 'ঘেরাও' তাঁবুর আকারে শোভা পাইতেছিল। প্রতিদিন পার্ব্বত্য-পথের এক এক স্থানে এতগুলি তাঁবুর ক্রমিক পত্তন, আবার পরদিনেই তাহা উঠাইয়া লইয়া 'ঝটিতি' যাত্রা—এ একটা আমাদের বিরাট্ অভিযান! স্বেচ্ছাসেবকদের মত প্রতিদিন এ বাহিনী স্বেচ্ছায় কোন্ এক মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া নির্ভীকচিত্তে চলিয়াছে, তাহা যেন একমাত্র কৈলাসপতিই—এ প্রদেশের অধিপতি প্রীতমনে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

অত্যন্ত শীতবোধ হওয়ায় এই সকল তাঁবুর মধ্যভাগে বড় বড় কাঠ আনিয়া রঞ্জন আগুন জ্বালিল। ঝরণার জলে হস্ত-পদাদি কোনরূপে ধৌত করিয়া এই আগুনের পাশেই সকলে বসিয়া যাত্রার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডাক্তার কৌশিক ও তাঁহার সহযাত্রী দুই-জন এখানে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিলেন। স্থির হইল, অন্ধকার রাত্রিতে খুব শীঘ্র শয্যাত্যাগ করিয়া, প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে লিপুলেক অতিক্রম করিতে হইবে। বিস্তৃত তুষাররাশির উপর দিয়াই ইহার পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে তুষার গলিতে আরম্ভ হয়; তাই রৌদ্র নামিবার পূর্ব্বেই লিপুলেক পার হইতে পারিলে পথিকদের সেরূপ কষ্টের কারণ থাকে না। এই সব পরামর্শের পরে আমরা যত শীঘ্র সম্ভব জলযোগ শেষ করিয়া শয্যার আশ্রয় লইলাম। কালাপানি হইতে সঙ্‌চিং পাঁচ মাইল আন্দাজ হইবে।

অত্যধিক শীতে রাত্রিকালে কাহারও নিদ্রা হয় নাই। বিশেষ, রাত্রি তিনটা হইতেই ভুটিয়া-ব্যবসাদারেরা ভেড়ার দল হাঁকাইয়া আগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের হাঁক-ডাক—মুহুর্মুহুঃ চীৎকার-শব্দ তাঁবু ভেদ করিয়া কর্ণপটহে বিদ্ধ হইতেছিল। রাত্রি চারিটা আন্দাজ সময়ে তাঁবুর বাহিরে আসিয়া আমাদের শঙ্করনাথ স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া সকলকে জাগাইয়া দিলেন। শয্যাত্যাগ করিয়া প্রতিদিনের মত আবার আস্‌বাবাদি ঠিক করিয়া ঝব্বু-চালকদিগের নিকট দেওয়া সুরু হইল। হস্তমুখ-প্রক্ষালনান্তে এ দিন সকলেই ভোর পাঁচটা আন্দাজ সময়ে ভগবানের নাম লইয়া যাত্রা করিলেন।

লিপুলেক-পর্ব্বতের উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ষোল হাজার সাত শত আশী ফুট হইবে। ইহা পার হইতে পারিলেই তিব্বতরাজ্য আরম্ভ হইবে। এতদিনে হিমগিরির দুর্লঙ্ঘ্য শিখরগুলি এ পথে অতিক্রম করা



তুষারমণ্ডিত লিপুলেক ৯৪

এক প্রকার শেষ হইয়া গেল। গর্ব্বিত-চিত্তে ক্রমশঃই আমরা চড়াইয়ের পথে উঠিতে লাগিলাম। প্রায় দুই মাইল আন্দাজ অগ্রসর হইয়াই, এ দিন আমাদের পদদ্বয় অবশ হইয়া আসিল। উৎসাহ থাকিলেও চলিতে শরীর নিতান্ত ভারাক্রান্ত মনে হইতেছিল। রাস্তার চড়াই যে খুব উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে, বরং আসা-পথের তুলনায় এ পথ অনেকটা সুপ্রশস্ত ; সুতরাং যাতায়াত-পক্ষে সুবিধাজনক, তথাপি আগে চলিতে প্রত্যেক যাত্রীরই দ্রুতগতি শ্বাস-প্রশ্বাসের কাতর শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। অসহ্য শীত, তায় চারিধারের তুষার-স্পর্শী বায়ু আসিয়া যাত্রার পথে আমাদিগকে সে সময়ে বিলক্ষণ বাধা দিতে লাগিল। নিঃশব্দে অবসন্ন হৃদয়ে চলিতেছি, সম্মুখেই এবার তুষারের মাঝখানে প্রায় দুই ফার্লং-ব্যাপী রাস্তা দেখিয়া সকলেই প্রমাদ গণিলেন। রায় মহাশয়ের নগ্ন পদে এতক্ষণে ষ্টকিং সহ জুতা দৃষ্ট হইল। ঝব্বুর দল বোঝা সমেত তুষারের পথে নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন ধরিয়া চলিয়া গেল। আমরা দীর্ঘ যষ্টি-ভর দিয়া সেই পথটুকু ধীরে ধীরে পার হইলাম। তার পর আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই পুনর্ব্বার তুষারের রাস্তা দেখিতে পাইলাম। এবারের এ পথটি ক্রমশঃই উচ্চে উঠিয়া কিছু দূরে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে গিয়া শেষ হইয়াছে। এখানে দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী ঝব্বু হইতে নামিতে বাধ্য হইলেন। ভারবাহী ঝব্বুদল বোঝা লইয়া এ পথটুকু বহু ক্লেশে পার হইয়াছিল। দুইজন ঝব্বুচালক দিদি ও সহযাত্রিণীকে ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। লাঠি ভর দিয়া আমরা আর আর সকলে এ তুষার অতিক্রম-কালে, উত্তরপাড়ার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন। 'চট্টরাজের' পরিবর্ত্তে তাঁহার পায়ে নূতন 'ক্রেপ্ শু' উঠিলেও তাঁহার পা দুইখানি তিন চারি বার জানু-প্রমাণ গলিত বরফের মধ্যে বসিয়া গিয়াছিল।

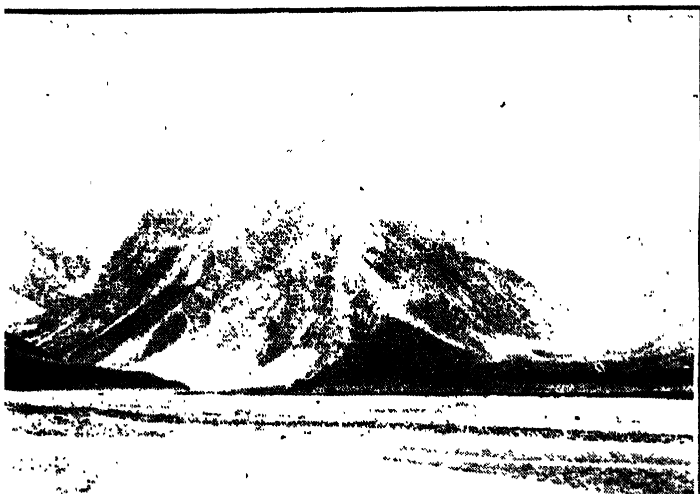
এই তুষার-কিরীটী শৃঙ্গের নিকটে দেখিলাম, একটি শুষ্ক বৃক্ষদণ্ড

শাখাসমেত খাড়া রহিয়াছে। দণ্ডটির মূলাংশ কতকগুলি সজ্জিত প্রস্তর-খণ্ডে বেষ্টিত এবং তাহার শাখা-প্রশাখায় নানা বর্ণের কতকগুলি ছিন্ন বস্ত্র-খণ্ড বাঁধা ছিল। এই পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিলেই চড়াইয়ের শেষ হইল, ইহা যাত্রীদিগকে জানাইবার জন্যই তিব্বতীরা এইরূপে জয়-যাত্রার সূচনা করিয়া দিয়াছে। শুনিলাম, এই বস্ত্র-খণ্ড বাঁধিবার সময়ে ইহারা ঠাকুরের নামে 'মানসিক' করিয়া থাকে।

লিপুর শেষ স্তরে উঠিয়া এইবার আমরা ওপারে তিব্বত পানে একবার চাহিয়া দেখিলাম। কি মনোরম দৃশ্য! চোখের সম্মুখেই (যদিও তাহা কিছু দূরে রহিয়াছে) প্রভাতের রবি-করোজ্জ্বল তুষারশুভ্র "গুরেলা মান্ধাতা" চিত্রপটের মত সুবিস্তৃত। এই পাহাড়ের উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় পঁচিশ হাজার ফুট। তুষারের ঢেউ দিয়া দিয়া পাহাড়টি যেন কৈলাস-পতির চরণ বন্দনা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ভারতের শেষপ্রান্তে গিয়া আজ একবার সেই নিপুণ চিত্রকরকে অভিভূত-চিত্তে প্রণাম করিয়া লইলাম। সম্মুখেই উতরাইয়ের পথে আবার তুষার পড়িল, সে পথটি বিলক্ষণ পিচ্ছিল। একটু অসাবধান হইলেই নীচে গড়াইয়া পড়িবার যথেষ্ট আশঙ্কা। যাত্রিগণ ধীরে ধীরে প্রত্যেকেই লাঠি ও গোড়ালির ভর রাখিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। এত সাবধানতা সত্ত্বেও কালিকানন্দজী এই বরফে পা পিছলাইয়া প্রায় আট দশ হাত নীচে পড়িয়া গেলেন। ডাক্তার-দলের মধ্যে একজন (নলিন বাবু) সে সময়ে তাঁহাকে না ধরিলে তিনি বিশেষ আঘাত পাইতেন। আমেদাবাদ-নিবাসী "ডাক্তার কৌশিকের'ও ঐ দশা! পা পিছলাইয়া বসিয়া বসিয়া তিনি কুড়ি হাত নীচে গড়াইয়া পড়িলেন। অন্তর ধুক্-ধুক্ করিলেও মুখে তাঁহার বীরত্বের হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, ইচ্ছা করিয়াই তিনি বসিয়া নীচে নামিলেন। দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী দুইজনকেই দুইজন



লিপুলেক—তুষারবৃত গিরিপথ



তাকলাকোটের পথে

করিয়া ঝব্বু চালক হাত ধরিয়া নীচে নামাইয়া লইয়া চলিল। তাঁহাদের অবস্থা এখানে কিরূপ বিপজ্জনক হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপে এ উত্‌রাই শেষ করিয়া বেলা আটটা আন্দাজ সময়ে একটি সমতল ক্ষেত্রে সকলেই উপস্থিত হই-লাম। অত্যধিক পরিশ্রান্ত হওয়ায় এখানে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করা হইল। পার্শ্বেই তুষারগলিত ঝরণা বহিয়া যাইতেছিল। কিছু জলযোগান্তে সকলেই সে ধারা আকণ্ঠ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে ঝরণার ধারে ধারে এইবার আমরা তিব্বতের রাস্তায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। এবারকার রাস্তা কতকটা সমতল, কতকটা বা নিম্নমুখী। সুতরাং কাহাকেও কষ্ট পাইতে হয় নাই। তবে ইচ্ছা থাকিলেও দ্রুত অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। কারণ রৌদ্র ও বাতাস দুইটিই আমাদের এ ইচ্ছার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপ প্রখর রৌদ্র বা প্রবল বাতাস উপভোগ করা—ইহাই আমাদের প্রথম! রৌদ্রের তেজে চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতেছিল। এই জন্যই এ পথে রৌদ্রনিবারক চশমা (sun-gogles) আবশ্যক করে।

পাহাড়ের দৃশ্যও এখান হইতে অন্যরূপ। এখানকার পাহাড়ের সেরূপ আকাশচুম্বী ভীষণকায় উচ্চতা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। একটু যেন খর্ব্বাকৃতি। হিমালয়ের উন্নত শৃঙ্গ ইহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিয়াছে! পরাজয় মানিয়া লজ্জায় ইহাদের রং যেন অন্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। কোনটী হল্‌দে, কোনটী গৈরিক, আবার কোনটি বা "কার্‌বলিক সাবানের" মত রংএ সুশোভিত। মাথার উপরে প্রায়ই জমাট তুষার—সাদা-কালোর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। এ দৃশ্য দেখিতে নূতন ও বিচিত্র। আবার কোন কোন স্থানে পাহাড় অস্থিকঙ্কালসার হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ঝরণার ধারে ধারে তাহাদের 'ধস্‌'-ভাঙ্গা প্রস্তরখণ্ডের স্তূপের

মধ্য দিয়া রাস্তা অতিক্রম করিতে আমরা বার বার ধৈর্য্য হারাইয়াছি। ঝরণার ওপারের রাস্তা ধরিতে উহার জল কোন স্থানে উরুপ্রমাণ দেখিয়া, রঞ্জনের পৃষ্ঠদেশে উঠিয়া আমরা একে একে পার হইলাম। এই-রূপে প্রায় চারি মাইল আন্দাজ পথ গিয়া "পালায়" উপস্থিত হই। এখানে একখানিমাত্র পাথরের ঘর। ঝরণার ধারে ধারে কিছুদূর পর্য্যন্ত প্রশস্ত তৃণভূমি ছিল। ঝব্বুর দল ও ঘোড়া কয়টি এখানে কিছুক্ষণ তৃণ-চর্ব্বণের সুযোগ পাইয়াছিল। যাত্রীরাও কেহ কেহ বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

এখান হইতে তিন, সাড়ে তিন মাইল আগে গেলেই "তাকলাকোট।" এই ঝরণার ধারাই ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়া সে গ্রাম পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছে। দূর হইতে তাকলাকোটের এ দৃশ্য খুবই মনোরম। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট কুঠারীগুলি বোধ হইতেছিল, ঠিক যেন কপোত রাখা কাঠের খোপের মত। বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে প্রথমে তৃণশোভিত প্রশস্ত ময়দান, তার পর শ্যাম-শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র পার হইলাম। মধ্যে মধ্যে কৃষকদের দুই একখানি কুটীর, নিকটেই গ্রামের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিতেছিল। সবুজ কড়াইশুঁটির ক্ষেতে প্রথমেই নজর পড়িল। দুঃখের বিষয়, গাছে তখন ফল ধরে নাই, শুধু ফুলই ফুটিয়াছে। যব ও গমের ক্ষেতে শীষ সবেমাত্র বাহির হইতেছে। এ সময়ে আমাদের দেশে এ সকল রবিশস্য ফলে না, তবে শীতের দেশে ইহাই সময়। কৃষকেরা ঝরণার প্রবাহ-ধারা বাঁধিয়া এমনভাবে ক্ষেতের মাঝে লইয়া গিয়াছে যে, সহজেই পর্য্যাপ্ত জল-সেচনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই গ্রামে পড়িলাম। নূতন লোক দেখিয়া এখানকার গ্রাম্য কুকুরগুলি চীৎকার করিয়া উঠিল। ব্যাঘ্রাকৃতি ইহারা যেমন ভীষণ-দর্শন, ইহাদের চীৎকারও তেমনই গুরুগম্ভীর। গ্রামবাসীদের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি ভেদ করিয়া আমরা ধীরে ধীরে "কর্ণালী" নদীতীরে

আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, গ্রামটি নদীর দুই দিকেই উচ্চ পাড়ের উপর অবস্থিত। নদী গভীর ও প্রশস্ত না হইলেও ইহার জলে যথেষ্ট বেগ রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে ইহার গতি ভিন্নমুখী হইয়া একই দিকে দুই তিনটি ঝরণার আকারে প্রবাহিত। মধ্যে কেবল পাথরের 'নুড়ি' বিস্তৃত রহিয়াছে। গ্রামবাসীদের পারাপারের জন্য স্থানে স্থানে কাঠের পুল থাকায়, আমরা এ নদী পার হইয়া পাড়ের উপর একটু বিস্তৃত খালি যায়গায় আসিয়া পৌঁছিলাম। এই পাড়ে উঠিবার সময় মধ্যস্থলে রাস্তার এক পার্শ্বে একটি ঝরণা ক্ষীণ ধারায় বহিয়া যাইতেছিল, দেখিলাম। জলের সুবিধা হইবে মনে করিয়া রঞ্জনের কথামত ইহার উপরের খালি যায়গাতেই তাঁবু খাটাইবার স্থান মনোনীত হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঝব্বুর দলসহ অপরাপর যাত্রী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

সঙ্‌চিং হইতে এই তাকলাকোট প্রায় এগারো মাইল পথ হইবে। সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা পনেরো হাজার ফুট। ইহার তিব্বতী নাম "পূরাং"। চারিদিকেই তুষারমণ্ডিত পাহাড়গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে গ্রামটিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদিগকে "জাস্কর-রেঞ্জ" (Zadskar range) বলা হয়। মাথার উপরে সম্মুখেই একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটি বৃহৎ মঠ ও এখানকার গভর্ণরের (Governor) দুর্গপ্রাসাদ শোভা পাইতেছিল। গভর্ণরকে এখানে "জুম্পান পুসো" নামে অভিহিত করা হয়। এই জুম্পান পুসো অনুমতি দিলে তবেই বাহিরের যাত্রীরা তিব্বত-প্রবেশ করিতে অনুমতি পায়, ইহা পূর্ব্ব হইতেই শুনা ছিল। সাহেবী টুপির উপর তাঁহার কড়া নজর। দুঃখের বিষয়, শ্রীমান্ নিত্য-নারায়ণের মস্তকে এইরূপ একটি টুপি আগাগোড়া চলিয়া আসিতেছিল। আজ রঞ্জনের কথামত তাহা খুলিয়া লুকাইয়া রাখা হইল। তীর্থযাত্রী

কৈলাস দর্শন করিতে আসিতেছে কেবল পুণ্যের জন্য, রাজ্য-জয়ের উদ্দেশ্যে নহে।

তাঁবু খাটাইতে গিয়া বড়ই বিব্রত হইতে হইল। প্রথমতঃ প্রবল ঝড়ে উহাদিগকে যথাস্থানে খাড়া করিয়া ধরিতে প্রায় সাত আট জন লোক লাগিল, তার পর তাঁবুর দড়ির খোঁটা বা লম্বা পেরেকগুলি এই উপত্যকার ছোট ছোট নুড়ির মধ্যে বসাইবার শত চেষ্টা করিলেও, মাটী খুব কম থাকায়, বসিতে আদৌ বাগ মানিল না। অগত্যা আশপাশ হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড আনিয়া দড়িতে জড়াইয়া বহু কষ্টে তাঁবুগুলি খাড়া করা হইল। এখান হইতে দুই ফার্লং আন্দাজ জমি আগে এখানকার 'মণ্ডি' বা বাজার সুরু হইয়াছে। পথশ্রান্ত হওয়ায়, এ দিন আর কেহ সেখানে যাইবার আবশ্যক মনে করি নাই। সন্ধ্যাকালে মুলতান হইতে তিনজন নবাগত যাত্রী আমাদের দলে আসিয়া মিশিলেন। ইঁহাদের একজনের নাম যজ্ঞদত্ত নাগপাল। আমাদের বৃহৎ দল দেখিয়া তাঁহারা আমাদের সহিতই কৈলাস যাওয়া স্থির করিলেন। নানা প্রকার গল্পগুজবে সে দিন সুখে রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাতে আমরা আপন আপন ঝব্বু ও ঘোড়াওয়ালাদের ভাড়া ও মজুরী প্রত্যেককেই মিটাইয়া দিলাম। দুইটি সওয়ার-ঝব্বু ও দুইটী ঘোড়ার (যদিও একটি ঘোড়া কাষ্ঠ বহিয়া আনিয়াছিল) ভাড়া প্রত্যেকটির সাড়ে চারি টাকা হিসাবে আঠারো টাকা ও ছয়টি ভারবাহী ঝব্বুর ভাড়া প্রত্যেকটির সাড়ে চারি টাকা হিসাবে (একই ভাড়া) সাতাশ টাকা মোট পঁয়তাল্লিশ টাকা দেওয়া হইল। তাহা ছাড়া সওয়ার-ঝব্বু চালক দুইজন প্রত্যেককে আড়াই টাকা হিসাবে পাঁচ টাকা এবং কুড়িটি ভারবাহী ঝব্বুর পাঁচজন ঝব্বু চালক প্রত্যেককে দুই টাকা হিসাবে দশ টাকার মধ্যে—তিন অংশে (তিন দলের খরচায়) তিন টাকা সওয়া



তাকলাকোট গ্রাম



তাকলাকোট মণ্ডি

পাঁচ আনা মোট আট টাকা সওয়া পাঁচ আনা অতিরিক্ত খরচ পড়িয়াছিল। চালকদিগকে সঙ্গে আনার দরুণ মজুরী হিসাবে ইহা স্বীকারমত দিতে হইল। আপন আপন প্রাপ্য গণ্ডা লইয়া ইহারা বিদায় লইল।

এইবার আমরা মণ্ডির দিকে বেড়াইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম, মণ্ডির এক একটি ঘরে, পাথর ও মাটি-মিশ্রিত গাঁথুনীর দ্বারা চারিদিকেই দেয়াল এবং মাথার উপরে পালের মত মোটা কাপড়ের আচ্ছাদন দেওয়া আছে। এ সকল প্রদেশে বৃষ্টি খুব গভীরভাবে হয় না, তাই এই কাপড়ের আচ্ছাদনে সহজেই বৃষ্টির জল নিবারিত হইয়া থাকে। দোকানে কাপড়, উলের কম্বল, উলের টুপী, ছাগলের চামড়া, চাউল, মস্থর ডাল, আটা, ছাতু, বড় এলাচদানা, মিছরি (ওলার আকারে), কিসমিস প্রভৃতি কয়েক প্রকার শুষ্ক খাদ্য মায় কিছু কিছু মনিহারী দ্রব্য পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আমাদের দেশের তুলনায় এখানে এ সকল জিনিষের দর অনেক বেশী, তবে দুই একটি জিনিষ এখানে উৎকৃষ্ট এবং দর হিসাবেও সুলভ। বড় বড় লোমযুক্ত কোমল ছাগচর্ম্ম এক টাকা মাত্র মূল্যে পাওয়া যায়। “থুল্‌মা” (উলের অতি মোলায়েম কম্বল) প্রমাণ বছর দশ বারো টাকায় মিলিতে পারে। আলমোড়ায় ইহার দর প্রায় দ্বিগুণ বেশী হইবে। তবে এ জিনিষ শীতের দেশেই ভাল থাকে। বাঙ্গালাদেশে ইহা কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হয়। দোকানের সংখ্যা বড় কম নহে, প্রায় চৌদ্দ পনেরোটি হইবে। দোকানদারগণ কেহ গার্ব্বিয়াং অঞ্চল হইতে, কেহ বা তিব্বতের আশ-পাশ হইতে আসিয়া দোকান সাজাইয়াছে ; এই কয়মাস মাল বিক্রয় করিয়া শীতের পূর্ব্বে আবার বাটী ফিরিয়া যাইবে। আমাদের যাত্রীর মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু কিসমিস, মিছরি, আবার কেহ বা কয়েকখানি ছাগচর্ম্ম খরিদ করিলেন।

ডাক্তার কৌশিক, মিথু বাবা ও আলমোড়ার পেস্কার সাহেব এই

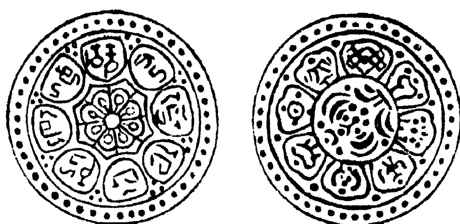
মণ্ডির মধ্যে কোন এক দোকানদারের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। দেখা হইলে তাঁহারা বলিলেন যে, অদ্যই তাঁহারা কৈলাস-উদ্দেশে যাত্রা করিতেছেন। শীঘ্র আলমোড়ায় ফিরিবার জন্য বাধ্য হইয়া আমাদের সঙ্গ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইল, এই বলিয়া তাঁহারা যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

তিব্বত স্বাধীন দেশ, তাই সেখানে স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রচলিত আছে। আমরা পথ-খরচের জন্য এখান হইতে টাকার পরিবর্ত্তে কিছু কিছু স্থানীয় মুদ্রা সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইলাম। এই মুদ্রাকে ইহারা 'তঙ্কা' বলে। তঙ্কাগুলি দেখিতে অনেকটা আধুলির মত, তবে দস্তা-নির্ম্মিত বলিয়াই মনে হয়। প্রতি টাকায় সাতটি করিয়া তঙ্কা পাওয়া গেল। এইরূপে আবার ভিন্নাকারে অর্দ্ধ তঙ্কা, সিকি তঙ্কা প্রভৃতি থাকায়, সকল প্রকার মুদ্রাই কিছু কিছু সঙ্গে রাখা হইল। কারণ, দরিদ্রনারায়ণদের আতিশয্য এখানে যথেষ্ট। এই সকল জীববিশেষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইহা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয়, সরিষা-তৈল গায়ে মাখিতে গেলে ইহারা হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখে। দাঁতের মাজন লইয়া স্ত্রীলোকেরা হাসি-ঠাট্টা করে। খাদ্যদ্রব্যের উপরেই ইহাদের নজর বেশী। ভূপ সিং একদিন তাঁবুর বাহিরে ভাত খাইতে বসিয়াছিল। আচম্বিতে এই বুভুক্ষিত জীবদলের একজন, সকলের সমক্ষেই তাহার থালা হইতে দুই গ্রাস অন্ন তুলিয়া মুখে দিল।

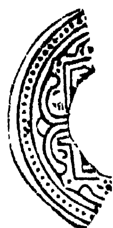
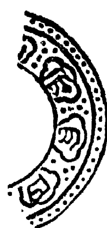
ইহাদের গায়ে শততালিবিশিষ্ট 'আল্-খাল্লা'। মাথার কেশ খাড়া ও অসম্ভব রুক্ষ। ঠিক যেন দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মনুষ্যরক্ত-পিপাসু দৈত্য!

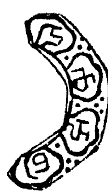
এখানকার লামাদিগের সম্বন্ধে আমরা মনে মনে অনেক উচ্চ ধারণা আনিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেরূপ শান্তচিত্ত, সদাচারপরায়ণ, উদার, অহিংসপ্রকৃতি, বৌদ্ধলামার দর্শন-সৌভাগ্য আমাদের অদৃষ্টে এক-

তিব্বতী-মুদ্রা



"তঙ্কা"



অৰ্দ্ধ-তঙ্কা সিকি-তঙ্কা

দিনও ঘটে নাই। সাধারণতঃ এই লামাদিগের হস্তে এক প্রকার মুদ্রা-যন্ত্র থাকে। চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিয়া, ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার জন্য এই যন্ত্রের আবর্ত্তনের সহিত ইঁহারা অস্পষ্ট স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন। গৈরিক বা রক্তবস্ত্র-পরিহিত মুণ্ডিতকেশ লামা যেখানেই দেখিয়াছি, হাতে এই মুদ্রাযন্ত্রের সহিত মুখে অস্পষ্টস্বরে মন্ত্র উচ্চারিত হইলেও, লাল-পানির প্রভাবে ইঁহাদের লাল অলস চক্ষুর ঢল ঢল চাহনিটুকু বিলক্ষণ হিংসাযুক্ত। শিকার অন্বেষণে ইঁহারা বিশেষ পটু। এক কথায়, তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডাদিগেরই মত। শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে এ রাজ্যে লামারাই প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছেন।

এক সময়ে যেখানকার আকাশ-বাতাস অহিংসার বীজমন্ত্রে প্রতি-ধ্বনিত হইয়াছিল, নিদর্শনস্বরূপ আজও যেখানে গোম্বা বা মঠগুলি সেই অতীতের চির-পুরাতন ধর্ম্মযুগেরই সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া আসিতেছে, এক্ষণে সেই সকল প্রদেশ তৎপরিবর্ত্তে কেবল হিংসামূলক ছাগ-মেষরক্তেই বিলক্ষণ রঞ্জিত! অপেয়পান, দস্যুবৃত্তি, লুঠতরাজ প্রভৃতি হিংস্র উপায়ে জনসাধারণ সেখানে বিশেষরূপে অভ্যস্ত। অশ্বপৃষ্ঠে বন্দুক-স্কন্ধে দস্যুর মত ইহারা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রয়োজন বুঝিলে যাত্রীদের পৃষ্ঠে সহজেই ছোরা বসাইতে ইহারা অণুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।

তাকলাকোট হইতে এইবার আগের পথে যাত্রার জন্য আবার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে লাগিল। এবারকার যাত্রায় কৈলাসদর্শন ঘটিবে জানিতে পারিয়া, সকলেই নবীন উৎসাহে যাত্রার দিন গণিতে লাগিলেন। আমাদের কৈলাস-দূত রঞ্জন ও অনুভবানন্দজী এজন্য খুবই ব্যস্ত। মণ্ডির মধ্যে গিয়া কিরূপে ঝব্বু ও ঘোড়া প্রভৃতি সত্বর পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ 'তদ্‌বির' করিতেছিলেন। ২রা শ্রাবণ, ইং ১৮ই জুলাই, বৃহস্পতিবার প্রভাতে এখান হইতে যাত্রার দিন স্থির হইল।

মধ্যে একটি দিন কেবল বসিয়া না থাকিয়া এই অবসরে সকলেই "খোজরনাথ" দর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কৈলাসযাত্রীদের ইহাও একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এখান হইতে খোজরনাথ প্রায় দশ এগারো মাইল পথ হইবে। এ পথ কৈলাসের দিকে নহে, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে এতটা পথ পদব্রজে গিয়া আবার সেই দিনেই ফিরিয়া আসা অসম্ভব, তাই সেখানে যাইতে হইলে ঘোড়ার আবশ্যক ; কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে এত গুলি যাত্রীর প্রত্যেকেরই ঘোড়ার ব্যবস্থা করা সহজ-সাধ্য নহে। কারণ, এ সকল পার্ব্বত্য-প্রদেশে ঝব্ব্ বা ঘোড়া কেহই মালিকদের কাছে থাকে না, পাহাড়ে পাহাড়ে সর্ব্বদাই চরিয়া বেড়ায়। ভাড়া করিবার আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব হইতে মালিকগণকে না জানাইলে পাহাড় হইতে ইহাদিগকে খুঁজিয়া আনিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে। যাহা হউক্, রঞ্জনের চেষ্টায় পরদিন অতি্কষ্টে নয়টি মাত্র ঘোড়া সংগ্রহ হইল।

বেলা সাড়ে আটটা আন্দাজ সময়ে উত্তরপাড়ার দল, ডাক্তারদলের দুই-জন, আমি, শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ এবং দুইজন নারী-যাত্রী সকলে মিলিয়া নয়জনে নয়টি ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইলাম। স্বামীজীর দল বা অপরাপর যাত্রী ঘোড়া অভাবে সে দিন বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন। নারী-সওয়ারের ঘোড়া দুইটি ধরিয়া লইয়া যাইতে দুইজন তিব্বতী (ঘোড়াওয়ালা) সঙ্গে চলিল। এই ঘোড়াওয়ালাদের মধ্যে একজন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দী ভাষায় কথা কহিতে জানিত। রঞ্জনের পরিবর্ত্তে সেদিন এই লোকটিই পথ দেখাইয়া সঙ্গে চলিল।

মণ্ডি অতিক্রম করিয়া কিছু দূর যাইতেই প্রথমে একটু উত্‌রাই নামিয়া আসা হইল। কর্ণালী নদী পার হইবার জন্য এখানে একটা কাঠের পুল থাকায় সকলেই আপন আপন ঘোড়া হইতে নামিয়া এই পুল দিয়া পারে আসিলেন। পাড়ের উপরে এখানেও ভেড়ার লোমের ক্রয়-

বিক্রয় খুব চলিতেছিল। দুই চারিটি ব্যবসাদারের তাঁবু এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের হুড়াহুড়ির মধ্যে তাহাদের উৎসুক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া আমরা কর্ণালী নদীকে এইবার দক্ষিণে রাখিলাম। তারপর ক্রমশঃই প্রশস্ত ও সমতল রাস্তার উপরে আসিয়া পড়ায় ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া সকলেই সহজ মনে করিলেন।

গল্প করিতে করিতে পরস্পর তিন চারি মাইল অতিক্রম করিয়া আসা হইল। রাস্তার দুই ধারেই শুধু বিস্তীর্ণ শস্যভূমি। ঘন-সন্নিবিষ্ট কড়াই-শুঁটি, গম, সরিষা প্রভৃতি গাছগুলিতে তখন সবেমাত্র ফুল বা শীষ ধরিয়াছে। আশে-পাশে ঝরণা হইতে সেই সকল ক্ষেত্রভূমিতে জল-সেচনের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটি গ্রামও দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ক্বচিৎ দুই একটি নাতি-বৃহৎ পাহাড়ী বৃক্ষ "সবে-ধন নীলমণির" মত একা দাঁড়াইয়া আপনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে রাস্তার মাঝখানে গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড স্তূপীকৃত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশ প্রস্তরখণ্ডের গায়ে "ওঁ মণিপদ্মে হুং" মন্ত্রটি লেখা রহিয়াছে। ভাষা অন্যরূপ হইলেও একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে গ্রাম ও শস্য-ক্ষেত্র ছাড়িয়া আসিয়া কখনও ঝরণা, কখনও বা লম্বা ময়দান দেখিতে পাওয়া গেল। এই সকল পথ একবারেই লোকালয়হীন। দিনের বেলা চলিতেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ক্বচিৎ দুই একটি মেষপালককে কেবলমাত্র মেষ তাড়াইয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। এই ভাবে ছয় সাত মাইল পথ অগ্রসর হইয়া আমরা সকলেই খোজরনাথের মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলাম।

মন্দিরের পূজারী একজন দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, মুণ্ডিতকেশ লামা. ইঁহার মুখখানি গোল, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, তবে চক্ষু দুইটি ঈষৎ

রক্তাভ। এতগুলি নূতন যাত্রী দেখিয়া তীর্থ-ক্ষেত্রের পাণ্ডার মত ইনি প্রথমেই দরজা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন, হস্ত প্রসারণ করিয়া কিছু দিবার ইঙ্গিত করিতেও ভুলিলেন না। আমরা নয়জনে নয়টি 'তঙ্কা' তাঁহার হাতে ভরিয়া দিলেও অনিচ্ছায় (যেন একবারে সন্তুষ্ট নহেন!) এবার তিনি দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। মন্দিরমধ্যে সম্মুখেই একটু নাট-মন্দিরের মত অল্প-প্রশস্ত অঙ্গন। তাহাতে লামাদিগের বসিবার জন্য উচ্চাসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। পার্শ্বে দেয়ালের গায়ে কাষ্ঠনির্ম্মিত আলনার থাকে থাকে পুঁথির আকারে পালিভাষায় লিখিত অনেকগুলি পুস্তক সাজান ছিল। শুনিলাম, ধর্ম্ম-পুস্তকের ইহা একটি লাইব্রেরীবিশেষ। অঙ্গন হইতে একটু ভিতর-দিকে বেদীর উপরে সম্মুখেই তিনটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি শোভা পাইতেছিল। অন্ধকারে মূর্ত্তিগুলি প্রথমতঃ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল না। সুখের বিষয়, শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের হস্তে একটি বৃহৎ টর্চ্চলাইট্ ছিল। তাহা জ্বলিয়া উঠিতেই সকলেরই দৃষ্টি একসঙ্গে মূর্ত্তির প্রতি ধাবিত হইল। দেখিলাম, মূর্ত্তিগুলি অতি উৎকৃষ্ট ধাতুনির্ম্মিত। আকারে বিশাল (প্রায় সাড়ে চারি হাত) হইলেও শোভনীয়। মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি, এবং তাঁহার দক্ষিণে বামে আকার-অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবধানে লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রতিমা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে বিরাজিতা। গায়ে স্বর্ণাভা ও প্রত্যেক মূর্ত্তিরই মস্তকে অলঙ্কারশোভিত মুকুট। মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া ইহাই মনে হইল—বিংশ-শতাব্দীর শিল্প, ধাতু, অলঙ্কার সবই যেন সে যুগের শিল্প, ধাতু, অলঙ্কার প্রভৃতির নিকট একবারে পরাস্ত। রূপের ছটায় প্রতিমাত্রয় যেন আপন আপন দেবরূপ ধরিয়াই সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছেন! বহুস্থানের দেবমূর্ত্তি চোখে পড়িয়াছে, এরূপ উৎকৃষ্ট ধাতুনির্ম্মিত বিগ্রহ কখনও দেখিয়াছি বলিয়া আমাদের মনে হইল না। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই হয় ত মূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। তিনটি শতদল

পদ্মের উপরে বিরাজিত এই মূর্ত্তিত্রয়ের নিম্নে "শ্রীহরির অনন্ত-শয্যা" ও পাশে মহাকাল এবং তারার মূর্ত্তি প্রভৃতিও দেখা গেল। এক সময়ে তিব্বত-প্রদেশে সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই পূর্ণ বিকাশ ছিল। কালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সে ধর্ম্মের রূপান্তরে বুদ্ধমূর্ত্তিরই প্রসার বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে। খোজরনাথের মন্দিরের এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন কোন লেখক অন্যরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি নাই।

এখানে ধূপ-দীপ জ্বালিয়াই সাধারণতঃ পূজা, আরতি, বন্দনা প্রভৃতি করা হয়। লামা মহাশয় যাত্রিগণের নিকট হইতে বাতি দিবার জন্য কিছু কিছু দক্ষিণা আদায় করিয়া লইলেন।

টর্চ্চলাইট্ ধরিয়া আমরা যতক্ষণ মূর্ত্তিগুলি দেখিতে নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলাম, পূজারী মহাশয়ের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ততক্ষণ কেবল এই বৈদ্যুতিক আলোর উপরেই ন্যস্ত ছিল। মূর্ত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার নিকট কোন উত্তর পাওয়া গেল না। বিশেষতঃ আকার-ইঙ্গিত ব্যতীত তাঁহার ভাষা বুঝিবার আমাদের কাহারও সামর্থ্য ছিল না। হতভম্বের মত তিনি আলোকের বিদ্যুৎগতিই নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অবশেষে টর্চ্চলাইট্‌টি হস্ত প্রসারণ করিয়া চাহিয়া লইলেন এবং দুই একবার ইহার কল টিপিবার স্থানটি কোথায়, পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, মন্দিরের অপর দিক্-গুলি দেখাইতে আমাদিগকে লইয়া চলিলেন। এইরূপে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা মন্দিরসংলগ্ন অন্ধকার গলি ও সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া আবার অন্য ঘরে প্রবেশ করিলাম। কেবল বড় বড় বুদ্ধদেবের প্রস্তর-মূর্ত্তি ব্যতীত সেখানে অন্য কিছুই দেখিবার ছিল না। লামা মহাশয় প্রত্যেক মূর্ত্তি পিছু তঙ্কা লইবার মতলব আঁটিয়াছিলেন, তাই মন্দিরের আশে পাশে প্রত্যেক অন্ধকার গৃহেই যাত্রিগণকে লইয়া যাইতে ব্যস্ত;

যাত্রিগণ কিন্তু এ অন্ধকারে আর থাকিতে চাহিলেন না ; আলোকের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আকার-ইঙ্গিতে অসম্মতি জানাইয়া বহু কষ্টে আমরা মন্দিরের বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম। লামার সুদৃঢ় করতলগত টর্চ্চলাইট্‌টি ফিরাইয়া লইতে শ্রীমান্ সেদিন যথেষ্ট বেগ পাইয়াছিল।

মন্দিরের আশে-পাশে পাঁচ সাত ঘর লোকের বসবাস দেখা গেল। তন্মধ্যে ভিখারীর সংখ্যাই প্রবল। প্রভাতে যাত্রাকালে সকলেই আখরোট, মিছরী, কিসমিস প্রভৃতি কিছু কিছু শুষ্ক খাদ্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন। নদীর ধারে গিয়া তাহা লইয়া কিছু কিছু জলযোগ শেষ করা হইল এবং কতক বা ভিখারীর কাকুতি-পূর্ণ প্রার্থনায় হাতে তুলিয়া দিয়া সকলেই আপন আপন ঘোড়ায় উঠিয়া বসিলেন।

দেব-দর্শন করিয়া বাহিরে আসিতে প্রায় আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার মধ্যেই আবার এগারো মাইল পথ ফিরিবার কথা। অন্ধকারে নির্জ্জন পার্ব্বত্য-পথে আমাদের মত অনভ্যস্ত ঘোড়-সওয়ার (তায় নারী-যাত্রী সঙ্গে রহিয়াছে) পদে পদে বিপদ্-ভোগের আশঙ্কাই করিয়া থাকে, তাই উদ্বিগ্ন-চিত্তে সকলেই ঘোড়া হাঁকাইয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিতেছিলাম। একটা চলিত-কথা সে সময়ে মনে হইতেছিল—"যেখানেতে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।" কথাটা মিথ্যা নহে। আমরা এই নির্জ্জন পথে তিন চারি মাইল অতিক্রম করিবার পর সম্মুখে দুইজন তিব্বতী ঘোড়-সওয়ারকে আগে আগে যাইতে দেখিতে পাইলাম। তাহাদিগকে প্রথমে সাধারণ যাত্রী বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে উহাদের প্রতি সকলেরই নজর ছিল। হঠাৎ দেখা গেল, সওয়ার অবস্থায় উহারা পরস্পর পরস্পরের গলদেশে বাহুবেষ্টন করিয়াই আগে চলিয়াছে এবং উহারা যে মাতাল অবস্থায় যাইতেছে, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের পকেটে 'রিভল্ভার' (Revolver) ছিল। ভয়ের কারণ না থাকিলেও, এখনও অনেকটা পথ যাইতে হইবে মনে করিয়া আমরা উহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আগে যাইবার মতলব আঁটিতেছিলাম। মাতাল দুইটির কাছাকাছি উপস্থিত হইলে আমরাও তাহাদের লক্ষ্যের বিষয় হইলাম। নয়জন যাত্রী প্রত্যেকেই একটু একটু তফাৎভাবে চলিয়া আসিতেছি এবং আমার ঘোড়াই সর্ব্বাগ্রে রহিয়াছে। এমত অবস্থায় যখন একটু প্রশস্ত রাস্তা চোখে পড়িল, পাশ কাটাইবার সুবিধা মনে করিয়া আমিই ইহাদের আগে যাইবার প্রথম চেষ্টা করিতে, উহাদের মধ্যে একজন আমার দিকে বেশ একটু রুক্ষ ও 'কট-মট' ভাবে চাহিয়া 'কিচিমিচি' ভাষায় বোধ হয় গালিই দিল এবং আমার ঘোড়ার পাশাপাশি তাহার ঘোড়াকে সমানভাবে লইয়া চলিল। আমি একটু দ্রুতই চলিলাম, কিন্তু সম্মুখে একটা নালার মত ঢালু সঙ্কীর্ণ রাস্তায় আসিয়া পড়ায়, ঘোড়ার রাশ (আনাড়ী আমি!) সংযত করিয়া লইলাম। এ ব্যাপারে পশ্চাৎ হইতে আর আর যাত্রিগণ বোধ হয় রঙ্গই দেখিতেছিলেন। দেখিলাম, মাতাল দুইটির বয়স নিতান্ত কম নহে, প্রৌঢ়াবস্থা। লালপানির প্রভাবে প্রত্যেকেরই চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ এবং প্রতি মিনিটেই তাহারা ঘোড়ার উপরে ঢলিয়া পড়িতেছিল। ঘোড়া দুইটি বিলক্ষণ মজবুত হইলেও এ অবস্থায় তাহাদের ঘোড়া হইতে পড়িবার আশঙ্কা আদৌ দেখা গেল না (পড়িলে নিশ্চিন্ত হইতাম)। আমি ঘোড়ার রাশ সংযত করিলে, সুখের বিষয়, মাতালটি কিন্তু নেশার ঘোরে রাশ আল্গা রাখিয়াই নালার রাস্তা পার হইয়া গেল।

ততক্ষণে আমাদের আর আর যাত্রিগণ সকলেই আমার নিকটে পৌঁছিলেন। খানিক দূরে গিয়া আবার সেই মাতাল দুইটির কাছে

পড়িলাম। সকলে কাছে থাকায়, আমার সাহস এবারে কিছু বেশী ছিল এবং মনে মনে ভয় ছাড়া একটু ক্রোধও হইয়াছিল। তিব্বতী 'গাইড্' মহাশয়কে সম্মুখে দিয়া এইবার আবার মাতাল দুইটির পাশ কাটাইবার সময়ে, পূর্ব্বোক্ত মাতালটির সহিত গাইডের কি একটা কথা-বার্ত্তা হইল। পরক্ষণেই (আমাদিগকে পাশ কাটাইয়া আগে লইয়া যাওয়া দূরের কথা) গাইড্ মহাশয় দেখি, নিজেই মাতালটির পশ্চাদ্ভাগে একই ঘোড়ার উপরে চড়িতে গেল। ঘোড়া কিন্তু "ডবল-সওয়ার" আদৌ পছন্দ না করিয়া খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাইড্ মহাশয় নীচে পড়িয়া বেশ আছাড় খাইল। ব্যাপার দেখিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলাম এবং মনে মনে সন্তুষ্টও হইলাম যে, আমাদের গাইড্ আমাদের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, স্বজাতি-মাতালের কথায় কি জন্য তাহার ঘোড়ায় একসঙ্গে উঠিতে গেল! ঠিক সেই অবসরে আমি কিন্তু বুদ্ধিমানের মত সেই মাতালটির লাফাইয়া-উঠা ঘোড়াটিকে পশ্চাৎ হইতে সজোরে একটিবার চাবুক কসাইয়া দিলাম।

চাবুক খাইয়া তিব্বতী-ঘোড়া মাতাল-মালিককে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। দেখা-দেখি সঙ্গী মহাশয়ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘোড়া ছুটাইলেন। এইরূপে সে যাত্রায় আমরা সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তারপর প্রায় মাইল খানেক পথ অগ্রসর হইয়া এই মাতাল দুইটিকে একটি ঝরণার ধারে শুইয়া থাকিতে দেখিলাম। সে সময়ে ঘোড়া দুইটি ছাড়া ছিল। আমরা এই ঝরণাটি পার হইবার সময়ে বলা বাহুল্য, সকলেই দ্রুত চলিয়া আসিয়াছিলাম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার সেই গ্রাম ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের কাছে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম, নির্জ্জনতার ভয় তখন দূরে চলিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে তাকলাকোটে আবার ফিরিয়া আসিলাম। তাঁবুতে আসিয়া

রঞ্জনের কথামত খোজরনাথ যাতায়াত-দরুণ ঘোড়ার ভাড়া প্রত্যেকটির একটাকা হিসাবে এবং দুইজন ঘোড়াওয়ালার মজুরী প্রত্যেকটির নয় আনা হিসাবে চুক্তি করিয়া দেওয়া হইল।

সেই দিন হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, রঞ্জন ভিন্ন অজানা গাইড্ লইয়া আর কখনও কোথাও যাইব না।

খাদ্যের মধ্যে তাকলাকোটে দুগ্ধ পাওয়ার সুবিধা ছিল। আমাদের তাঁবুর কাছে আসিয়া তিব্বতী-রমণীরা প্রত্যহই দুগ্ধের পরিবর্ত্তে তঙ্কা লইয়া যাইতে ছাড়িত না। তবে প্রধান অভাব কাষ্ঠের। এ অভাব পূর্ব্বেও বরাবর দৃষ্ট হইয়াছে। গার্ব্বিয়াংএর নিকট হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া না আনিলে ইহার জন্য আমাদিগকে যথেষ্ট দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত। ক্ষেতে আশে-পাশে মটরশুঁটির গাছ। তাহাতে শুঁটি না ধরিলেও অভাবে অন্ততঃ কিছু শাক যাহাতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য রঞ্জনের দ্বারা চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অকৃতকার্য্য হইলাম। সে বলে, ক্ষেতের মালিক এখানকার লামাগণ, কৃষকেরা নহে। হায় রে, বাঙ্গালী! বাঙ্গালা ছাড়িয়া আজ রুচি-পরিবর্ত্তনের জন্য শাকের কাঙ্গাল!

এতগুলি যাত্রীর মধ্যে কেবল আমাদের ভাণ্ডারে তখনও কিছু কিছু আলু মজুত ছিল। আর আর দলে আলু অভাবে তরকারীর জন্য মুস্কিল হইয়া পড়িল। বিশেষ, নিরামিষাশী পাবনার রায় মহাশয়ের বা উত্তর-পাড়ার গঙ্গাধর ঘোষের কষ্টের অবধি ছিল না। রায় মহাশয়ের একবার-মাত্র আহার লুচি, তাহার তরকারী হইল শুধু 'সৈন্ধব'! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার সহিষ্ণুতা অসীম, এই আহারেই তিনি পদব্রজে কৈলাস পর্য্যটন করিয়া সুস্থ-শরীরে বাটী ফিরিয়াছেন। স্বামীজী এবং ডাক্তারদের মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই মাংসাশী, তাঁহাদের এ পথে অরুচির কোন কারণই উপস্থিত হয় নাই। সর্ব্বত্রই সুবিধা মূল্যে প্রিয় খাদ্য সংগ্রহ

করিয়াছেন। বিশেষতঃ এ বিষয়ে তাঁহাদের আল্‌মোড়ার পাচক 'পান সিং' একবারে সিদ্ধ-হস্ত ছিল। যাহা হউক্, রঞ্জনের পরিচিত কোন ব্যবসাদার অনেক কষ্টে এক দিন কিছু শুষ্ক মটর (কালো রংএর) সংগ্রহ করায় সকল দলেই কিছু কিছু বিভাগ করিয়া লওয়া হইল। দুই চারি-দিন তৈল-সংযোগে 'ঘুঘ্‌নীর' মত করিয়া যাত্রিগণ এখানে রুচি পরিবর্ত্তন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পর্ব্ব

তাকলাকোট হইতে মানস-সরোবর

২রা শ্রাবণ প্রভাতে নয়টার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া সকলেই যাত্রা করিলাম। এখান হইতে কৈলাস মাত্র চারিদিনের পথ। পুরাণ আলোচনা করিলে জানা যায়, কৈলাস যাইবার পথপ্রসঙ্গে "নন্দীপুরাণে" উক্ত হইয়াছে, কেদার হইতে কিছুদূর যাওয়ার পরে তিনটি রাস্তা আছে; একটি বিষ্ণুপুর (বদরিকা), একটি ব্রহ্মপুর ও অপরটি কৈলাস।

"একং বিষ্ণুপুরং যাতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মবেশ্মনি।
কৈলাসমার্গং তৃতীয়ং ত্রিধা মার্গস্থ লক্ষণম্॥"

কেদারকল্পে, ৫।৬৪ শ্লোক।

সে পথ বিপদ্-সঙ্কুল বলিয়া আজকালকার যুগে যাত্রীরা অধিকাংশই (যদিও কেহ কেহ গিয়া থাকেন) সে পথ দিয়া কৈলাস যাইতে সাহস করেন না। তখনকার কালে শুধু পথ কেন, যাত্রার সময়ও পৃথক্ ছিল।

"আশ্বিনে মাসে সংপ্রাপ্তে গন্তব্যং শঙ্করালয়ম্।" ৫।১০

যাহা হউক্, তখনকার কৈলাসযাত্রী আর কলিযুগের কৈলাস-যাত্রীতে প্রভেদ কত, তাহার বিচার করিতে গেলে কৈলাসযাত্রার যে পথই নির্দ্দিষ্ট থাকুক না কেন, উভয় কালেই এ তীর্থদর্শন যে আদৌ সহজসাধ্য ছিল না, তাহা উক্ত গ্রন্থ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

"বিনা রুদ্রপ্রসাদেন ন লভন্তে মহাপথম্।" ১।১৮

যাত্রাপ্রসঙ্গে এ কথার উল্লেখ করিতে পুরাণও বিস্মৃত হয় নাই। বরং আমরা এই তাকলাকোট হইয়া কৈলাসযাত্রার পথকে সে যুগের পথ অপেক্ষা সহজসাধ্য বলিয়াই মনে করিব।

এখান হইতে আমাদের যাত্রার বাহন হইল ঘোড়া ও ঝব্ব। চারিটি ঘোড়া ও আঠারোটি ঝব্ব আমাদের বোঝা ও সওয়ার জন্য লওয়া হইয়াছিল। যাত্রী ছিলাম সর্ব্বসমেত তেইশ জন। তন্মধ্যে কতক পদব্রজে গিয়াছিলেন। সাত জন ঝব্ব ওয়ালা ও একজন গাইড্ (রঞ্জন) সঙ্গে অতিরিক্ত ছিল। দুইটি আগ্নেয়াস্ত্র (একটি রিভল্ভার, অপরটি বন্দুক) থাকিলেও রঞ্জন তাহার পরিচিত ব্যবসাদারের নিকট হইতে আর একটি গাদা বন্দুক সংগ্রহ করিয়া লইল। এইরূপে কতক পদব্রজে, কতক ঝব্ব্ তে, কতক বা ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া মিলিটারী সৈন্যদের ন্যায় আমরা যখন তাকলাকোট হইতে অগ্রসর হইলাম, তখন এই নবাগত যাত্রীদের প্রতি সেখানকার আশে-পাশের প্রায় প্রত্যেক তিব্বতীই অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিয়াছিল। এই তাকলাকোট হইতে যাত্রা এবং পুনরায় তাকলাকোট পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিবার জন্য ঝব্ব্ বা ঘোড়া প্রত্যেকটির ভাড়া বারো টাকা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছিল। মানস-দর্শন ও কৈলাস পরিক্রমা করিয়া তাকলাকোটে ফিরিয়া আসিতে সাধারণতঃ দশ বারো দিন লাগিয়া থাকে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রথমে আমি সকলের আগ্রহে ভীতচিত্তে একবার ঝব্ব তেই উঠিয়া বসি। সে অপরূপ জীব আমার 'ধুক্-ধুক্' অবস্থা বোধ হয় (বুদ্ধিমানের মত!) বুঝিয়া লইয়াছিল, তাই বসিবামাত্র সে এমন একটা দৌড় মারিল যে, উচ্চ পাড়ের (যেখানে আমাদের তাঁবু ছিল) কিনারায় লইয়া উপস্থিত হইল। পাছে আমাকে নীচে ফেলিয়া দেয়, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়া সকলের কথামত তাহার নাকের দড়িটি সে সময়ে ঘন ঘন আকর্ষণ করিতেছিলাম। ঝব্ব্ কিন্তু কিছুতেই বাগ মানিতেছিল না। ঝব্ব্ওয়ালা কোনরূপে তাহাকে ধরিয়া ফেলায়, সে যাত্রায় নিস্তার পাইলাম। ভাড়া গণিয়া হাঁটিয়াই আগে চলিব মনস্থ করায়,



রন্ধনকার্য্যরত তিব্বতী



তিব্বতী ধর্ম্মস্তূপ

স্বামীজী চারিটি ঘোড়ার মধ্যে অনুগ্রহপূর্ব্বক একটি ঘোড়া আমাকে দিয়া কৃতার্থ করিলেন। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ, দুই জন নারী-যাত্রী ও আমি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলাম। ভূপ সিং, উত্তরপাড়া-দলের দুইজন ও ডাক্তারদলের কেহ কেহ ঝব্বুর উপরেই সওয়ার হইয়া চলিতেছিলেন।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, আমাদের কৈলাস-যাত্রায় "জুম্পান পুসো"র (Governor) অনুমতি লইবার কোন আবশ্যক দেখি নাই। কর্ত্তৃপক্ষ বোধ হয় বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তীর্থযাত্রা ব্যতীত আমাদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল না।

বোঝা লইয়া ঝব্বুগণকে কর্ণালী নদীর পুল পার করিতে ঝব্বুওয়ালারা অর্দ্ধঘণ্টাকাল ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতে লাগিল ; কিন্তু বোঝা লইয়া ঝব্বুগণ কিছুতেই পুলের উপর উঠিল না। বোঝা নামাইয়া বহু কষ্টে তাহাদিগকে পারে আনিয়া পুনরায় বোঝা তুলিয়া দেওয়া হইল। এইবার কর্ণালী নদীকে বামে রাখিয়া চলিতে চলিতে প্রথমে কয়েকখানি ছোট ছোট গ্রাম ও তাহার আশে-পাশে যব ও মটরশুঁটির কিছু কিছু ক্ষেত্রভূমি পার হইলাম। পরক্ষণে একবারে প্রশস্ত ময়দানে আসিয়া পড়িলাম। তখনকার দৃশ্য অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। শস্যহীন শুষ্ক মাঠ। মাঠে কেবলই ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রস্তরখণ্ডের অস্থিকঙ্কাল বিছানো রহিয়াছে ; কোথাও স্থানে স্থানে একপ্রকার কণ্টকযুক্ত তৃণ ঝোপের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এই সকল তৃণ অতি কঠিন, হাত দিলেই সূচের মত কণ্টকবিদ্ধ হয়। এ পথে ঝব্বুদিগের ইহাই একমাত্র আহার। মাঝে মাঝে এই সকল ময়দানের উপরে ধস্ভাঙ্গা নগ্ন পাহাড়ের বিস্তৃতি থাকায় উচ্চ পাহাড়ের মত একদিক অপর দিক হইতে বিভক্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে তিব্বতীদের গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত প্রস্তরখণ্ড যাত্রীদের পথ-নির্দ্দেশস্বরূপ সজ্জিত ছিল। চারি-

দিকেই চোখের সম্মুখে জাস্কর অদ্রিমালা (Zadskar Range) শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দাঁড়াইয়া—ঠিক যেন মৌনী সাধকের দল। তাহাদের নগ্ন শিরোদেশে তুষারের বিস্তৃতি উজ্জ্বল বিভূতির মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। এইরূপ বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেলা সাড়ে চারিটা আন্দাজ সময়ে আমরা সাত মাইল দূরে "রুংগাং" নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে গ্রাম বলিতে কিছুই দেখিলাম না, শুধু একটি প্রশস্ত ঝরণা। তাহারই এক পার্শ্বে আমাদের রাত্রিযাপনের স্থান মনোনীত হইল। ভারবাহী ঝব্বুর দল সহ সকলেই একে একে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রিকালে কাষ্ঠের অভাবে ষ্টোভই এখানে আহার্য্য-প্রস্তুতের অবলম্বনস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। যতই অগ্রসর হইতেছি, শীতও উত্তরোত্তর বেশী বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে নয়টার মধ্যেই আহারাদি শেষ করা হইল। ঝব্বুগণ বোঝা ও সওয়ার লইয়া এখানকার প্রশস্ত ঝরণাটি পার হইয়া গেল। এই সকল ঝরণার স্রোত প্রবল, তবে গভীরতা কম। পার হইয়া আবার সেই প্রশস্ত ময়দানই পড়িল। যতদূর দৃষ্টিগোচর হইল, সেই তৃণবিহীন অস্থিকঙ্কালসার দৃশ্যে সে সময়ে ইহাই মনে হইতেছিল, ভোগৈশ্বর্য্যবিহীন কৈলাসপতির চরণ-নিম্নে পৃথিবীদেবীও যেন আপনার সম্পদ-গরিমা সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন।

প্রায় পাঁচ মাইল আন্দাজ আসিয়া "বল্‌ডকে" উপস্থিত হইলাম। সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা পনেরো হাজার ফুট, এখানেও একটি ঝরণা বহিয়া যাইতেছিল। রঞ্জনের কথামত সকলেই তাহা হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিয়া লইলেন। আগে আর ঝরণাদি পাওয়া যাইবে না, সে সময়ে ইহাই তাহার মুখে ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সেখান হইতে আরও দুই মাইল আগে আসিলে আবার একটি ঝরণা যখন সম্মুখে পড়িল,

তখন রঞ্জন সে ঝরণাটি যে একবারেই নূতন উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা জানাইতে একটুও দ্বিধা বোধ করিল না।

আমাদের চোখের সম্মুখে দক্ষিণ ভাগে আবার সেই তুষারশোভী "গুরেলা মান্ধাতা" পাহাড়টি উদ্ভাসিত হইল। এইরূপে আরও চারি মাইল আন্দাজ আগে গিয়া দেখিলাম, সম্মুখে একটি পাহাড়ের চড়াই উঠিয়া গিয়াছে। এই চড়াইয়ের রাস্তা খুবই প্রশস্ত। আমাদের সব কয়টি ঝব্বু ও ঘোড়া একসঙ্গে সমানভাবে যখন এই চড়াই অতিক্রম করিয়া চলিল, সকলেই মনে করিয়াছিলেন, বুঝি বা আগে গিয়া এইবার কিছু নিম্নভূমি দৃষ্টিগোচর হইবে। অনুমান মিথ্যা হইল না। এই চড়াই শেষ হইবার মুখে সম্মুখভাগে একটু বাম কোণে দূর হইতে "রাবণ-হ্রদের" খানিকটা নীল জল প্রথমে চোখে পড়িল।

গার্ব্বিয়াং হইতে এ যাবৎ কেবল নগ্ন পাহাড়ের বিস্তৃতি আর উজ্জ্বল তুষারের শুভ্র দৃষ্টি চোখে লাগিয়া আসিয়াছে, তার পর তিব্বতে আসিয়া এই দৃশ্যের সহিত আবার দারুণ রৌদ্র মিশিয়া আমাদের চক্ষুগুলিকে এক প্রকার নিস্তেজ করিয়াই আনিয়াছিল; এমত অবস্থায় বহু দিন পরে এইরূপ একটা নীল স্বচ্ছ তরল পদার্থ হঠাৎ নয়নপথে পতিত হওয়ায় অস্থিরচিত্তে সকলেই সে সময়ে ইহার তটের সমীপবর্ত্তী হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। দূরে তাহারই ওপারে 'কৈলাসে'র অপূর্ব্ব তুষার-শৃঙ্গ এখান হইতেই রঞ্জন অস্পষ্টভাবে (তাহা তখন কতকটা মেঘে আবৃত ছিল) দেখাইয়া দিল। তৃষিত নেত্রে কিছুক্ষণ সে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সকলেই বেলা চারিটা আন্দাজ সময়ে এই হ্রদের কতকটা সম্মুখীন হইলে ইহার দৃশ্য সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল। সে দৃশ্য কি সুন্দর ও স্নিগ্ধ!

চিত্রকর! তোমার রূপ কখনও চোখে পড়ে নাই। কিন্তু এই চিত্রে

তুমি নিশ্চয়ই আপনার প্রকৃত চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছ। অথবা, প্রকৃতির অনন্ত চিত্র-বৈচিত্র্যের মধ্যে এই চিত্রখানি তুমি আঁকিতে গিয়া নিজেই এতদূর মোহিত হইয়া পড়িয়াছ যে, আপনার অস্তিত্ব একবারে লুকাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছ! নতুবা এ দৃশ্যে তখন আমাদের সকলেরই চক্ষুতে ক্ষণেকের জন্য পলক পড়ে নাই কেন? নীলাকাশ অপেক্ষাও গাঢ় নীল ও স্বচ্ছ অথচ বিলক্ষণ প্রশস্ত এই জলরাশি আঁকিয়া-বাঁকিয়া অনন্তের কোলে কেমন মিশিয়া রহিয়াছে! বায়ুভরে তাহা ঈষৎ তরঙ্গায়িত, যেন উচ্ছল-সৌন্দর্য্যে আপনিই উদ্বেলিত। আবার এই নীলজলের উপরে খর্ব্বাকৃতি দুইটি বিভিন্ন রংএর পাহাড়, দ্বীপের মত উঠিয়া মধ্যভাগে চলিয়া গিয়াছে। কে যেন বিচিত্র বর্ণশোভিত দুইখানি গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছে। একটি পাহাড় কতকটা সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত, অপরটি ব্যাঘ্রচর্ম্মের ন্যায়। নীলকান্তমণিপ্রভ এই হ্রদে এরূপ দুইটি বিচিত্র পর্ব্বতাসন, প্রকৃতির সুরম্য মন্দিরে কে বা কাহার জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছে, তাহা ঐ হ্রদেরই মত সুনির্ম্মল চিত্ত হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিতাম। অভিভূত-চিত্তে ক্ষণেকের জন্য তখন আমার মনে হইয়াছিল, ব্যাঘ্র-চর্ম্মের আসনে বিরাজ করিতে একমাত্র সেই "ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং" গৌরীপতি হর এবং তাঁহারই পাশের সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত আসনে তাঁহারই অঙ্কলক্ষ্মী সিন্দূরবর্ণ-প্রভা গৌরীদেবী ভিন্ন, তাঁহাদের লীলাক্ষেত্র কৈলাসের পাশে এ মধুর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার আর ক্ষমতা কাহার! এই হ্রদকে রঞ্জন হিন্দীভাষায় "রাক্ষস-তাল" বলিয়া বুঝাইয়া দিল। অনুভবানন্দ স্বামীজী বলিলেন, এ সম্বন্ধে প্রবাদ—দুষ্টমতি রাবণ ক্রোধভরে যে সময়ে কৈলাস উত্তোলন করিতে গিয়াছিলেন, তৎকালীন তাঁহার ঘর্ম্মে এই অপরূপ হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বাল্মীকি-রামায়ণে রাবণ বলিতেছেন,



"পুষ্পকস্য গতিশ্ছিন্না যৎকৃতে মম গচ্ছতঃ।
তমিমং শৈলমুন্মূলং করোমি তব গোপতে॥"
(উত্তরকাণ্ড, ষোড়শ সর্গ)।

কুবেরকে জয় করিয়া পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিতে রাবণের এই স্থানে গতি অবরুদ্ধ হইল। সে সময়ে রাবণ সম্মুখে নন্দীশ্বরকে দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি রাবণকে ইহাই বলিয়াছিলেন, "রাবণ, তুমি নিবৃত্ত হও। এই পর্ব্বতে এক্ষণে দেবাদিদেব শঙ্কর ক্রীড়া-রত, এ সময়ে ঐ স্থানে যাইবার কাহারও অধিকার নাই। এ কথায় ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া দশমুখ রাবণ তাঁহার বিংশভূজের দ্বারা সমূল ঐ পর্ব্বত উত্তোলন করিতে গেলেন।

"এবমুক্ত্বা ততো রাম, ভুজান্ বিক্ষিপ্য পর্ব্বতে।
তোলয়ামাস তং শীঘ্রং স শৈলঃ সমকম্পত॥"

এ ব্যাপারে প্রমথগণ ভীত হইয়া পড়েন। পার্ব্বতী দেবীও ভয়ে মহাদেবকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। তার পর মহাদেব স্বীয় পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা পর্ব্বতকে চাপ দিতেই রাবণের পীড়ন উপস্থিত হয়।

"ততো রাম মহাদেবো দেবানাং প্রবরো হরঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন তং শৈলং পীড়য়ামাস লীলয়া।
পীড়িতস্তু ততস্তস্য শৈলস্তম্ভোপমাভুজা॥"

এ সময়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত রাবণের শরীর হইতে ঘর্ম্ম বাহির হওয়া তখনকার যুগে আশ্চর্য্য না হইতে পারে। তবে রামায়ণে আরও কয়েকটি শ্লোক আগে পড়িয়া গেলে দেখা যায়, এ অবস্থায় রাবণ সেখানে সহস্র বৎসরকাল পর্য্যন্ত রোদন করিয়াছিলেন।

"সম্বৎসরসহস্রন্তু রুদতো রক্ষসো গতম্।"

পরে তপস্যায় রত হয়েন।

রাবণ-হ্রদের আয়তন ও স্বচ্ছতা হিসাবে দেখিতে গেলে যদি এই প্রবাদ রামায়ণমতে সত্য বলিয়া মানিতে হয়, তবে আমার মনে হয়, রাবণের ঘর্ম্মে এরূপ নির্ম্মল হ্রদের সৃষ্টি না হইয়া সহস্র বৎসর রোদনের ফলেও হইতে পারে, এরূপ মনে করা আশ্চর্য্য এবং অস্বাভাবিক নহে। অবশ্য রামায়ণে "রাবণ-হ্রদ" সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নাই।

যাহা হউক্, এইরূপ অপরূপ হ্রদের পাশ দিয়া আমরা নীচে নামিয়া তট-উপান্তে তাঁবু খাটাইবার সংকল্প করিলাম। সেখান হইতে তট খুবই কাছে মনে হইল, কিন্তু কিনারায় পৌছিতে ঘোড়া লইয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা-কাল বিলম্ব হইয়াছিল। বেলা সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ সময়ে এই হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে আমরা উপস্থিত হইলাম। বলডক্ হইতে এই হ্রদের দূরত্ব ছয় মাইল আন্দাজ হইবে। এখানে আশে-পাশে কোথাও কোন ঝরণা না থাকায় আহারান্তে এই হ্রদের জলেই ক্ষুৎপিপাসা দূর করা হইল। জল শীতল ও লঘু।

সে দিন শুক্লা ত্রয়োদশী। সন্ধ্যার পর নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখা দিলেন। স্নিগ্ধকিরণে এই স্নিগ্ধ হ্রদের জল মিশিয়া গিয়া "ঝিকিমিকি" খেলা করিতে লাগিল। দেখিবার মত দৃশ্য বটে। এত শীতে তাঁবুর বাহিরে আসিয়া আমরা প্রায় সকলেই রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব শোভা নিস্পন্দ-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছি। চাঁদের আলোয় জলের গায়ে দুই চারিটি চঞ্চল সারস পক্ষী (এদেশেরই মত) উড়িয়া ছোট ছোট মৎস্য শিকার করিয়া বেড়াইতেছিল। এ পাশে গুরেলা মান্ধাতার তুষার-শোভী বিস্তৃত বপু জ্যোৎস্নালোকে শ্বেতবর্ণ ফেনপুঞ্জের মত হ্রদের কোলে ঢলিয়া রহিয়াছে। মান্ধাতার অনন্তকালব্যাপী তপস্যার এখনও যেন শেষ হয় নাই। স্বপ্নপুরীর অমৃত-নির্ঝরের মত আমরা ইহার তটে নীল ধারাকে সে দিন আছাড়িয়া পড়িতে দেখিলাম।



তুষারশোভী গুরেলা মান্ধাতা

উচ্ছ্বাসে যাত্রীদলের মধ্যে কেহ কেহ সমস্বরে সুর তুলিলেন। কেহ কেহ শীতে কাতর হইয়া লম্বা পাড়ের উপরে বালকের মত দৌড়াইয়া লইলেন। তাঁবুর ভিতরে গেলেই এ দৃশ্য যে চিরজীবনের মত অদৃশ্য হইয়া যায়। সকলেরই গায়ে সোয়েটার, মাথায় টুপী ও কম্‌ফর্টর, হাতে দস্তানা, পায়ে ষ্টকিং, জুতা প্রভৃতি আবরণ—এক কথায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা; কেবল চক্ষু দুইটি উদ্‌ভ্রান্তের মত সেই সুরম্য হ্রদের চারিদিক দেখিয়া দেখিয়া যেন আশ মিটাইতে পারিল না। শ্রান্ত হইয়া অবশেষে সকলে তাঁবুর মধ্যে ফিরিতে বাধ্য হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া ঝব্বুওয়ালারা প্রত্যহই ঝব্বুদিগকে চরিয়া খাইবার জন্য আশে-পাশে ছাড়িয়া দিত। পরদিন যাত্রার পূর্ব্বে আবার ধরিয়া আনা হইত। এখানে পৌঁছিয়াও যথারীতি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। শেষ রাত্রিতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। অত্যধিক ঠাণ্ডা হওয়ায় পরদিন প্রত্যূষেই সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

আজ মানস-সরোবর পৌঁছিবার কথা। শুদ্ধ চিত্তে, উপবাসী শরীরে সেখানে পৌঁছিয়া স্নানাদি শেষ করিয়া, তার পর আহারের আয়োজন করা হইবে, পূর্ব্বদিন সকলেই এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। তাই হাত-মুখ ধুইয়া ঝব্বু-পৃষ্ঠে বোঝা তুলিয়া দিতে সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঘটনাচক্রে সে দিন কিন্তু ঝব্বুদিগকে নিকটে কোথায়ও দেখিতে পাওয়া গেল না। ঝব্বুওয়ালারা দুই তিন জন দুই তিন দিকে খুঁজিতে গেল। বেলা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। বোঝা ভিন্ন আমাদের আগে চলিবার উপায় নাই। মানস-সরোবর এখান হইতে মাত্র তিন মাইল পথ। বেলা দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যদি ঝব্বু পাওয়া যায়, তবে একটার মধ্যে সেখানে পৌঁছিয়া যাইব, তাই সকলেই ঝব্বুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে শঙ্কর স্বামীজী প্রভৃতি কয়েক জন রাবণহ্রদে

নামিয়া একদফা স্নান শেষ করিয়া লইলেন। জল যেমন স্বচ্ছ, ইহার তলদেশ তেমনই কর্দ্দমবিহীন। কেবলই নানা বর্ণের পাথরের 'নুড়ি' বিস্তৃত। কতক্ষণে (বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে) দূরবীণ ধরিয়া দেখা গেল, গুরেলা মান্ধাতার কোল দিয়া ঝব্বুর দল নামিয়া আসিতেছে। সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

এবারে রাবণহ্রদকে বামে রাখিয়া তীরে তীরে পূর্ব্বদিকে বরাবর যাইতে লাগিলাম। একটির পর আর একটি চড়াই ছাড়িয়া পর পর প্রায় তিন চারিটি চড়াইয়ের পথ অতিক্রম শেষ হইলে সম্মুখেই মানসের অনন্ত-বিস্তৃত জলরাশি দৃষ্টিগোচর হইল। তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা হইবে। এই উচ্চ চড়াইয়ের কত নীচে যে এই হ্রদের তটদেশ, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। ঘোড়া লইয়া দ্রুত নামিয়া গেলাম। বেলা দেড়টা আন্দাজ সময়ে আমরা হ্রদের তীরে আসিয়া পৌছি।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হু-হু শব্দে বাতাস বহিয়া যাইতেছিল। কোনও ইংরাজ-পরিব্রাজক ভ্রমণ করিতে আসিয়া এ স্থানকে "Play ground of storms" অর্থাৎ ঝড়ের লীলাক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কথাটা খুবই সত্য। ঝড়ের সহিত বারিধি সদৃশ এই সুমহান্ হ্রদের স্বচ্ছ সুনীল জলে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া একটা অনন্তের সুর বহিয়া আনিতেছিল। সে সুরে কেবল মিষ্টতা, শ্রুতি-মধুরতা ব্যতীত সমুদ্রের ন্যায় কঠোর গর্জ্জন নাই। তরঙ্গায়িত হৃদয়ে যেন ভারতের সকল তীর্থ-সম্পদ একত্র করিয়া পাপী-তাপী-যাত্রীদিগকে মৃদুস্বরে ডাকিয়া কহিতেছে, "ওরে সুদূরের যাত্রী! সংসারের ভোগাসক্তি ত্যাগ করিয়া, দুর্গম পথে যদি আমার তট পর্য্যন্ত পৌছিতে সমর্থ হইয়াছিস্, তবে আয়, নেমে আয় একবার আমার এই চির-নির্ম্মল পুণ্য-সলিলে। স্নান করা দূরের কথা, স্পর্শেই দেহ-মন পবিত্র হইয়া উঠিবে। পথশ্রান্ত! শুধু



Kalika Press, Calcutta.

মানস-সরোবর

১২:

পথের শ্রান্তি নহে, রোগ-শোক-তাপ প্রভৃতি মনের যা' কিছু ক্লেদ এক নিমেষে সবই হরণ করিয়া লইব।" কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানসের এই প্রবাহ একভাবে চলিয়া আসিতেছে! এই জলে কত নদ, কত নদীর উৎপত্তি। এই জলের গুণেই সেই সকল নদীর আশপাশ ভূমি পর্য্যন্ত তীর্থক্ষেত্রে পরিণত!

অভিভূত-চিত্তে মানুষ আমরা, সেই শুভ পুণ্যবাসরে (৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩৬) যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কুবের প্রভৃতি যেখানে নিয়ত স্নান করেন, ব্রহ্মার কৃত সেই মানস-হ্রদে সত্যই স্নান করিয়া তীরে উঠিলাম। জল খুবই শীতল। দুই তিনটি 'ডুব' দিতেই শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত চারিদিক দেখিয়া লইলাম। শুধুই পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে তুষারের অপূর্ব্ব বিস্তার। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণে অনন্তকাল ধরিয়া সে তুষার গলিয়া শেষ হয় না। একে একে সে দিন সকলেই স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন। তটদেশে কোথাও গাছের চিহ্নমাত্র নাই, কেবল আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন কোন স্থানে অযত্ন-সম্ভূত কতকগুলি তিলের গাছ জন্মিয়া রহিয়াছে। সে সময়ে তাহাতে যথেষ্ট তিল হইয়াছিল। কবে কোন্ ঋষি সিদ্ধ-সেবিত এই মানসহ্রদে তর্পণ করিতে আসিয়া তটদেশে তিল ছড়াইয়া দিয়াছিলেন—যাহার ফলে এই গাছগুলি এখনও তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। আমরা সেই সদ্যঃ বৃক্ষজাত তিল সংগ্রহ করিয়া পিতৃপুরুষ-উদ্দেশে মানস-জলে তর্পণ করিলাম। তার পর সকলেই কেহ ছাতু, কেহ আখরোট-কিসমিস-মিছরি, কেহ বা ঘৃত, আটা ও চিনি-মিশ্রিত খাদ্য খাইয়াই দিন কাটাইলেন।

পুণ্যভূমি ভারতে তীর্থক্ষেত্রের আদৌ অভাব নাই। সুদূর বদরিকা-কেদারনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রতি তীর্থেই প্রতি বৎসর হাজার

হাজার যাত্রী স্বচ্ছন্দচিত্তে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। কেবল এই হিমালয়-শীর্ষশোভী দুর্গম কৈলাস বা মানসতীর্থ-দর্শন আদৌ সহজ-সাধ্য নহে বলিয়া অন্যান্য তীর্থের তুলনায়, এ তীর্থে যাত্রিসংখ্যা খুবই কম, তাই অধিকাংশ লোকের ইহা কেবলই কল্পনার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত হিসাবে ইহার অস্তিত্ব কোথায় এবং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে কতটুকুই বা ইহার উল্লেখ দেখা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা কেহই আবশ্যক মনে করেন না। প্রথমতঃ বাল্মীকি-রামায়ণে বিশ্বামিত্র ঋষি রামকে বলিয়াছিলেন—

"কৈলাসপর্ব্বতে রাম মনসা নির্ম্মিতং পরম্।
ব্রহ্মণা নরশার্দ্দূল! তেনেদং মানসং সরঃ॥"

বালকাণ্ড—২৪ সর্গ।

অর্থাৎ হে রাম, কৈলাস পর্ব্বতে ব্রহ্মা-দেবের মানস হইতে যে সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই মানস-সরোবর নামে আখ্যাত। মানসের উৎপত্তি সম্বন্ধে রামায়ণে ইহাই বর্ণিত রহিয়াছে। মহাভারত-পাঠে বুঝিতে পারা যায়, বদরিকাশ্রম হইতে দ্রৌপদীর প্রার্থনানুসারে সৌগন্ধিক (স্বর্ণ-বর্ণের বিশেষ সুগন্ধিযুক্ত পদ্ম) আহরণের নিমিত্ত ভীমসেন কুবেরের বাটীর নিকটে যে স্বভাবজাত সরোবরে অবগাহনাদি করিয়াছিলেন, উহাকে এই মানস-সরোবর ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিবার কারণ নাই।

"কৈলাসশিখরাভ্যাসে দদর্শ শুভকাননাম্।
কুবেরভবনাভ্যাসে জাতাং পর্ব্বতনির্ঝরে॥

তত্রামৃতরসং শীতং লঘু কুন্তীসুতঃ শুভম্।
দদর্শ বিমলং তোয়ং পিবংশ্চ বহু পাণ্ডবঃ॥"

বনপর্ব্ব—১৫৩

কুবেরের বাটীর নিকটে যে সরোবর, তাহা যে মানস, তাহা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করিলেও স্পষ্ট বুঝা যায়।

"হংসয়োর্দম্পতী পূর্ব্বং মানসাখ্যে সরোবরে।
স্থিতৌ পরস্পরং প্রেম্না বিহরন্তৌ নিরন্তরম্॥
কুবেরস্তত্র বৈ নিত্যং বিহর্ত্তুং যাতি সাবলঃ।
চিরং বিহৃত্য সংস্নায় বটমূলে সমাশ্রয়ৎ॥"

কেদারমাহাত্ম্য—২৬ অধ্যায়।

অর্থাৎ মানস নামক সরোবরে হংসদম্পতী পরস্পর সুখে ও প্রেমে নিরন্তর বিহার করিত এবং সেখানে কুবের অবলাগণ সহ আসিয়া নিত্য স্নান-বিহারাদি করিয়া বটমূলে আশ্রয় লইতেন।

অবশ্য কালের স্রোতে সে বটগাছ এক্ষণে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে।

মানস-তীর্থ সম্বন্ধে বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ স্পষ্টতঃ দিক্ নির্ণয় পর্য্যন্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

"কৈলাসাদ্দক্ষিণে পার্শ্বে ক্রূরসত্ত্বৌষধং গিরিম্।
বৃত্রকায়াৎ কিলোৎপন্নমঞ্জনং ত্রিককুৎ প্রতি।
সর্ব্বধাতুময়স্তত্র সুমহান্ বৈদ্যুতো গিরিঃ।
তস্য পাদে সরঃ পুণ্যং মানসং সিদ্ধ-সেবিতম্।"

বায়ুপুরাণ—৪৭ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ ১২১ অধ্যায়।

অর্থাৎ এক কথায় এই মানস-সরোবর কৈলাসের দক্ষিণ দেশে বৈদ্যুত-নামক গিরির পাদদেশে অবস্থিত। বাস্তবিক কৈলাস পর্ব্বতের ঠিক দক্ষিণে একটি পর্ব্বত রহিয়াছে, তাহার পাদদেশেই এই মানস এবং তাহারই তটে আজ আমাদের তাঁবু পড়িয়াছে। সুতরাং মানস-সরোবর সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা লইয়া সন্দেহ করিতে যাওয়া প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে। মহাকবি কালিদাসও তাঁহার "মেঘদূত" কাব্যে কুবেরালয়ের নিকটস্থ

কৈলাস ও মানস সরোবরের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য মানসের ওপারে কোথায় কুবেরালয় লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের নাই। সে সৌভাগ্য থাকিলে তাঁহার বর্ণন-সাদৃশ্যের সহিত সব কিছুই দেখিয়া লইতাম! "হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্য" অর্থাৎ স্বর্ণপদ্মের আকর মানস-সলিলে স্বর্ণপদ্ম দেখিতে পাইতাম। আবার কেহ কেহ মানসের নীলজলে নীলপদ্ম অন্বেষণ করিয়া থাকেন; তাহাও তাহা হইলে অপ্রাপ্য থাকিত না। এ ক্ষেত্রে একটি কথা বলা যাইতে পারে যে, কাশী স্বর্ণপুরী হইলেও কয়জনে ইহাকে স্বর্ণের মত উজ্জ্বল দেখিয়া থাকেন? এই মানস-সরোবর ও কৈলাস যে কেবল আমাদেরই প্রাচীন তীর্থ, তাহা নহে, তিব্বতীরাও এ স্থানগুলিকে আবহমানকাল হইতে পরম তীর্থক্ষেত্ররূপে মানিয়া আসিতেছে। মানস-সরোবরকে ইহারা "সো-মা-ভাং" (Tso-ma-vang) বলিয়া থাকে। এই প্রশান্ত হ্রদের চতুর্দ্দিকে তিব্বতী ধর্ম্মগুরু অর্থাৎ লামাদিগের মোট আটটি মঠ (Monastry) আছে। "য়্যাংগু", (Yangoo) "টোগু" (Tugu) "গোস্‌ল্ (Gossul) "জিউ" (Chiu) প্রভৃতি মঠ এই আটটি মঠেরই অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে টোগু মঠে যে প্রস্তর-লিপি (inscription) ক্ষোদিত আছে, তাহার অনুবাদের কতকটা অংশ (সিউয়েন হেডিনের অনুবাদ) এখানে প্রকাশ করিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, তিব্বতীরা এই হ্রদকে তীর্থ হিসাবে কতটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে।

"সোমাভাং (মানস) পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র।

"এই হ্রদের কেন্দ্রস্থলে মনুষ্যের আকৃতিতে ভগবান্ সহস্র লামা-পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

"সমস্ত লামা এক সুরে ইঁহার ভজন গাহিয়া থাকেন।"

"এই হ্রদ হইতে কর্ণালী, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ও শতদ্রু এই চারিটি বড় নদী ও চারিটি ছোট নদী বাহির হইয়াছে।

"বড় নদীর প্রথমটির জল ঈষদুষ্ণ (warm), দ্বিতীয়টি অল্প ঠাণ্ডা (cool), তৃতীয়টি গরম (hot) এবং চতুর্থটি শীতল (cold)।

"যদি কেহ একবারমাত্র এই হ্রদে স্নান করেন, তবে তিনি পিতৃপুরুষগণসহ সমস্ত পাপ ও মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হ'ন।" ইত্যাদি।

এই প্রশান্ত নীলাভ হ্রদের পরিধি কত, তাহা লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে, তবে তিব্বতীরা পাঁচ ছয় দিনে এই হ্রদের পরিক্রমা-কার্য্য শেষ করিয়া থাকে। পরিক্রমার রাস্তা অতিক্রম করা সর্ব্বত্র সুসাধ্য নহে। কোন কোন স্থানে 'রশি' সংযোগেও পার হইতে হয়। এমত অবস্থায় আমাদের অনুমান, ইহার পরিধি ষাট মাইলের বেশী বৈ কম হইবে না।

জগতের মাঝখানে যেখানে সৌন্দর্য্য, সেখানে মধুরতা। সেখানেই সকলের চক্ষু নিরন্তর আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাই লীলাস্বরূপ সেখানেই দেবতাগণের অস্তিত্ব পদে পদে বর্ণিত হইয়া থাকে। এ সৌন্দর্য্যের আকরে শুধু ভারত ও তিব্বত নহে, বিভিন্ন দেশবাসী য়ুরোপীয় পর্য্যটক সিউয়েন্ হেডিন্ মুগ্ধ হইয়া একদিন লিখিয়া গিয়াছেন,—

"I could live and die on this heavenly lake without ever growing weary of the wonderful spectacle always presenting fresh surprises."

নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করিয়া তিনি এই প্রশান্ত হ্রদের চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া মাসাধিককাল ক্যাম্বিস্-নির্ম্মিত নৌকা সহযোগে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, কোথায় শতদ্রু-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থল—

কোথায় তিব্বতী লামাদিগের কত গুম্ফা, কোথায় হ্রদে কত গভীরতা, ইত্যাদি। এই হ্রদ সম্বন্ধে তিনি কতদূর মর্ম্মস্পর্শী ভাবে লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রাণের উক্তি পাঠকবর্গকে এ স্থলে একটু না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

"Wonderful, attractive, enchanting lake! Theme of story and legend, playground of storms and changes of colour, apple of the eye of gods and men, goal of weary, yearning pilgrims, holiest of the holiest of all the lakes of the world, art thou, Tsomavang, lake of all lakes. Navel of old Asia, where four of the most famous rivers of the world, the Brahmaputra, the Indus, the Sutlej, and the Ganges, rise among gigantic peaks, surrounded by a world of mountains, among which is Kailas, the most famous in the world."—

Trans Himalaya, Vol. II. Page 151.

আমরা স্থানান্তরে তাঁহার মানচিত্রের কতকটা অংশ (যাহা লইয়া আমাদের যাত্রার সম্বন্ধ রহিয়াছে) তুলিয়া দেখাইব। তাহাতে যাত্রিগণ মোটামুটি যাত্রার পথ বুঝিয়া লইতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চারিটি বড় নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায় তাহাও দেখিয়া আনন্দলাভ করিবেন।

এই মানস-হ্রদ সমুদ্র-গর্ভ হইতে প্রায় পনেরো হাজার আটানব্বই ফুট উচ্চে অবস্থিত এবং ইহার নিম্নতম গভীরতা প্রায় দুই শত আটষট্টি ফুট হইবে। শীতকালে এই বিশাল হ্রদ প্রায় বিশ ইঞ্চি মোটা বরফে একবারে ঢাকা থাকে। এখন যেমন এই নীল জলে মেঘের'পর মেঘের ছায়া পড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে নূতন রংএ প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিলাম, শীতকালে সে

দৃশ্য কিন্তু মানুষেব চর্ম্মচক্ষুব পরিতৃপ্তিব জন্য সৃষ্ট হয় নাই, ...হা দেব-গণেবই উপভোগ্য।

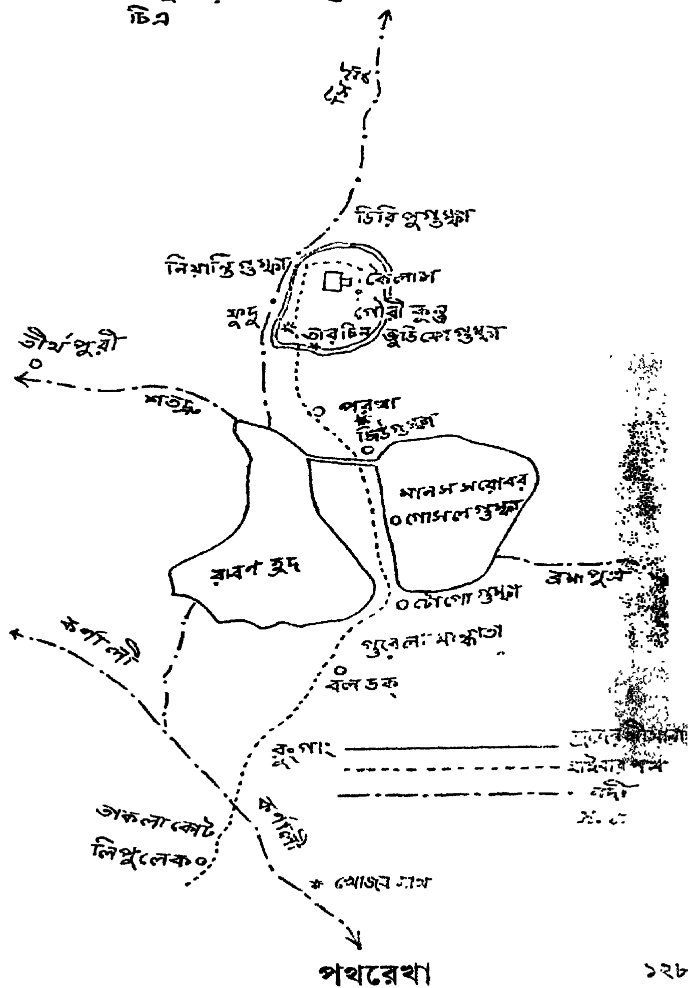
আমবা সকলেই এই নীলদর্পণ সদৃশ স্বচ্ছ হ্রদের তটদেশে ...য়া যথা অন্যমনস্কভাবে চিন্তামগ্ন ছিলাম, হঠাৎ কোথা হইতে তি... ভিন্ন... পুরুষ আমাদেব নিকটে আসিতেই সকলেবই দৃষ্টি সে দি...ক আকৃ... হইল। ইঙ্গিতে তাহাবা তিন জনেই কিছু খাদ্যদ্রব্য ভি...া ...হিল। সন্ধ্যাব অন্ধকাব তখনও নামে নাই। দেখিলাম, তাহাদেব ...কের গায়ে পশমেব 'আল্‌খাল্লা', কটিদেশে ভোজালি এবং পৃষ্ঠদেশে এক... কবিয়া বন্দুক শোভা পাইতেছে। আমাদেব সহযাত্রিণী ...লোকা দয়াপববশ হইয়া এই নূতন ধবণেব ভিখাবীদেব জন্য কিছু ... খাদ্যদ্র... আনিতে তাঁবুমধ্যে যাইতেছিলেন, বঞ্জন (গাইড্) ইঙ্গিতে তাঁহাকে ...ইতে নিষেধ কবিল। ভূতেব উপদ্রব ভূতেই বুঝিয়া লইতে অভ্যস্ত, বিশেষ... মহাদেবেব লীলাক্ষেত্র কৈলাসেব আশে-পাশে নূতন যাত্রী দেখিয়া ... প্রেত-পিশাচেব মত এই সকল জীব মধ্যে মধ্যে ত্যক্ত-বি... কবি... থাকে, এটা কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে। তাই শ্রীমান্ নিতা... সময়ে একটু অধৈর্য্য হইলেন, পকেট হইতে বিভল্‌ভাবটি বাহির ক... অন্যমনস্কভাবে "বাম হাত হ'তে ডান হাতে লয়, ডান হাত ... বামে" কবির এই উক্তির সহিত ইহাব কোন সার্থকতা আছে ... না বুঝিবার জন্য যেন একটু তৎপব হইয়া পড়িলেন। ... অবসব বুঝিয়া বন্দুক হস্তে তাঁবুব বাহিবে আসিয়া দুই চারিবা... তুলিতে ভুলিল না। অবশেষে 'কিচিমিচি'-ভাষায় রঞ্জন ... দিগকে দুই চাবিটি কথা বুঝাইয়া দিতে তাহারা ক্ষুণ্ণমনে সেখান... অদৃশ্য হইল

সে রাত্রিতে সকলেই সজাগ ছিলেন, কাযেই ভুপ সিং বে...

নিদ্রা হয় নাই। প্রহরে প্রহরে দুই-চারিটি করিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিতে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল।

পরদিন প্রত্যুষেই নিদ্রাভঙ্গ হইল। মানসের জল তখন ধীর-স্থির দেখিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে যাত্রিগণ সকলেই আর একবার স্নান করিয়া লইলেন। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ে ইহার জল আলোড়িত হইলে তীরে বসিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করার পক্ষে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তাহা ছাড়া অদ্য যথাসম্ভব শীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া আগে যাইতেও হইবে। তাই সকলেই ব্যস্ত। এ পথ দিয়া ফিরিয়া আসা হইবে না শুনিয়া সকলেই আপন আপন পাত্রে এই পুণ্য তীর্থের জল ভরিয়া লইলেন। এইরূপে আমরা সে দিন প্রায় বেলা দেড়টা আন্দাজ সময়ে পুনরায় যাত্রার পথে বহির্গত হইলাম। এ দিনকার একটি ঘটনা এস্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি, পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ ঘটনাটি অবান্তর বলিয়া মনে করেন, তবে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আজকাল ধর্ম পথযাত্রায় যদি কিছু অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত না হয়, তবে পাঠকের আদৌ মন উঠে না। আমি কিন্তু সে বিষয়ে পাঠকদের মনোরঞ্জন করিবার আদৌ পক্ষপাতী নহি এবং সে সাহস বা সামর্থ্য আমার একেবারেই নাই, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের আস্‌বাব-পত্র ও মায় তাঁবু যখন ঝব্বু-পৃষ্ঠে উঠাইয়া দেওয়া হইল, সে সময়ে আমাদের তাঁবুর সন্নিহিত স্থানে কোন কিছু জিনিষ-পত্র পড়িয়া রহিল কি না, দেখিবার জন্য গিয়া হঠাৎ সেই জমির এক স্থানে একটি উজ্জ্বল সূক্ষ্ম দ্রব্যের উপরে দিদির নজর পড়িল। হাতে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, এ যে তাঁহারই কাণের একটি হীরার 'টাপ' (ফুল)। সাত আট মাস পূর্ব্বে লাভপুরে তাঁহার নিজ বাটীতে এই টাপ হারাইয়া গিয়াছে মনে করিয়া ইহার প্রাপ্তির আশা তিনি একবারেই ছাড়িয়া

ডাঃ সিউয়েন হেডিনের মানচিত্র অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত চিত্র





মানসতীরে তীর্থপথের যাত্রী

দিয়াছিলেন। একটি টাপ হাতে পাইতেই আশপাশ খুঁজিয়া দ্বিতীয়টিও বাহির হইয়া পড়িল। এই হীরার টাপ দুইটির মূল্য বড় কম নহে, প্রায় দুই শত ষাট টাকা হইবে। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, মানস-যাত্রাকালে বাটী হইতে সে একটি এসেন্সের বাক্স সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। গত কল্য সেই বাক্সের মধ্যে এসেন্স রাখিবার সময়ে অতর্কিতে এক টুক্‌রা কাগজের মোড়ক সে পাশে ফেলিয়া দিয়া থাকিবে। যাহা হউক্, এতদিনে এই পুণ্য-হ্রদের তটে আসিয়া এই সূক্ষ্ম মূল্যবান্ বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি, লাভ ভিন্ন আর কি বলিয়া মনে করিতে পারি! আর এক মিনিট পূর্ব্বে আগেকার পথে যাত্রা করিলে এই সূক্ষ্ম পদার্থ চিরদিনের মতই অদৃশ্য হইয়া রহিত। আনন্দের আতিশয্যে সে সময়ে আর একবার মানসের জল স্পর্শ করিয়া সকলেই অগ্রসর হইলেন।

সপ্তম পর্ব্ব

শ্রীকৈলাস

মানসের পশ্চিম তট দিয়া নীচে নীচে আমরা উত্তরদিকে অগ্রসর হইলাম। কিছু দূর গিয়াই এক স্থানে অনেকগুলি অস্থিকঙ্কাল (বোধ হয় ঝব্বুরই) পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া, নিকটেই শ্মশান আছে কি না, রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করায় সে হাসিয়া উত্তর করিল, "বরফ পড়িলেই এখানে জীবজন্তুর পরিণতিতে এইরূপ শ্মশানক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়।" শীতের প্রারম্ভে হয় ত ঝব্বুরা দল বাঁধিয়া একসঙ্গে চরিয়া বেড়াইতেছে। অকস্মাৎ প্রবল তুষারপাতে তাহারা নিশ্চল হইয়া গেল! তখন আর অন্য উপায় থাকে না। প্রায় দুই তিন মাইল আন্দাজ গিয়া বামদিকে তটের উপরেই "গোসল্" গুম্ফা দৃষ্টিগোচর হইল। ইহা হ্রদের জল হইতে প্রায় একশত ত্রিশ ফুট উচ্চে অবস্থিত। উপর হইতে একজন লামা অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাদিগকে এই মঠ পরিদর্শন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার কথায় আমরা তীর ছাড়িয়া কেহই উপরে উঠি নাই।

প্রায় পাঁচ ছয় মাইল আরও আগে গিয়া আমরা এই হ্রদের উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর আসিয়া পৌঁছিলাম। তটদেশে কিছু দূর বিস্তৃত বালুর উপরে কতকগুলি বালি-হাঁস ও বক চরিতে দেখিয়া যাত্রিগণ সকলেই মানস-হ্রদের হাঁস সম্বন্ধে আলোচনা তুলিলেন। কেহ বলিলেন, "প্রবাদ আছে, মানসের হাঁস জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে খাঁটি জিনিষ অর্থাৎ দুগ্ধটুকু পৃথক্ করিয়া লইতে পারে।" তদুত্তরে আর এক যাত্রী উত্তর

করিলেন, "ইহা ত সকল হাঁসই পৃথক্ করিয়া লয়, তবে মানসের হংসের বিশেষত্ব এই যে, আকৃতিতে ইহা রাজহংস অপেক্ষা কিছু বড় হইবে।" এ কথা শুনিয়া আর একজন বলিয়া উঠিলেন, "বড় ত বটেই, অধিকন্তু মানসের হাঁস সাধকবিশেষ অর্থাৎ একবারে নির্লোভ ও জিতেন্দ্রিয়।" এই কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেকেই তখন সেই জলচরদলের মধ্যে আসল হাঁস নিশ্চয়ই মিলিতে পারে মনে করিয়া ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয়, একটিও সেরূপ হাঁস দেখা গেল না! অবশেষে যাত্রিদলের মধ্যে একজন যখন দৃঢ়ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আসল হাঁস এ সময়ে নহে, শীতকালে লোকচক্ষুর অগোচরে এই হ্রদের তটদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়।" তখন সকলেই যেন তাঁহার কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। আমার কিন্তু সে সময়ে "সাহিত্য-দর্পণের" সেই শ্লোকটি কেবল মনে আসিতেছিল—

"জলধরসময়ে মানসং যান্তি হংসাঃ।"

স্বদেশ, জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন, ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া এই তুষার-কিরীটী হিমালয়-পারে আসিবার কালে সকলেরই মনে যথেষ্ট আশা ছিল, মানস-তীরে আসিয়া সাধু-সন্দর্শন অবশ্যই লাভ হইবে। কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি, সাধু-সন্দর্শন দূরের কথা, চর্ম্মচক্ষুতে সাধক-রূপী হংস পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া গেল না। এত বড় অপার হ্রদের কোন্ পারে এ সময়ে তাহারা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা কে বলিয়া দিবে! সিউয়েন্ হেডিন্ "রাবণ-হ্রদ" বেড়াইবার কালে বন্য হাঁসদিগের আড্ডা কোথায় অনুসন্ধান করিতে গিয়া একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন,—"At the north-eastern foot of the elevation is a rather flat pebbly Plateau. Here the wild geese breed in spring and here lay still several thousand eggs in twos, threes

ours in a nest of stones and sand."—Trans Himalaya, Vol. II. 175 page.

রাবণ-হ্রদের উত্তরপূর্ব্বদিকে পাহাড়ের কোন প্রশস্ত যায়গায় এই বন্য হাঁসদিগের আড্ডা আছে বলিয়াই এইখানে মানসের উত্তর-পশ্চিম তটে আমরা এই সকল বন্য হাঁসকে চরিতে দেখিলাম। এই তটই ত রাবণ-হ্রদের উত্তরপূর্ব্বদিকে রহিয়াছে। তিনিও যে আসল হাঁস (যাহা আকৃতিতে বড়) দেখিতে পান নাই, তাহা তাঁহার পুস্তক পাঠে বেশ বুঝা যায়। যাহা হউক্, একটু আগে গিয়া চড়াইয়ের পথে আমরা বিস্তৃত ময়দান পাইলাম। সে পথ দিয়া একটু অগ্রসর হইলে আমাদের বামদিকে সম্মুখভাগে তিনজন বন্দুকধারী তিব্বতী-ঘোড়সওয়ারকে পাশ দিয়া মানসের দিকে ফিরিতে দেখিলাম। আমরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে চলিয়া আসিতেছি, কেবল রঞ্জন আস্‌বাবাদিসহ ঝব্বুর দল লইয়া আমাদের অনেকটা পশ্চাতে পড়িয়াছিল। ক্রমশঃ এই সওয়ার তিনজন ঝব্বুদলের দিকে হঠাৎ গতি ফিরাইয়া পরস্পর সম্মুখীন হওয়ায় আমাদের দলের মধ্যে অনেকেরই সে দিকে দৃষ্টি গেল। যতদূর মনে হইল, সওয়ার তিন জনে ও ঝব্বুওয়ালারা যেন দাঁড়াইয়া কোন কথাবার্ত্তা কহিতেছে। স্বামীজী ও ডাক্তারের দল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঝব্বুর উপরেই ত আমাদের যত কিছু আস্‌বাবাদি, সুতরাং বন্দুকধারী সওয়ার-ত্রয়ের সেখানে দাঁড়াইবার কারণ কি? সংশয়সঙ্কুলচিত্তে যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সাত আট জন একসঙ্গে পশ্চাদ্দিকে দৌড়িয়া গেলেন। ঝব্বুদের প্রায় কাছাকাছি পৌছিলে পর তাহারা ঘোড়ার গতি ফিরাইয়া অন্য দিকে চলিল। রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, তাহারা "আমরা কোথায় যাইতেছি, কোন্ পথ দিয়া ফিরিব ইত্যাদি" সমস্ত বিষয় সন্ধান লইতেছিল। পাঠকবর্গ! শুনিয়া বিস্মিত হইবেন না, মানসের তটে সাধু-দর্শনের যাহা

কিছু উচ্চ আশা বা অভিলাষ ছিল, তাহা আমাদের কপালগুণে দুই দুইবার এই প্রকার সাধুর দলই (?) অযাচিতভাবে পূরণ করিয়া দিয়াছিল! বেলা চারিটা আন্দাজ সময়ে আমরা একটি খালের পার্শ্বে পাড়ের উপরে পৌঁছিলাম। নীচে জল দেখিয়া এইখানেই তাঁবু খাটাইয়া রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করাই স্থির হইল।

এই খালে জল অল্প থাকিলেও মানস ও রাবণ-হ্রদের সহিত ইহা সংযুক্ত রহিয়াছে এবং ইহার গতি রাবণ-হ্রদের দিকেই প্রবাহিত। রঞ্জন এই খালটিকে "শতদ্রু" বলিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিল। ইহার জল রাবণ-হ্রদে মিশিয়া তথা হইতে 'তীর্থপুরী' অভিমুখে গিয়াছে। তিব্বতের মানচিত্র দৃষ্টে জানা যায়, মানসের উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় পনেরো হাজার আটানব্বুই ফুট উচ্চে অবস্থিত, আর রাবণ-হ্রদের উচ্চতা প্রায় পনেরো হাজার ছাপ্পান্ন ফুট। সুতরাং রাবণ-হ্রদ মানস অপেক্ষা প্রায় বিয়াল্লিশ ফুট নীচেই বহিয়া যাইতেছে।

আমরা যেখানে তাঁবু খাটাইলাম, তাহার পূর্ব্বকোণে একটা উচ্চ পর্ব্বত-স্তম্ভের উপরে 'জু' (Chiu) গুম্ফা শোভা পাইতেছিল। এতগুলি নূতন যাত্রী দেখিয়া সেখান হইতে একটি ব্যাঘ্রাকৃতি কুক্কুর গুরুগম্ভীর আওয়াজে আমাদিগকে ঘন ঘন অভ্যর্থনা জানাইয়া দিল। আমরা কিন্তু সময়াভাবে এই গুম্ফা দর্শনে যাইতে পারিলাম না! এই গুম্ফার কিছু দূরে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। যাত্রীর মধ্যে কেহ কেহ সেখানে গিয়া বেড়াইয়া আসিলেন। আমরা আপন আপন জলযোগের আয়োজনেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এ দিন এই খালের জলই আমাদের সকলের তৃষ্ণা দূর করিয়াছিল।

পরদিন অর্থাৎ ৬ই শ্রাবণ, সোমবার প্রভাতে নয়টার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া আবার অগ্রসর হইলাম। রাবণ-হ্রদকে বামে রাখিয়া এই-বার আমরা সম্মুখেই প্রশস্ত ময়দান পাইলাম।

আজ "কৈলাসের" সম্মুখভাগে উপস্থিত হইবার কথা। সকলেই নবীন উৎসাহে কেহ পদব্রজে, কেহ বা ঝব্বু-পৃষ্ঠে মহোল্লাসে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। আমাদের চারিটি ঘোড়াই ময়দান পাইয়া বেশ প্রফুল্লতা বোধ করিল। বৃক্ষলতাহীন এই প্রকাণ্ড উন্মুক্ত প্রান্তরে একটা পক্ষী পর্য্যন্ত উড়িতে দেখিলাম না। চারিদিকেই নিস্তব্ধতা, কেবল আমাদেরই সঙ্গের ভারবাহী ঝব্বুগুলির গলায়-বাঁধা ঘণ্টার এককালীন ঝুণ্-ঝুণ্ শব্দ আরতির ঘণ্টার মত বিশ্ব-প্রকৃতিকে সে দিন কি যেন একটা অন্তরের আরাধনা জানাইয়া দিতেছিল! এই ঝব্বুরা একসঙ্গে দল বাঁধিয়া যাইতে বিশেষ ভালবাসে। ভালবাসার আতিশয্যে তাহারা পরস্পর পরস্পরের গাত্রসংলগ্ন হইয়া এমনই ভাবে চলিয়া থাকে যে, সময়ে সময়ে যাত্রীদিগের পায়ে পায়ে 'ঘেঁস' লাগিবার যথেষ্ট আশঙ্কা হইয়া পড়ে।

বেলা সাড়ে বারোটা আন্দাজ সময়ে আমাদিগকে একটি নদী পার হইতে হইল। সুখের বিষয়, এ নদীতে স্থানে স্থানে জল কম থাকায়, সেখান দিয়া প্রথমে ঝব্বুরা পর পর পার হইয়া গেল। জল দেখিলে ইহারা যেন জলজন্তুর মত জলে নামিতে ব্যস্ত হয়। পৃষ্ঠে যে বড় বড় বোঝা বাঁধা রহিয়াছে, সে দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করে না। ঘোড়া কিন্তু সহজে জলে নামিতে চাহে না। ঝব্বুর উপর যাঁহারা সওয়ার ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও জানু পর্য্যন্ত পদদ্বয় জলে ভিজিয়া গেল। উত্তরপাড়ার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঝব্বুতেই যাইতেছিলেন। তাঁহার ঝব্বটি জল হইতে লম্ফ দিয়া যখনই তীরে উঠিতে গেল, অতর্কিতে তাঁহার দীর্ঘ দেহখানি সে সময়ে পৃষ্ঠচ্যুত হইয়া একবারে তুষার-শীতল জলের মধ্যে আছাড়িয়া পড়িল! এ ব্যাপারে যাত্রিগণ হায় হায় করিয়া উঠিলেন! রঞ্জন তৎক্ষণাৎ জল হইতে তাঁহাকে তুলিয়া লইল। তাঁহার ভিজা কাপড়, জামা ইত্যাদি সমস্ত খুলিয়া দিয়া অপর যাত্রীদিগের গাত্রবস্ত্র হইতে কতক



ঝক্কু-বাহনে

কতক আচ্ছাদন দেওয়াতে তবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে যাত্রায় একটু সুস্থ বোধ করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে আবার সকলেই আগে চলিতে লাগিলাম। প্রায় পাঁচ মাইল দূরে গিয়া "পরখা" নামক ছোট গ্রামটিকে বামদিকে রাখিয়া আবার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই আকাশ বিলক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণকালমধ্যেই গর্জ্জন ও বর্ষণ সুরু হইয়া আমাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

মস্তকোপরি ছাতা ধরিয়া এই উন্মুক্ত প্রান্তর-মাঝে আপন আপন বাহনোপরি কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। দুই পাঁচ মিনিট বৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন উৎপাত সুরু হইল। অজস্রধারে শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল। সে শিলাপাতের উৎপাতে আমাদের ঘোড়া বা ঝব্বুকে স্থির রাখা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষণকাল মধ্যেই সমস্ত ময়দান লক্ষ লক্ষ করকায় ভরিয়া গেল। বৃষ্টির ধারা কতকটা কমিয়া আসিতেই আবার আমরা অগ্রসর হইলাম। এবারে দুই তিনটি নালা পড়িল। নালার আশে-পাশে বহুদূর পর্য্যন্ত রাস্তা বাঙ্গালা দেশের মাঠের মত বিলক্ষণ কর্দ্দমযুক্ত হইয়া পড়ায় ঝব্বু ও ঘোড়াগুলির পাদদেশ প্রায় এক হাত করিয়া মাটীতে বসিয়া যাইতেছিল। অগত্যা আমাদিগকেও পদব্রজে সেই কর্দ্দমাক্ত জমি পার হইতে হইল। বেলা চারিটা আন্দাজ সময়ে "ফুহু" নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আজ প্রায় দশ এগারো মাইল পথ অতিক্রম করা হইল।

আকাশ তখনও মেঘমুক্ত হয় নাই। আমরা যেখানে তাঁবু খাটাইলাম, তাহার আশে-পাশে "লাসা" হইতে আগত অনেকগুলি তিব্বতী ব্যাপারী ব্যবসায়ার্থ আসিয়া কতকগুলি তাঁবু খাটাইয়া রাখিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে অগণিত ভেড়ার দল ও এক একটি ভীষণদর্শন কুকুর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

তাঁবু খাটাইয়া রঞ্জন একবার এই দলের মধ্যে ঘুরিয়া আসিল। ততক্ষণে আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিল। রৌদ্র-কিরণে চারিদিক আবার উদ্ভাসিত হইতেই পূর্ব্বদিকে এই প্রান্তরের শেষ ভাগে 'কৈলাসের' উজ্জ্বল তুষারশৃঙ্গ গোলাকার রজত-শুভ্র স্তূপের মত সম্মুখে দেখিতে পাইলাম।

এই সেই "শ্রীকৈলাস"—যাঁহাকে দর্শন করিবার আশায় এতগুলি যাত্রীর আকুল নয়ন আজ এতদিন ধরিয়া বিহ্বলের মত খুঁজিয়া বেড়াইতেছে! কোথায় সেই জটাজূটধারী, বিভূতিভূষণ যোগিশ্রেষ্ঠের মহিমস্থন্দর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি—যাঁহার পার্শ্বে সমাসীনা সেই কোটি-চন্দ্রপ্রভা নানারত্নালঙ্কারে ভূষিতা দিব্যাঙ্গনা পার্ব্বতী! সিদ্ধসেবিত এই পর্ব্বতেরই শিখরদেশে কোন্ এক লুক্কায়িত রত্ন-শিলা'-পরি তাঁহাদের দিব্যাসন সুসজ্জিত রহিয়াছে, তাহা কে বলিয়া দিবে! যুগযুগান্ত ধরিয়া এই শ্রীকৈলাস হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে নানারূপে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে।

তখন সেখানে তাল-তমাল-বনরাজি-পরিবেষ্টিত, বৃক্ষ-লতা-ফল-ফুলশোভিত সুরম্য উপবন ছিল। আর্ষ্টিসেন মুনির মত অসংখ্য যোগিঋষিদের সাধনাশ্রম নয়নপথে পতিত হইত! সেখানে দেব-গন্ধর্ব্ব-লোকের শত শত ভক্তবৃন্দ নিয়তই হর-হর-ব্যোম রবে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তুতিগানে ব্যোমমণ্ডল মুখরিত রাখিত! আশুতোষের আশু তুষ্টি লাভ করা অসহজ মনে হইত না! আর আজ সেখানে যুগযুগান্তের পরিবর্ত্তনে কি দেখিলাম, সবই প্রস্তরময়, প্রস্তরের অস্থি-কঙ্কালবিশিষ্ট কেবলই নগ্ন মূর্ত্তি উত্তর-দক্ষিণে সুবিস্তৃত রহিয়াছে। মধ্যস্থলে বাণলিঙ্গের মত চির-তুষারসমাচ্ছন্ন একটি উজ্জ্বল রজত-স্তূপ সেই স্থানের চিরন্তন মহিমা আজও প্রকীর্ত্তিত করিতেছে! এই স্তূপের দুই দিকেই পাহাড়শ্রেণীতে একবারে তুষার না থাকায় মধ্যস্থলের এই তুষারের অত্যুচ্চ স্তূপটি দেবলোকের



রঞ্জন (দোভাষী)



লাসার ব্যাপারী

মন্দিরের মত চক্ষুকে সে দিন ঝলসিত করিল। পাঠকবৃন্দ! ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যদি কেহ কোনদিন চর্ম্মচক্ষুতে এ দৃশ্য দেখিবার সুযোগ লাভ করেন, তবে আপনাদের নিকটে আমার এইটুকু নিবেদন, জীবনের দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাত তুচ্ছ করিয়া একবার যেন এই অপরূপ শ্রীকৈলাস দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে কদাচ বিস্মৃত না হ'ন! দিগন্তপ্রসারী এই পর্ব্বতের সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া মনে করিবেন, মানুষ আপনার ভোগবাসনা প্রভৃতি তুচ্ছ প্রবৃত্তিসকল এখানে আসিয়াই যেন একবারে বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। সংসারের সুখ, সাধ, আশা, মায়া সবই যেন নিমেষের জন্য যোগি-শ্রেষ্ঠের ঐ চির-নির্ব্বাণ সমাধি-স্তূপের নিম্নে আপনা হইতেই আছাড়িয়া পড়ে।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে জানা যায়, তখনকার যুগে তীর্থক্ষেত্রের যে স্থানে যেরূপ 'খুঁটি-নাটি' বর্ণনা আছে, যুগযুগান্তের পর সেই ক্ষেত্র আজ অনেক স্থানে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে। কালে হিমালয়ের অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের আশপাশ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান এক দিন সমুদ্রজলে নিমজ্জিত ছিল।

বৈবস্বত মনু বদরিকাশ্রমে তপস্যাকালে "চির্ণী" নদীর জলের এক মৎস্য তাঁহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলে, রাজর্ষির আশ্রয় লাভ করত তাহার আকার ক্রমশঃই এত বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাধ্য হইয়া তিনি মৎস্যকে অবশেষে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে সময়ে কৃতজ্ঞ মৎস্য রাজর্ষিকে জানাইয়াছিল, অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত স্থান সমুদ্রজলে প্লাবিত হইবে, তিনি যেন সে সময়ে নৌকারোহী হইয়া তাহার (এই মৎস্যের) প্রতীক্ষা করেন। যথাসময়ে হিমালয়ের সর্ব্বত্র সমুদ্রজলে প্লাবিত হইলে, মৎস্যের কথামত রাজর্ষিপ্রবর সপ্তর্ষিমণ্ডলকে সঙ্গে লইয়া সৃষ্টিরক্ষার্থ সকল প্রকার বীজ সংগ্রহ করিয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন,—

"বীজান্যাদায় সর্ব্বাণি সাগরং পুপ্লুবে তদা।
নৌকয়া শুভয়া বীর মহোর্ম্মিণমরিন্দম ॥"

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮৭ অধ্যায়।

তার পর এই মৎস্যের সাহায্যে (ইহার শৃঙ্গের সহিত নৌকার রজ্জু বন্ধন করিয়া) তাঁহার নৌকাকে হিমালয়ের শেষ অত্যুচ্চ শৃঙ্গে (যাহা নৌবন্ধন নামে খ্যাত) বন্ধন করিয়া রাখা হইয়াছিল।

"অস্মিন্ হিমাবতঃ শৃঙ্গে নাবং বধ্নীত মা চিরম্।
সা বদ্ধা তত্র তৈস্তূর্ণমৃষিভির্ভরতর্ষভ ॥"

বনপর্ব্ব, ১৮৭ অধ্যায়।

ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, পরিবর্ত্তনশীল যুগে যুগে যেখানে আজ তুষার-ধবল পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হইতেছে, সেখানেও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ এক সময়ে খেলিয়া গিয়াছে। সুতরাং কৈলাসের পাদদেশ আজ বনস্পতিহীন বলিয়া স্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। "কলৌ স্থানানি পূজ্যন্তে" এ কথা শাস্ত্রকারগণ শতমুখে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন-বন-বিহারী নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ কবে কোন্ যুগে তাঁহার সাধের বৃন্দাবনে ঐশ্বরিক লীলায় প্রমত্ত হইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, আজ সেখানেও তখনকার বর্ণনের সহিত সবটুকু সাদৃশ্য আমাদের চোখে প্রত্যক্ষীভূত হয় না! আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ, তিব্বতের এ সকল প্রদেশে এখনও বৃহৎ বৃহৎ জন্তুর অস্থিকঙ্কাল বাহির করিয়া জঙ্গলের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই উন্মুক্ত প্রান্তর যে এককালে একটা বিরাট্ জলাশয়ে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ইহার বিস্তৃতি দেখিলেই সহজে অনুমিত হয়। এই কৈলাসের দৃশ্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া কবি কালিদাস লিখিয়াছেন,—

"গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥"

মেঘদূত, পূর্ব্বমেঘ, ৫৯ শ্লোক।

অর্থাৎ মেঘকে সম্বোধন করিয়া কবি কহিতেছেন,—

"উঠ্‌বে গিয়ে কৈলাসে ভাই
ঊর্দ্ধে আরও এগিয়ে তুমি,
কর্‌লে শিথিল, বাহুর চাপে,
রাবণ যাহার ভিত্তিভূমি!
অভ্রভেদী বিরাট্‌ গিরি
তুষারপাতে দেখায় যেন,
দেবনারীদের প্রসাধনের
দীপ্ত উজল মুকুর হেন!
অসংখ্য তার শুভ্র শিখর
কুমুদ-ফুলের তুল্য সাদা,
শিবের যেন অট্ট হাসি
যুগযুগান্তে জমাট বাঁধা।"

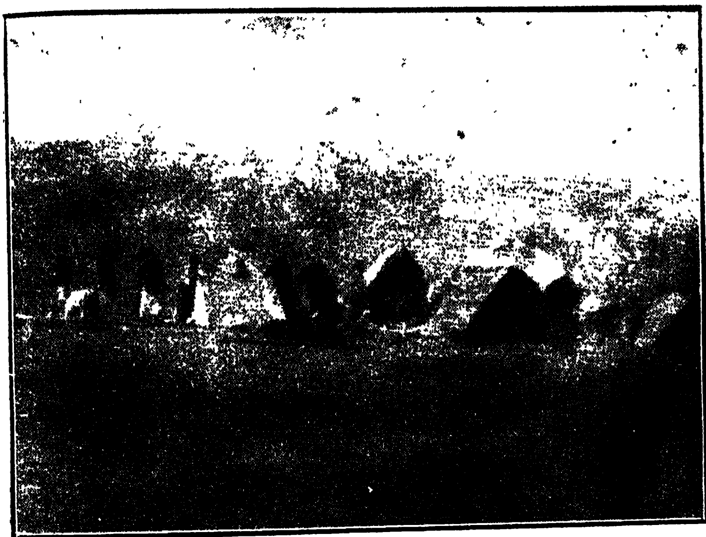
নরেন্দ্র দেব রচিত মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ।

এই যুগযুগান্তের জমাট-বাঁধা শিবের অট্টহাসি সত্যই আজ তৃষিত নেত্রে সকলে প্রত্যক্ষ করিলাম। বারংবার দেখিয়াও হৃদয় ও মন কিছুতেই যেন পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। এতদিনে এই দুর্গম যাত্রা সার্থক হইয়াছে মনে করিয়া কবির একটা বর্ণনা সে সময়ে ক্ষণেকের জন্য আমার স্মরণ হইল,—

"কৈলাস-গিরীন্দ্র-মাঝে সদাশিব সদা রাজে
নিরুপম মনোরম ধাম,
ভয়ে রবি শশী চলে পবন সভয়ে খেলে
সুরাসুর সকলে সমান।
পাখী গাহে শিব-গান নদীজলে কল-তান
লতা দোলে 'শিব শিব' ব'লে
মিলে যত সুরবালা ডালা ভ'রে গাঁথে মালা
নগবালা তুলে দেয় গলে।"

হরকুমার শাস্ত্রী রচিত শঙ্করাচার্য্য।

মহাভারতে কৈলাসের আশে-পাশে কিম্‌পুরুষের (কিম্ অর্থে কুৎসিত) যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের তাঁবুর পার্শ্বে এক এক করিয়া অনেকগুলি কিম্‌পুরুষের আবির্ভাব হইল। কোন কিম্‌পুরুষ আজানুশোভিত আল্‌খাল্লা পরিধান করিয়া বিংশ শতাব্দীর আলোক-প্রাপ্ত এই সভ্যভব্য জীবগুলিকে ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিল। কেহ বা তাঁবুর কাপড় উল্টাইয়া সন্ধ্যার ঘোরে ভূতের মত অকস্মাৎ তাঁবুর মধ্যে মুখ বাড়াইয়া দিল। হ্যারিকেন্ আলোর সম্মুখে অজানা দেশের স্ত্রীলোক দেখিয়া বিহ্বলের মত আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া পরক্ষণেই সে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। সভ্যতা বলিয়া যে একটা সীমাবদ্ধ জিনিষ আছে, তাহা তাহাদের ধারণারও অতীত। পাগল ভোলা ভূতনাথের সীমানা-মধ্যে এই সকল জীববিশেষ যাত্রীদের মনে বেশ একটা আতঙ্ক উপস্থিত করে। সেদিনকার একটি ভূতকে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। ভূতটির পৃষ্ঠদেশে একটি চর্ম্মবিহীন আস্ত ছাগলের শোণিতসিক্ত অস্থিমাংস ঝুলিতেছিল। একে তাহার দীর্ঘাকৃতি বিকট-দর্শন, তায় তাহার হাতের আঙ্গুলে বড়



বস্ত্রাবাস—ফুহু



তারচিনে ভারবাহী মেষপাল

বড় নখ উঠিয়াছে। মাথায় ঘন-পিঙ্গল রুক্ষ জটা, সর্ব্বোপরি বিলক্ষণ ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত লম্বা আচ্ছাদন দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। এই কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তির দৃশ্যে চমকিত না হইয়া থাকা যায় না। এরূপ মূর্ত্তির সম্মুখে এই উন্মুক্ত প্রান্তরে যদি কেহ একাকী পড়িতেন, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহার সেখানে এক দফা সাহসের পরীক্ষা হইয়া যাইত। শুনিলাম, পৃষ্ঠদেশের এই কাঁচা মাংসই তাহার কিছুকালের আহার। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে প্রতিদিন ইনি এই মাংস হইতে কতকটা কাটিয়া লইয়া অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় (ইন্ধনের এখানে খুবই অভাব) উদরস্থ করিয়া থাকেন।

নূতন স্থানে আসিয়া আমরা যতক্ষণ এই সব আলোচনা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, রঞ্জন ততক্ষণে "তার্‌চিন" হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই তার্‌চিন এখান হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বদিকে কৈলাসের পাদদেশে অবস্থিত। আসিবার সময়ে বুদ্ধিমানের মত সে সেখানকার তিন চারি জন পাহাড়ীর নিকট হইতে প্রায় পাঁচ ছয় সের দুগ্ধ খরিদ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিল। বলা বাহুল্য, যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

প্রথম কৈলাস-দর্শন-দিবসে একসঙ্গে এতটা দুগ্ধ সংগ্রহ হওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে ইহাই স্থির হইল, "কৈলাসপতির উদ্দেশে আজ এই দুগ্ধের পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া নিবেদন করা হউক্।" অবশ্য এই দুগ্ধকে পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ যেন গো-দুগ্ধ মনে না করেন। সমস্তই পাহাড়ী ছাগ-দুগ্ধ। তদনুসারে পায়সান্ন প্রস্তুতের ভার আমাদের দিদির উপরেই অর্পিত হইল। এই পায়সান্ন প্রস্তুতের জন্য যথেষ্ট ইন্ধন আবশ্যক। অনেক কষ্টে একজন তিব্বতীর নিকট হইতে কিছু কণ্টকযুক্ত তৃণবিশেষ খরিদ করিয়া লওয়া হইল। তার পর এই দুগ্ধকে চাউল মিশ্রিত করিয়া রূপান্তরে পরিণত করা সে একটা সেদিনের বিরাট্ উদ্যোগপর্ব্ব মনে হইয়াছিল। প্রথমতঃ তৃণে আগুন ধরাইতে পূরা এক বোতল কেরোসিন তৈল নষ্ট

হইল। তার পর যদি বা তৃণে অগ্নিদেব দর্শন দিলেন, শীতের প্রতাপে শিখা তুলিতে তিনি একবারেই অক্ষম! এতগুলি যাত্রীর মনস্তুষ্টি করিতে শেষ কামারমিস্ত্রীর লোহা গলাইতে আগুনে যে অস্ত্র লাগে অর্থাৎ—"হাপর" লইয়া অগ্নির পশ্চাতে সংযোগ করিতে হইল। আমি ও শ্রীমান্ নিত্য-নারায়ণ প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল সেই অস্ত্রের সাহায্যে অগ্নির সহায়তা করিলেও যদি বা চাউল সিদ্ধ হইল, দুগ্ধ কিন্তু কিছুতেই গাঢ় হইল না। পূর্ব্বে জানিতে পারিলে এরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে কেহই স্বীকার করিতেন না। যাহা হউক্, এইরূপে সে দিন এই "দুধ-ভাত" বা তথাকথিত পায়সান্ন কৈলাসপতিকে নিবেদন করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অরুচির মুখে এই রুচির বস্তু (ঠিকমত তৈয়ার না হইলেও) সে দিন যে অতীব উপাদেয় ও মধুর বোধ হইয়াছিল, তাহা সে সময়কার প্রত্যেকের আহারের পরিমাণেই স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল।

পরদিন অর্থাৎ ৭ই শ্রাবণ প্রভাতে যথাসম্ভব শীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া সাড়ে আটটা আন্দাজ সময়ে সকলেই অগ্রসর হইলাম। যাইবার পূর্ব্বে এখানে রঞ্জনের পরিচিত জনৈক ব্যবসায়ীর তাঁবুর মধ্যে যাত্রীদের কতক কতক জিনিষপত্র (যাহা না লইলে চলে) ভারবাহীদের সুবিধার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল। এ দিন হইতেই কৈলাসের পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। পরিক্রমার পথ মোটের উপর প্রায় ত্রিশ মাইল। কষ্টসহিষ্ণু যাত্রিগণ সাধারণতঃ এ পথ পদব্রজেই অতিক্রম করিয়া থাকেন। আমাদের এতগুলি যাত্রীর মধ্যে সাত আট জন ব্যতীত আর সকলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাহনোপরি চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ, আমরা বুঝিয়াছিলাম, সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ষোল হাজার ফুট উচ্চে এ প্রদেশের এই সমতল ময়দান পার হইতেই, আমাদের মধ্যে অনেকেরই শ্বাসকৃচ্ছ্রতা অনুভব হইতেছিল। তার উপর রঞ্জনের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, পরিক্রমার

শেষ দিনে "গৌরীকুণ্ডে"র অত্যুচ্চ চড়াই অতিক্রম করা এখনও বাকী আছে। সেইটি উঠিতে পারিলেই আমাদের চড়াইয়ে উঠার পরীক্ষা শেষ হয়। যাহা হউক্, অদ্যকার এই যাত্রায় তার্চিনকে দক্ষিণে রাখা হইল। এখানে "গাংডা" নামে একটি মঠ আছে। এখান হইতে চিরতুষার-সমাচ্ছন্ন এই স্তূপটিকে কেন্দ্র করিয়া বামাবর্ত্ত হইয়া প্রদক্ষিণ সুরু করিলাম। কতকটা উত্তর, কতকটা বা পূর্ব্বমুখ হইয়া পথ বাঁকিয়া গিয়াছে ; সর্ব্বত্রই তৃণবিহীন নগ্ন পাহাড়ের অস্থিকঙ্কাল ব্যতীত কোথাও সবুজ বর্ণের লেশমাত্র নাই। পথের মাঝে মধ্যে মধ্যে কেবল বিচিত্র বর্ণের অগণিত প্রস্তরখণ্ডে তিব্বতীদের লিখিত সেই "ওঁ মণিপদ্মে হুং" মন্ত্র সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। ভাষা অনেকটা দেবনাগর অক্ষরের মত। এইরূপে কিছু দূর যাইতেই একটি নদী পড়িল। নদীটি প্রশস্ত হইলেও ইহার জল আদৌ গভীর নহে। স্থানে স্থানে বিভক্ত হইয়া একই দিকে তর-তর বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। আশে-পাশে কতকটা বালু ও ছোট ছোট নুড়ি-মিশ্রিত তটদেশ। আমরা এই নদীকে বামে রাখিয়া এইবার কতকটা দক্ষিণমুখ হইয়া আগে চলিলাম। এ সময়ে ক্ষণেকের জন্য কৈলাসের স্তূপটি পাহাড়ের অন্তরালে পড়ায় আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছিল। এক স্থানে একটু ঢালুপথে প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে আচম্বিতে দিদির ঘোড়াটি লাফাইয়া উঠায়, তাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া এ দিন তিনি একটু আঘাত পাইলেন। অগত্যা আজ বেশী দূর যাওয়া হইল না। ছয় সাত মাইল পথ অগ্রসর হইয়াই এই নদীতটের এক স্থানে তাঁবু খাটান হইল। তখন বেলা প্রায় আড়াইটা বাজিয়াছে। নদীর অপর পারে পাহাড়ের কোলে আবার একটি গুম্ফা দেখা গেল। তাহার নাম শুনিলাম "নিয়ান্দি।" দক্ষিণভাগে চোখের সম্মুখেই আবার সেই তুষার-সুন্দর স্তূপ। এবারে আমরা উহার অতি নিকটেই (পাদদেশে বলিলেই চলে) রহিয়াছি।

দিন থাকিতে এস্থানে পৌঁছিয়া, সকলেই এই "কৈলাস" সম্বন্ধে আজ কত প্রকার তর্ক-বিতর্ক আলোচনা আরম্ভ করিলেন। মনে মনে ভাবিলাম, এই সেই শ্রীকৈলাস (?)—যাহাকে দেখিয়া কবে কোন্ যুগে মহাভারতে লিখিত হইয়াছে,—

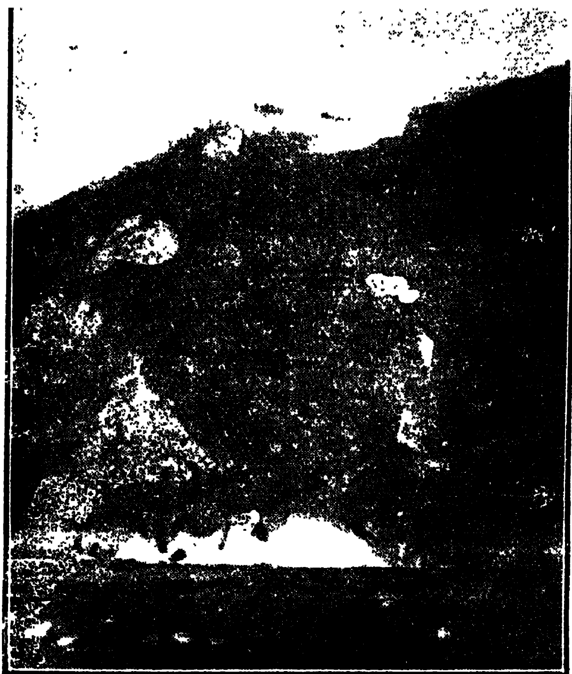
"অস্যাতিক্রম্য শিখরং কৈলাসস্য যুধিষ্ঠির।
গতিঃ পরমসিদ্ধানাং দেবর্ষীণাং প্রকাশতে॥"

বনপর্ব্ব, ১৫৯ অধ্যায়।

এই কৈলাসের শিখরদেশ অতিক্রম করিয়া আগে যাওয়া মনুষ্যের পক্ষে কি একবারেই অসাধ্য? শুধু তাহাই নহে, ঐ স্থানে আরও লিখিত আছে,—

"ন চাপ্যতঃ পরং শক্যং গন্তুং ভরতসত্তমাঃ।
বিহারো হ্যত্র দেবানামমানুষগতিস্তু সা॥"

এইখানেই কি দেবতাদিগের চিরন্তন গতি? আজ তবে তাঁহারা কোথায়? যুগযুগান্তের পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের দেব-কায়া কি শেষ প্রস্তরে পরিণত হইল? চারিদিকেই পাহাড়, পাহাড়ের আকাশচুম্বী নগ্নবিস্তার ব্যতীত আমাদের চর্ম্মচক্ষুতে আর কি দেখিতে পাইলাম! শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করিলে এই কৈলাসের আশে-পাশে অনেক পাহাড়েরই নামের উল্লেখ রহিয়াছে জানা যায়। ঐ যে আমাদের পূর্ব্বদিকে একটির পর আর একটি করিয়া অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী কায়া বিস্তার করিয়া কেমন শোভা পাইতেছে! উহাদের মধ্যে কোন্টি "সূর্য্যপ্রভ," কোন্টি "চন্দ্রপ্রভ," আবার কোন্টি বা সেই মৃতসঞ্জীবন-ওষধি-বিমণ্ডিত "গন্ধমাদন" পর্ব্বত? কে আজ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবে? এ দৃশ্যে শুধুই একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা, একটা যেন বিরাট্ নিস্তব্ধতা আমা-



"নিয়ান্দি" হইতে শ্রীকৈলাস



কৈলাস পরিক্রমায় তিব্বতী

দিগকে সে দিন ক্ষণে ক্ষণে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছিল! এ কোন্ মুক্তির রাজ্য, যেখানে উন্মুক্ত নীলাকাশে ক্ষণেকের জন্যও একটি পাখী পর্য্যন্ত উড়িতে দেখা যায় না! বিস্ময়াভিভূতচিত্তে সকলেই কেবল সেই সম্মুখের পর্ব্বত-প্রাসাদস্থিত উচ্চ তুষারস্তূপের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দেখিয়া দেখিয়া নয়ন যেন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। অদৃশ্য হইতে মূক ভাষায় কে যেন বলিয়া দিতেছিল, ওরে ভ্রান্ত! এ ত আর সেই বৃন্দাবন-বন-বিহারী গোপীজন-মনোমোহন শ্রীরাধারঞ্জনের মধুর লীলাক্ষেত্র নহে, যেখানে বাঁশরীর সুরে আজও কুঞ্জে কুঞ্জে পুষ্পবন মুঞ্জরিয়া উঠিতে থাকে, অলিকুল গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়! এ যে চিরমৌনী জটাজূট-ধারী সেই সর্ব্বত্যাগী যোগিশ্রেষ্ঠের সমাধি-মন্দির—মহানির্ব্বাণের চিরন্তন মুক্তিক্ষেত্র! এখানে ত্যাগের মহিমময়ী মূর্ত্তির পদতলে সংসারের ভোগ-লালসা—আপনার অস্তিত্ব একবারে বিসর্জ্জন দিয়াছে! এ যে সেই মহাপ্রস্থানের পথ, মুনি-ঋষিদের শেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এখানকার সম্পদ শুধু বিভূতি এবং সে বিভূতি এখানে অন্য কিছুই নহে, ঐ চির-শীতল উজ্জ্বল তুষার-কিরীটী। ভক্তি-গদ্‌গদচিত্তে, প্রাণ ভরিয়া উহার সদ্যঃ দ্রবীভূত দুগ্ধের মত ধারা একবার পান করিলেই হৃদয়-মন পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিবে। আর ঐ চিরশুভ্র সমাধির নিম্নদেশে কঠিন প্রস্তর-বেদীতে যে আপনার পঞ্চভূতমিশ্রিত শরীরকে একবার লুটাইতে পারিয়াছে, নরদেহে তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে, তাহাকে আর কখনও শরীর ধারণ করিতে হইবে না।

তিব্বতীরা এই কৈলাসকে "কাং-রিং-পো" (Kang-Rin-Poche) বলিয়া অভিহিত করে। আমাদের দেশে সাধু-সন্ন্যাসীরা তীর্থক্ষেত্রে প্রত্যেক বারো বৎসর অন্তর যেরূপ কুম্ভ করিয়া থাকেন, ঐখানকার লামাগণও এই শ্রীকৈলাসে সেইরূপ কুম্ভ করেন। সে সময়ে

এখানেও "লাদাক" প্রভৃতি স্থান হইতে বহু লামা ও যাত্রীর সমাবেশ হয়। যে বৎসরে এই কুম্ভ বসে, সে বৎসরকে ইহারা ঘোটক-বৎসর (Horse Year) বলে; আগামী বৎসরে (১৯৩০ খৃষ্টাব্দে) এই কুম্ভ বসিবে শুনিলাম।

তিব্বতীগণও এই কৈলাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থজ্ঞানে চিরকাল পূজা করিয়া আসিতেছেন। আমাদের পরিক্রমার পথে কতকগুলি তিব্বতী-যাত্রীকে সে দিন পরিক্রমা করিতে দেখা গেল। যাত্রিগণ সাধারণতঃ দুই তিন দিনে ইহার পরিক্রমা-কার্য্য শেষ করিয়া থাকেন। তবে ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কিছু 'মানস' থাকিলে বাধ্য হইয়া তিনি এই পরিক্রমার ত্রিশ মাইল পথ প্রতি ক্ষেপে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শয়ন করিতে করিতে আপনার শরীরের দ্বারা পথ মাপিয়া পরিক্রমা শেষ করেন। সে অবস্থায় প্রায় কুড়ি দিন পর্য্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

এই কৈলাসের বাস্তব-সৌন্দর্য্য দৃশ্য হিসাবে অতি চমৎকার। বিদেশী পর্য্যটক সিউয়েন হেডিন্ মুগ্ধ দৃষ্টিতে একদিন এই কৈলাস দেখিয়া এ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—"It is incomparibly the most famous mountain in the world. Mount Everest and Mount Blanc cannot vie with it." তাঁহার মতে ইটালীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট ব্ল্যাঙ্ক বা হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেষ্টের সহিতও ইহার তুলনা করা যায় না।

সময় পাইলেও এ দিন আমরা কেহই ওপারের "নিয়ান্দি" গুম্ফা পরিদর্শনে যাইতে চাহি নাই। কারণ, গুম্ফায় কিছু নূতনত্ব আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় নাই। সেখানে কেবলই বুদ্ধ বা তারার মূর্ত্তি ব্যতীত বলিতে কি, মুণ্ডিতকেশ পীত-বসন লামাদিগের মদিরা-বিহ্বল রক্তনেত্র দর্শন করিবার শ্রদ্ধা যাত্রিগণের মধ্যে কাহারও ছিল না। সেখানে যদি

কিছু জানিবার থাকে, তবে তাহা প্রস্তর-লিপিতেই ক্ষোদিত আছে। বলা বাহুল্য, আমরা সে ভাষায় একবারে অনভিজ্ঞ। আরও দুঃখের বিষয়, আমাদের সঙ্গের গাইড্‌ও এ বিষয়ে আমাদেরই মত বুদ্ধিমান্। সুতরাং গুম্ফা-পরিদর্শনে ইচ্ছা করিয়াই সকলে—নিরস্ত হইয়াছিলাম।

সাধারণতঃ চীন বা তিব্বত প্রদেশের অধিবাসিগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী ও তারাদেবীর উপাসক। ইহার প্রমাণ বহু গ্রন্থেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। একমাত্র "চীনাচার-তন্ত্র"ই প্রমাণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব তারার উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিতে এক সময়ে কামাখ্যাতীর্থে গিয়া তথায় অকৃতকার্য্য হইলে, ক্রোধবশে তারাদেবীর উপরেই তিনি অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলেন। সে সময়ে তারাদেবী প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে তাঁহাকে ইহাই উপদেশ দিয়াছিলেন, "চীনাচার ব্যতীত আমি কাহারও উপরে প্রসন্ন হই না। আমার আরাধনার আচার বুদ্ধরূপী বিষ্ণুই অবগত আছেন। তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তাঁহারই উপদিষ্ট আচারে আমাকে ভজনা কর, ইত্যাদি।" এই উক্তি শ্রবণে তিনি তখন হিমালয়-পার্শ্বে মহাচীনদেশে গিয়া বুদ্ধদেবকে দেখিতে পান—

"ততো গত্বা মহাচীনে দেশে স মুনিপুঙ্গবঃ।
দদর্শ হিমবৎপার্শ্বে সাধকেশ্বরসেবিতম্॥"

চীনাচারতন্ত্র, ২য় পটল।

তখনকার কালেও সেখানে বৌদ্ধমতের প্রাধান্য ছিল। সেখানকার উপাসকশ্রেণীর মধ্যে মদিরাপান-জনিত রক্ত-মন্থর আঁখি দর্শন করিয়া বশিষ্ঠদেবও প্রথমে সন্দিগ্ধচিত্তে চিন্তা করিয়াছিলেন,—

"কিমিদং ক্রিয়তে কর্ম্ম বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
বেদবাদবিরুদ্ধোঽয়ং নাচারঃ সম্মতো মম॥"

সে সময়ে ইহাই আকাশবাণী হইয়াছিল—

"....................নৈবং চিন্তয় সুব্রত।
আচারঃ পরমো যোগস্তারিণী-সাধনে মুনে॥"

সুতরাং তাঁহার উপাসনা চীন-তিব্বতে বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক্, আমরা সেদিন এই চিরতুষারসমাচ্ছন্ন নির্ব্বাণ-সমাধির নিম্নদেশে মনের আনন্দে দিন কাটাইলাম। সন্ধ্যাকালে অভি-ভূতের মত সকলেই এই চিরনির্ব্বাক্ নগ্ন মূর্ত্তির পদতলে আপন আপন হৃদয়ের যথাশক্তি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া, চিরদিনের পথের সম্বল পাদ-রজঃ এখান হইতেই সংগ্রহ করিয়া লইলাম। তারপর সেদিন প্রায় প্রত্যেকেরই অনভ্যস্ত কণ্ঠ হইতে সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ ভজন-গীত উচ্চারিত হইয়াছিল। মিষ্টতা না থাকিলেও তখনকার সুরে বিলক্ষণ মাদকতা ছিল। বেশ মনে আছে, সময় ও স্থানবিশেষে সকলের আগ্রহে সেদিন এই আমার মত ভাব-বিহীন অকবিকেও ক্ষণেকের জন্য কবির ভাষায়, কৈলাসপতির উদ্দেশে একটি গীত রচনা করিতে হইয়াছিল। কৈলাস-যাত্রীর যাত্রাপ্রসঙ্গে সে গান অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে, মনে করিয়া নোটবুক্ হইতে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। গানটি এই :—

যদি কঠিন শৈল-বেদীর উপরে
তোমারি চরণ রাজে,
যদি প্রিয় লাগে চির-উজল দীপ্ত
শুভ্র তুষার-সাজে !
তবে চেয়ে দেখ আজি ওই আঁখি দিয়া
সদা রিপুর তাড়নে কঠিন এ হিয়া
অশ্রুনীরে সেথা জমেছে তুষার
শুধু বজ্র-বেদনা বাজে !

যদি নীরব শূন্যতা চাহ চিরতরে
তবে হের এ নীরব শূন্য অন্তরে
নাই হাসি গান প্রেম-কোলাহল
সদা বিষজর, হিয়া-মাঝে!
যদি লোকালয়-বাস ভাল নাহি লাগে
শুধু তুষ্টমতি সদা নগ্ন অনুরাগে
নগ্ন এ হৃদে হের দিগম্বর!
ও সে কৈলাসেরি সাজ সাজে!
তবে উর মহাযোগী! যোগীর সম্বল
এই "মানসোত্তরে" চির-অচঞ্চল!
চির-জ্যোতির্ম্ময়! জাগো মোর ধ্যানে
আজি দিন যায় বৃথা কাজে!

তেমন আনন্দের দিন আর কখনও এ জীবনে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। একটা জাগ্রত স্বপ্নের মত সে রাত্রির স্মৃতি আজও মধ্যে মধ্যে মনকে চঞ্চল করিয়া দেয়।

পরদিন অর্থাৎ ৮ই শ্রাবণ, বুধবার প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সকলেই বেলা নয়টার মধ্যেই আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। আহার বলিতে এক্ষণে তরকারীবিহীন অন্নের আহারই বুঝায়। সঞ্চিত আলু সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আসিবার সময়ে "কাশী—কচুরী-গলির" পাঁপর খানকয়েক সঙ্গে আনা হইয়াছিল। তাহাই টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া একটু মশলা সংযোগে 'ডাল্‌না'র মত করিয়া খাওয়া হইতেছে। তাহাতে কয় দিন চলিতে পারে? অবশেষে রোগের ঔষধ হিসাবে আনীত পুরাতন তেঁতুল তরকারীরূপে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিতে লাগিল। একটু মিষ্ট ও লবণ সংযোগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অম্লের 'ঝোল'রূপে অন্নের সহিত

ইহার নিত্য ব্যবহার, গলাধঃকরণ ভিন্ন সে সময়ে আর কি বলা যাইতে পারে!

আহারে, শয়নে এবং প্রতিদিনের নিরন্তর পার্ব্বত্য-পথাতিক্রমের এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও মনে সান্ত্বনা ছিল—"চিরদুর্গম কৈলাস-পর্ব্বত পরিক্রমা করিতেছি।" দক্ষিণদিকে এই কৈলাসের উন্নত পর্ব্বত-প্রাসাদের সহিত বামদিকেও বেগবতী ঝরণার ওপারে একটি সমুন্নত পর্ব্বত শোভা পাইতেছিল। এই দুই বিস্তৃত পাহাড়ের মধ্যস্থলে ঝরণার ধারে ধারে কয়জন যাত্রীর নিঃশব্দে গমন কেমন একটা সাধন-মার্গের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিতেছি, মনে হইতেছিল। সেখানে জীব-জন্তু-মানবের দুরন্ত কোলাহল নাই, প্রশান্ত নীলাকাশে একটি পক্ষীরও চঞ্চল পক্ষ-বিস্তারে উড়িবার সামর্থ্য নাই। শুধুই নিস্তব্ধতা,—যুগযুগান্ত ধরিয়া এই প্রকাণ্ড সমাধি-স্তূপের চারিধার কি এক মহান্ মৌন আকর্ষণে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে! ধীরে ধীরে এ পথ অতিক্রম করিবার সময় মধ্যে মধ্যে সেই রজত-স্তূপ হইতে শীতল তুষারধারা অভ্রভেদী পর্ব্বত-প্রাসাদের নগ্ন গাত্র বাহিয়া, পয়ঃপ্রণালীর মত নীচে গড়াইয়া আসিতেছিল। মনে হইতেছিল, এই প্রাসাদেরই অভ্যন্তরে লোক-লোচনের অগোচরে চির-মৌনী তাপসবৃন্দ যোগ-সাধনায় অনন্তকাল নিযুক্ত রহিয়াছেন। এক স্থানে প্রায় আট শত ফুট উচ্চ হইতে এই পুঞ্জীভূত ফেন-রাশির ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতধারাকে ধীরে ধীরে নীচে নামিতে দেখিয়া, যাত্রিগণ সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে সে দিকে চাহিয়া দেখিলেন। স্থান-বিশেষে নয়নের পলকও এখানে স্থির হইয়া যাইতে চাহে! এইরূপ বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচ মাইল আগে আসিয়া আমরা একটি বাঁকের মুখে পড়িলাম। সেখান হইতে এই প্রশস্ত ঝরণাটিও পশ্চিমমুখে গিয়াছে। এই ঝরণাটি বামে রাখিয়া আমরাও বরাবর পশ্চিমদিকে ঝুঁকিয়া আগে



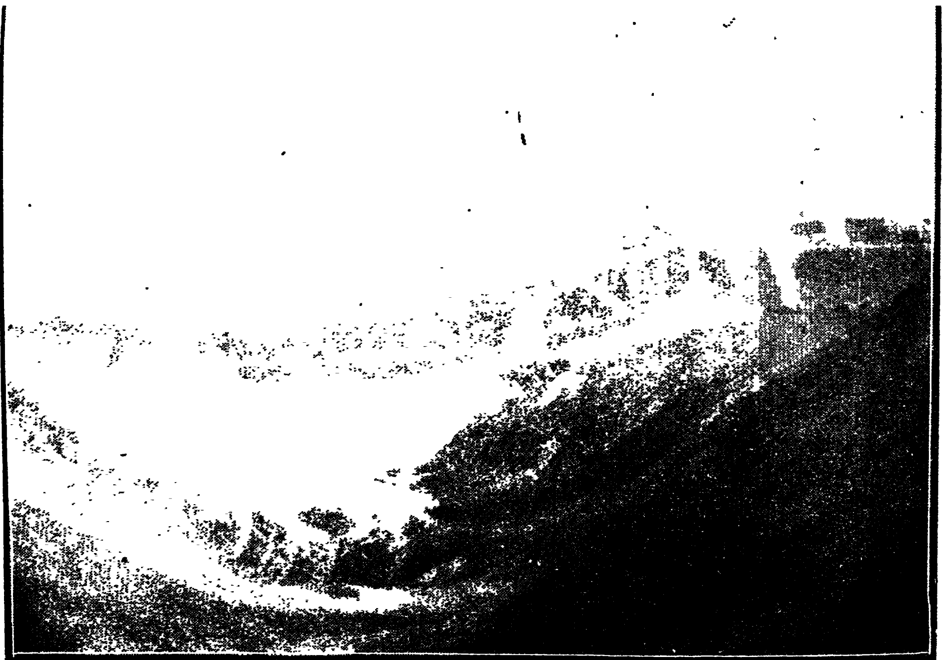
"ডিরীপু" হইতে শ্রীকৈলাস ১৭২

চলিলাম। প্রায় দুই মাইল চলিয়া ঝরণার ওপারে বামকোণে আবার একটি গুম্ফা দেখা গেল। এই তৃতীয় গুম্ফার নাম "ডিরীপু"। এখান হইতে কৈলাসের রজত-স্তূপটি অধিকতর স্থূলগোলাকার দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে।

পাহাড়ের নীচে নীচে এ যাবৎ আমাদের পথ প্রায় সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়াই চলিয়া আসিতেছে। এইবার চড়াইয়ের মুখে আমাদের দক্ষিণ ভাগের রজত-স্তূপ হইতে একটি প্রশস্ত ঝরণা আসিয়া বামদিকের ঝরণার সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহা পার হইয়াই চড়াইয়ে উঠিতে হইবে। ঝরণাটিতে কেবলই রাশীকৃত প্রস্তরখণ্ড বিস্তৃত। ঘোড়া বা ঝব্বু লইয়া এই ঝরণা পার হইতে অল্পবিস্তর লম্ফপ্রদানে কেহ কেহ তাল সাম্‌লাইতে না পারায় ধাক্কা খাইলেন। তথাপি শীতল তুষার-জলে পা ডুবাইতে কেহই রাজী হইলেন না। এই ঝরণা পার হইয়াই সকলে চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলেন। বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্ততঃ বিস্তৃত নগ্ন প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া সেদিনকার এই ভীষণ চড়াই অতিক্রম করিতে সকলকেই অসম্ভবরূপে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল। পাঁচ সাত মিনিট আগে যাইতে না যাইতেই বিশ্রামের আয়োজন। অত্যধিক শ্বাসকষ্ট সে দিন প্রত্যেক যাত্রীকেই অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছিল। এইটুকু সুবিধা ছিল যে, লিপুলেকের চড়াইয়ের মত এ পথে আমাদিগকে সে সময়ে তুষার অতিক্রম করিতে হয় নাই। আমাদের যাত্রার পর-বৎসরে অর্থাৎ ১৩৩৭ সালের কৈলাস-যাত্রিগণ এই গৌরী-কুণ্ডের পথে প্রায় চারি মাইল তুষার পাইয়াছেন। সে জন্য অনেকেরই শীতে জমিয়া যাইবার মত অবস্থা হইয়াছিল। অনুসন্ধানে জানিয়াছি, তাঁহারা আমাদের যাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে ওখানে পৌছিয়াছিলেন।

ভূপ সিং বেচারী ঝব্বুর উপরেই আসিতেছিল। একস্থানে তাহার

ঝব্বুটি যখন দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছিল, সেই অবস্থায় সিংহ মহাশয় পৃষ্ঠচ্যুত হইয়া সহসা নীচে পড়িলেন। তাহার পৃষ্ঠদেশের নিজের বন্দুকে সে নিজেই আহত হইল। সকলের সমক্ষে তাহার বন্দুকের এইরূপ সদ্ব্যবহার, তথা ঝব্বুর দণ্ডায়মান অবস্থাতে নীচে পতন—উভয়ই হাস্যজনক ব্যাপার হইয়া পড়ায়, সকলেরই চক্ষু সে সময়ে তাহার দিকেই আকৃষ্ট হইল। পড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তদুত্তরে যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহাতে সকল যাত্রীরই আর এক দফা হাসির রোল উঠিল। সে বলিল, লোমশবহুল বিপুলবপু ঝব্বুর পৃষ্ঠদেশে বসিয়া চড়াই উঠিবার কালে "ঝাঁকরাণিতে" তাহার তন্দ্রাঘোর লাগিয়া এই দুর্দ্দশা-ভোগ হইয়াছে। স্থানবিশেষে এই অসাবধানতায় পড়িয়া গেলে তাহার ছাতু-পুষ্ট দেহখানি যে একবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে পারে, সে ধারণা সে সময়েও তাহার আদৌ মনে হয় নাই। এ দিকে এই চড়াই উঠিতে যখন সকলেই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাঁহাদের দক্ষিণ ভাগে রজত-স্তূপটির আকার ক্রমশঃ অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছিল। গোলাকার অংশের মধ্য-ভাগ হইতে খানিকটা পাহাড় যেন কায়া বিস্তার করিয়া উত্তরদিকে কিছু-দূর আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। শূলপাণির পিণাকের মত সে বিস্তার হিন্দু-উপাসকের চক্ষুতে কি পবিত্র মূর্ত্তি! পিণাকের গায়ে গায়ে আঁকা-বাঁকা তুষারের উজ্জ্বল বিভূতি স্ফটিকের মালার ন্যায় চোখের সম্মুখে কেমন ঝক্-ঝক্ করিতেছে। এই নির্জ্জন তুষারগিরি-কন্দরে এরূপে পূজার মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ দর্শন মর-জগতে এক অভাবনীয় আবিষ্কার বটে। বিস্মিত-নেত্রে সকলেই সেই বিরাট্ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির-দিকে চাহিয়া দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলেন। সে সময়ে আমাদের প্রত্যেকেরই ভক্তিসম্ভ্রমচিত্ত আপনা হইতেই কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট মহাপুরুষের চরণতলে নমিত হইয়াছিল, তাহা কে বলিয়া দিবে!



পিণাক সহ শ্রীকৈল

ইংরাজ-পরিব্রাজক সিউয়েন হেডিন্ এ দৃশ্যকে "Splendid view" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিব্বতীরা এই স্থানটিকে "গ্যাল্‌পো নরজিঙ্গি ফোপ রাং" (Gyalpo Norjingi Phoprang) অর্থাৎ ধনাধিপতি কুবেরের বাসস্থান বলিয়া থাকে। জাপানী-পরিব্রাজক "কাউয়াগুচির" গ্রন্থপাঠে ইহাই জানা যায়। তিনি লিখিতেছেন, "On ascending the hill (Dolma-la) one sees to the right a snowy range of the northern parts of Mount Kailasa, named in Tibettian Gyalpo Norjingi Phoprang which means the 'residence of king Kuvera, the God of wealth."

Three years in Tibet. Page 174.

ফটোতে এ দৃশ্য পাঠকবর্গের কতটুকু মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে জানি না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, ঘরে বসিয়া মাটীর শিবলিঙ্গ গড়িয়া পূজায় যাঁহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদের ত কথাই নাই, প্রত্যেক সৌন্দর্য্য-পিপাসু ব্যক্তিই শক্তি ও সামর্থ্য হিসাবে একবার যেন এই নির্জ্জন হিমালয়পারের স্বভাবসুন্দর পবিত্র মূর্ত্তিকে জাগ্রতরূপে দেখিয়া আসিতে কদাচ বিস্মৃত না হ'ন। দেখিবেন, যে মূর্ত্তি অন্তরে অন্তরে চরম সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করিয়া দেয়, লোকালয় হইতে এতদূরে এইখানে আসিয়াই সে মূর্ত্তির উজ্জ্বলভাবে আত্মপ্রকাশ রহিয়াছে। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে কৈলাসের অনুপম দিব্য মূর্ত্তির ইহাই হইল একমাত্র বিশিষ্টতা।

সমুদ্রগর্ভ হইতে এই কৈলাসের উচ্চতা কত, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ইহাকে একুশ হাজার আট শত আঠারো ফুট, কেহ বা বাইশ হাজার আটাশ ফুট, আবার কেহ বা বাইশ হাজার তিন শত ফুট উচ্চ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পরিশ্রান্তচিত্তে চারি মাইল আন্দাজ চড়াই শেষ করিয়া যখন আমরা

পাহাড়ের শীর্ষদেশে উপস্থিত হইলাম, তখন অপরাহ্ন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। কৈলাসযাত্রার পথ-পরিভ্রমণে যাত্রীদের ইহাই হইল সর্ব্বশেষ উচ্চতম চড়াই। ইহার উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় আঠারো হাজার পাঁচ শত নিরানব্বুই ফুট। তিব্বতীগণ এই স্থানটিকে "দোল্-মা-লা" এবং হিন্দুগণ "গৌরীকুণ্ডের" পাহাড় বলিয়া অভিহিত করেন। এই উচ্চতম শিখরদেশে তিব্বতীদিগের প্রোথিত একটি দণ্ডায়মান শুষ্ক বৃক্ষদণ্ডের শাখা-প্রশাখায় নানা বর্ণে রঞ্জিত কতকগুলি ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, দুই তিনটি ভাঙ্গা 'শিং' (বোধ হয় মহিষেরই হইবে) এবং কতকগুলি ভেড়ার চুল বাঁধা ছিল। ইহাই হইল সে স্থানের জয়চিহ্ন! আমাদের তিব্বতী ঝব্বুওয়ালারা অব্যক্ত মন্ত্রোচ্চারণের সহিত সে স্থানটি প্রদক্ষিণ করিয়া লইল। এক দল তিব্বতী-যাত্রীও সে সময়ে ইহার প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া আগে চলিয়া গেল।

আমাদের সময় খুব অল্প, বিশেষতঃ রাত্রিতে অসহ্য শীতে এখানে থাকা অসম্ভব বুঝিয়া যাত্রিগণ খুবই ব্যস্ততার সহিত গৌরীকুণ্ড দেখিতে গেলেন। একটু নীচে আমাদের দক্ষিণভাগে এই কুণ্ড বা হ্রদটি একবারে তুষারাবৃত অবস্থায় শোভা পাইতেছে। ইহার পরিধি প্রায় চারি ফার্লং হইবে। আমরা নীচে নামিয়া ইহার জলস্পর্শ করিতে প্রায় এক ফুট পরিমাণ মোটা বরফ যষ্টি দ্বারা ভাঙ্গিতে হইল। এই বরফ অনন্তকাল ধরিয়া জলের উপর জমিয়া ভাসিয়া রহিয়াছে। কৈলাসের তুষারাবৃত পিণাকটি বরাবরই এই কুণ্ড পর্য্যন্ত আসিয়া মিশিয়া রহিয়াছে।

সে কি অপূর্ব্ব শুভ্র সৌন্দর্য্যের বিস্তার! এত উচ্চে আরোহণ করিয়া পিণাক-সংস্পৃষ্ট এই মনোরম তুষার-শোভী গৌরী-হ্রদ দেখিতে গেলে ইহার চিরসুন্দর উজ্জ্বলতায় হঠাৎ যেন চক্ষুগুলি ঝলসিয়া যায়। ইহজীবনের পাপপঙ্কিল হৃদয় এই তুষার-হ্রদের নির্ম্মল জলস্পর্শে নিমেষমধ্যেই উজ্জ্বল ও





গৌরীকুণ্ড

সুন্দর হইয়া উঠে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে দিন সেই রজতগিরিনিভ সদাশিব ত্রিলোচনের উজ্জ্বল অঙ্কে দিব্যাভরণমণ্ডিতা গৌরী দেবীর অনুপম দিব্য মূর্ত্তি বাস্তব ছবির মত সকলেরই চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সে দৃশ্য কখনই ভুলিবার নহে! স্বদেশ-বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত যাত্রিহৃদয় সে দিন সত্য সত্যই যেন শিবলোকের সান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে কি মধুর জাগ্রত স্বপ্ন!

রঞ্জনের ব্যস্ততায় সকলের চমক ভাঙ্গিল। নিয়ত তুষারপাতের আশঙ্কায় এখানে কেহই বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না, বিশেষ এখনও আমাদিগকে অন্ততঃ দুই মাইল উত্‌রাই নামিয়া গিয়া আগে পৌঁছিতে হইবে। দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী সেই পবিত্র হ্রদে পঞ্চরত্ন নিক্ষেপ করিলেন। কেহ কেহ শিশিতে করিয়া জল ভরিয়া লইলেন। তার পর সেই চিরসুন্দর শুভ্র দৃশ্য ফেলিয়া রাখিয়া আমরা ধীরে ধীরে উত্‌রাই নামিতে আরম্ভ করিলাম।

এ উত্‌রাইয়ে ঘোড়া বা ঝব্বু পৃষ্ঠে আসা আদৌ সম্ভবপর নহে। সুতরাং পদব্রজেই অত্যধিক সাবধানতার সহিত সকলেই এ পথ যথাসম্ভব সত্বর শেষ করিয়া প্রায় দুই মাইল চলিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে আর অধিক দূর যাওয়া চলিল না। একটি ঝরণার পার্শ্বেই তাঁবু খাটাইতে সকলে ব্যস্ত হইলেন। এখানে অসংলগ্ন প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া চলিয়া আসিতে দিদিকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। শেষের দিকে খানিকটা পথে ঘোড়ায় উঠিয়া শ্রান্তি দূর করিতে গিয়া তৎপরিবর্ত্তে দ্বিতীয়বার ইহার লম্ফ-ঝম্পে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এ বিষয়ে কিন্তু তাঁহার সহযাত্রিণীর সহিষ্ণুতা ও সাহস অসাধারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কৈলাসযাত্রায় কঠিন অসমতল পথে (বয়সে একষষ্টিতম উত্তীর্ণ হইলেও) ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠিয়া তিনি এ যাবৎ একটুও আহত হ'ন নাই।

আমাদের তাঁবুর পার্শ্বেই জমির উপরে জমাট তুষারখণ্ড ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকায় জমিগুলি ভিজা ও অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে ছিল, অথচ অন্ধকারে আগে যাইবারও উপায় নাই। এই সব ভাবিয়া সে রাত্রি আমাদের সকলকেই একপ্রকার জলের উপরেই কম্বল বিছাইয়া কাটাইতে হইল। চলিত কথায় প্রচলিত, "কৈলাসের শীত" সে দিন প্রত্যেক যাত্রীই কিরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে।

পরিক্রমার দ্বিতীয় রাত্রি এইখানে অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় দিনে বেলা নয়টার মধ্যেই আবার আমরা রওনা হইলাম। সে দিন আকাশ বিলক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। পথিমধ্যে কিছু দূর অগ্রসর হইলে বৃষ্টিপাতের সূচনা হয়। বলা বাহুল্য, এ সকল স্থানে অল্পমাত্র বৃষ্টি হইয়াই প্রায় তুষারপাত হইতে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে চির-প্রাচীন মহাভারতেও যথেষ্ট উল্লেখ আছে,—

"ততোঽশ্মসহিতা ধারাঃ সংবৃণ্বন্ত্যঃ সমন্ততঃ।
প্রপেতুরনিশং তত্র শীঘ্রবাতসমীরিতাঃ॥"

বনপর্ব্ব, ১৪৩ অধ্যায়।

এই অশ্ম-সহিত ধারা অর্থাৎ শিলাবৃষ্টির মধ্য দিয়াই কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা ঝব্বুতে, আবার কেহ কেহ পদব্রজে পরিক্রমা-কার্য্য শেষ করিয়া আগে চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে আমাদের দক্ষিণভাগে চতুর্থ গুম্ফা বা আর একটি মঠ দৃষ্টিগোচর হইল। ইহার তিব্বতী নাম জুং টুল্ পু (Tsuntulpu)। সেই মঠ হইতে অঙ্গুলিসঙ্কেতে যদিও কয়েক জন লামা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছিলেন আমরা কিন্তু সে দিকে কেহই অগ্রসর হইলাম না। নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া বেলা চারিটা আন্দাজ

সময়ে আবার সেই প্রকাণ্ড ময়দানের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে (ফুহুতে) উপস্থিত হইলাম। যাত্রীদের যে সমস্ত আস্‌বাবাদি রঞ্জনের দ্বারা এখানে গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল, সমস্তই আবার লইয়া আসা হইল। এইরূপে সে রাত্রি অল্প অল্প বৃষ্টি ও বিলক্ষণ ঝড়ের মধ্যে তাঁবুতে অতিবাহিত হইল।

অষ্টম পর্ব্ব

প্রত্যাবর্ত্তন

এতদিনের পর এই স্থান অর্থাৎ "কুহু" হইতে আমাদের প্রকৃত প্রত্যাবর্ত্তন সুরু হইল। পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া নিরবচ্ছিন্ন পথ ক্লেশ সহ্য করা যাত্রিগণ সকলেই এইবার সার্থক মনে করিয়া পরদিন বেলা সাড়ে নয়টার মধ্যেই আবার রওনা হইলেন। আমাদের সহযাত্রী পঞ্জাবীর দল (চারি জন) এখান হইতে অন্য রাস্তা ধরিলেন। তাঁহারা লিপুলেক পাস্ দিয়া না গিয়া জোহারের রাস্তায় জ্ঞানিমামণ্ডি হইয়া আলমোড়ায় ফিরিবেন। শুনিলাম, আমাদের নির্দ্দিষ্ট পথ অপেক্ষা এ পথে আলমোড়ায় পৌঁছিতে কিছু কম দিনই লাগিয়া থাকে। তবে এ পথে লিপুলেকের মত দুই তিনটি দুর্গম রাস্তা পড়ে, যথা—"কুংরী-বীংরি" পাস্, "উটাধুয়ী" পাস্, "জয়ন্তী" পাস্ ইত্যাদি। আমাদের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পথেই ফিরিয়া আসিবার কথা, তাই ইঁহাদিগকে বিদায় দিবার সময়ে 'পার্টির' সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে মনে করিয়া, কষ্টানুভব করিলাম। এই পঞ্জাবী-যাত্রিদলে একজনের নিকটে আমি বিশেষভাবে উপকৃত। ইঁহার নাম যজ্ঞদত্ত নাগপাল। মূলতান সহরে ইঁহার নিবাস। কৈলাসের মত দুর্গম যাত্রা-পথের অধিকসংখ্যক 'ফটো' —ইঁহারই অনুগ্রহে আজ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছি। যাহা হউক্, এ দিনে প্রায় বারো, তেরো মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যা ছয়টা আন্দাজ সময়ে আমরা আবার রাবণ-হ্রদে পৌঁছিলাম। এবারে কিন্তু

আমরা মানসের রাস্তা ধরি নাই। বেলা এগারোটা আন্দাজ সময়ে পর্থাকে বামে রাখিয়া বিরাট্ ময়দানটি ক্রমশঃ পার হইয়া, বেলা তিনটা হইতে চড়াই উঠিতে থাকি। তার পর সন্ধ্যা পাঁচটায় রাবণ-হ্রদের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের পাড় ধরিয়া বরাবর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে আসিয়া তাঁবু স্থাপন করা হইল। আসিবার কালে চড়াই হইতে আমাদের বামদিকে মানসের নীল জলের কতকটা অংশ আর একবার নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। প্রকৃতির রাজত্বে এই দুই রমণীয় হ্রদ উভয়েই পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে, এ কথা বলা অত্যুক্তি নহে। জাপানী-পর্য্যটক 'কাউয়াগুচি' এ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—"A mountain, some two and a half miles round at the base, stands like a wall of partition between the two lakes and where this mountain slopes into a ravine it looks, for all the world, as though there were a channel of communication for the water from one lake to the other." Three years in Tibet. Page 147.

তিনি আরও লিখিয়াছেন, "The relations between the two lakes are those of husband and wife." এই দুই হ্রদের সম্বন্ধ ঠিক স্বামি-স্ত্রীর মত। তিনি এই রাবণ-হ্রদ বেড়াইবার কালে তাঁহার পুস্তকের এক স্থানে এখান হইতেই গঙ্গার উৎপত্তি বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

"Keeping Lake Lakgal (Rakhas Tal) in view, I now proceeded easily down hill for some thirteen miles or so until I arrived at a plain through which I found a large river flowing. The river was over sixty feet

wide, and was known as the Mabcha Khanbab, one of the tributary sources of the Ganga."

Three years in Tibet. Page 147.

অবশ্য এ কথাটা ঠিক বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সত্যাসত্য যাহাই হউক্, তীর্থযাত্রীর মত আমরা এই রাবণ-হ্রদের তটে আবার এক রাত্রি অতিবাহিত করিবার অবসর পাইয়াছিলাম।

পরদিন অর্থাৎ ১১ই শ্রাবণ বেলা আন্দাজ দশটার সময়ে সকলেই এই হ্রদ পশ্চাতে রাখিয়া আগে অগ্রসর হইলাম। এ দিনে প্রায় দশ এগারো মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, একটি ঝরণা দেখিয়া, তৎপার্শ্বে রাত্রিযাপন করা হইল। তার পর দ্বিতীয় দিনে সেই পুরাতন পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন তাকলাকোট গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম, তখন এখানকার মণ্ডি বা বাজারের অবস্থা খুবই "সরগরম" দেখা গেল। কর্ণালী নদীর উভয় তীরেই বহু তাঁবুর সন্নিবেশ হইয়াছে। ব্যবসাদার ও খরিদদার-দিগের নিয়ত হুড়াহুড়ি, লোমশ-বহুল অসংখ্য ভেড়া ও ছাগলের মুহুর্মুহুঃ চীৎকার শ্রবণ করিতে করিতে যখন এখানে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, বাস্তবজগতের কথা তখন যেন অকস্মাৎ মনে আসিল।

এখানে আসিয়া আর এক দণ্ডও ভাল লাগিল না। কতক্ষণে এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া আগে অগ্রসর হইতে পারিব, সেই চিন্তায় রঞ্জনের সহিত পরামর্শ আরম্ভ হইল। তাকলাকোট হইতে যে সকল ঝব্বুওয়ালা কৈলাস দেখাইয়া আনিল, তাহারা যদি গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে সমর্থ হয়, তবে কল্যই প্রভাতে এখান হইতে রওনা হওয়া যায়, এই মনে করিয়া রঞ্জন ঝব্ব ওয়ালাদের সহিত এ বিষয়ে স্থির করিয়া ফেলিল।

গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া সওয়া চারি টাকা হিসাবে ধার্য্য হইয়া গেল। তার পর কৈলাস দেখাইয়া তাকলা-

কোটে ফিরিয়া-আনা প্রত্যেক ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া বারো টাকা হিসাবে এবং প্রত্যেক বাহককে (সঙ্গে যাওয়ার দরুণ) তিন টাকা হিসাবে মজুরী চুক্তি করিয়া দিয়া সে দিনের মত তাহাদিগকে বিদায় দিয়া আমরা হাঁফ ছাড়িলাম।

পরদিন প্রভাতে যথাসময়ে আমাদের জন্য আটটি ঝব্বু ও আটটি মাত্র ঘোড়া উপস্থিত হইল। পঞ্জাবী যাত্রীর দল অন্য রাস্তা দিয়া চলিয়া যাওয়ায় এবারে আমাদের দলে সংখ্যায় যেমন কিছু কম হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বোঝাও (আহার্য্য-দ্রব্যের) ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া এবারে ইচ্ছা করিয়া অনেকেই পদব্রজে ফিরিবার সংকল্প করিয়াছেন। কৈলাস ঘুরিয়া তাঁহাদের যেন যথেষ্ট সাহস জন্মিয়া গিয়াছে। যদিচ, এই বারো তেরো দিনের দৈনন্দিন পরিশ্রমে, তিব্বতের শীতে তুষার-মিশ্রিত ঝড়ের মধ্যে অভিযানের ফলে, প্রত্যেকেরই নাক, মুখ, ঠোঁট শুধু ফাটে নাই, একবারে কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত হইয়াছে, তথাপি বাটী ফিরিবার ব্যস্ততায় ও উৎসাহে 'ঘরমুখো বাঙ্গালী' কতদূর আনন্দ লাভ করেন, তাহা যিনি বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া কিছুদিন পর্ব্বত-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক হয় না। আমাদের অবস্থা পাঠকবর্গ! আপনারা একবার মনে করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ, খাদ্যাভাবে মাসাধিককাল প্রত্যেকেরই জিহ্বা রুচিপরিবর্ত্তন করিবার জন্য একপ্রকার ক্ষিপ্ত বলিলেই হয়! তাহার উপর শরীরের অবস্থা তিব্বতীদের ন্যায় আগাগোড়া শুষ্ক, রুক্ষ, তৈলাভাবে সর্ব্বদাই যেন অসম্ভব 'খস্‌খসে' হইয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সমতলবাসী বাঙ্গালা রাজ্যে যাঁহারা বাস করেন, এ 'ধাত্‌' তাঁহাদের কয়দিন সহ্য হইতে পারে? এমত অবস্থায় বাটী ফিরিবার জন্য প্রত্যেক যাত্রীরই অন্তঃকরণ বিলক্ষণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা যথাসম্ভব সত্বর অর্থাৎ বেলা নয়টার মধ্যেই এখান হইতে রওনা হইলাম। প্রায় ছয় সাত মাইল দূরে পালা হইতে কিছু দূর আগে গিয়াই তাঁবু খাটাইতে বাধ্য হইলাম। এ দিনে ঝব্বুওয়ালারা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। কারণ, আরও কিছু দূর যাইতে গেলে তুষার-শীতল লিপুলেকের নিকটে রাত্রিবাস করিতে হয়। সেখানে অসহ্য শীত, তায় এবারে তাহারা সঙ্গে তাঁবু পর্য্যন্ত লইয়া আসে নাই। অগত্যা লিপুর দুই মাইল পশ্চাতে থাকিয়া সে দিন রাত্রিযাপন করা হইল।

পরদিন লিপু অতিক্রমের পালা। প্রত্যূষেই আপন আপন আস্‌বাবাদি ঝব্বু-পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া সকলে রওনা হইলেন। রৌদ্রের পূর্ব্বেই লিপু পার হওয়া আবশ্যক—বলিয়া দিয়া স্বামীজীরা পদব্রজে আগে আগে দ্রুত চলিয়া গেলেন। অশ্বপৃষ্ঠে আমরা কিছুদূর অগ্রসর হইলে, দূর হইতে সেই ধবলাকার তুষার-পুঞ্জীভূত লিপুর শৃঙ্গগুলি চোখের সম্মুখে আজ কেবল আতঙ্কই উপস্থিত করিতেছিল। ঐ পথটুকুই কি যত অনর্থের মূল? স্বামীজীদের মধ্যে ঐ ত কেহ কেহ উহার চড়াইয়ে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরাও কি ঐরূপে এই তুষার-শৃঙ্গটি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব না? প্রায় উনিশ হাজার ফুট উচ্চ গৌরীকুণ্ডের পাহাড় অতিক্রম করিয়া আসিলাম, আর লিপুর উচ্চতা সে হিসাবে অনেক কম, তবে এত চিন্তা করিবার হেতু কি? হেতু অবশ্যই আছে। দুরন্ত শীতে উঁচু-নীচু পথে তুষারের রাস্তা পার হইতে হইবে বলিয়াই এতটা ভয়! গৌরী-কুণ্ডের চড়াইয়ে কৈ, আমরা ত কেহই তুষারের রাস্তা পাই নাই। তাই সেটা এত দুর্গম মনে হয় নাই।

যতই লিপুর নিকটবর্ত্তী হইয়া চড়াইয়ের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছি, শীতও তত বেশী বোধ হইতে লাগিল। অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া হাত-পা যেন ক্রমশঃ অসাড় হইয়া যাইতেছিল। প্রায় দুই মাইল উঠিয়া এইবার তুষারের

সম্মুখীন হইলাম। রৌদ্রের লেশ নাই, (রৌদ্র থাকিলে শরীর গরম হইত !) অথচ বেলা যথেষ্ট হইয়াছে। সময় বুঝিয়া সূর্য্যদেব আজ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন ! মাথার উপরে কেবলই পুঞ্জীভূত মেঘ শীতে জড়সড় হইয়া যেন জমিয়া গিয়াছিল ! এ অবস্থায় এক উচ্চস্থানে লম্ফ দিতে গিয়া, আমার ঘোড়াটি অকস্মাৎ সাজ-সমেত আমাকে পৃষ্ঠচ্যুত করিল !

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাওয়া—ইহাই আমার প্রথম। বাটীতে যিনি নিত্য ঘোড়-সওয়ার অর্থাৎ শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ, তাঁহাকেও এ যাবৎ দুই তিনবার ঘোড়া হইতে পড়িতে দেখিয়াছি ; কিন্তু স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়া আসিয়াছি, যাত্রিগণ আমার মত অনভ্যস্ত ঘোড়-সওয়ারকে একবারও এ যাবৎ ঘোড়া হইতে পড়িতে দেখেন নাই। আজ কিন্তু ফেরত-মুখে লিপুর চড়াইয়ে উঠিবার কালে সে স্পর্দ্ধাটুকু কৈলাসপতি একবারে দূর করিয়া দিলেন। এত ক্লেশের মধ্যেও অন্যান্য যাত্রিগণের মুখে এ সময়ে হাসি ফুটিতে দেখিয়া বিলক্ষণ লজ্জিত হইলাম। যদিও জানুতে ও হাতের স্থানে স্থানে আঘাত লাগিয়া একটু-আধটু রক্ত বাহির হইল, সে ক্লেশটুকু সে সময়ে এতদিনের দর্পচূর্ণের হঠাৎ ক্লেশ অপেক্ষা অনেক কম মনে হইয়াছিল। যাহা হউক্, পকেট হইতে "জম্‌বক্" বাহির করিয়া ক্ষত-স্থানে তৎক্ষণাৎ প্রলেপ দিয়া বীরের মত আবার আগে অগ্রসর হইলাম। এবার কিন্তু ঘোড়ায় নহে।

ঘোড়াওয়ালা (তিব্বতী) আমার দুর্দ্দশা দূর হইতেই দেখিতে পাইয়াছিল। সে নিকটে আসিলে, ঘোড়ার সাজ ভাল করিয়া কেন বাঁধে নাই বলিয়া তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলাম। দুঃখের বিষয়, সে তাহাতে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করিল না। প্রতিবাদস্বরূপ সে নিজেই এক্ষণে তাহার বাহনের উপর চড়িয়া বসিল। বলা বাহুল্য, যে চড়াইয়ে ঘোড়া লইয়া চলা একটুও সহজ নহে, সেই পথে ঘোড়ার উপরে বসিয়াই সে অনায়াসে

তুষারের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। অন্যান্য যাত্রিগণের সহিত আমি এক্ষণে পদব্রজেই ক্রমশঃ তুষারের পথ অতিক্রম করিয়া চলিলাম। দেখিলাম, যাইবার সময়ে এ পথে যেরূপ তুষারের বিস্তৃতি ছিল, এ সময়ে তদপেক্ষা তুষার কিছুই কমে নাই। সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত সাবধানতা সহকারে এ তুষার অতিক্রম করিতে না পারিলে পদে পদে পা পিছলাইয়া যায়। অনেকেই এখানে এ দিনে তুষারের উপরে আছাড় খাইয়াছিলেন। স্ত্রীলোক-যাত্রীর দুর্দ্দশার কথা না বলিলেই ভাল হয়। প্রথম পদ যদি বা তাঁহারা তুষারে আগে বাড়াইয়া দিলেন, সে পায়ে ভর দিয়া উচুতে উঠিবার জন্য দ্বিতীয় পদ আর চালাইতে পারেন না। তুষারের উঁচু-নীচু রাস্তায় ইহাই হইল বিপদ্! যাহা হউক্, একজন অগ্রে এক হাত এবং পশ্চাতে আর এক জন সঙ্গে ধরিয়া কোন প্রকারে তাঁহাদিগকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমরাও ক্রমশঃ শেষ উচ্চস্তরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যাত্রীদিগের মধ্যে উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের মুখে এতক্ষণে কথা বাহির হইল। "পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইবার এতক্ষণে শেষ হইল"—এই কথা বড় দুঃখের সহিতই সে দিন তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়াছিল! দুঃখের কথা বলিতে কি, প্রায়শ্চিত্ত তখনও যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, এ কথা যাত্রীদিগের মধ্যে কেহই সে সময়ে বুঝিতে পারেন নাই। যথাকালে ইহার বিবরণ পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন।

গর্ব্বিতচিত্তে যখন আমরা সকলেই লিপুর উত্‌রাই ধরিয়া নামিয়া আসিতেছিলাম, সে সময়ে এক অভাবনীয় দৃশ্যে আমাদের সকলেরই দর্প চূর্ণ হইয়া গেল! দেখিলাম, একটি পাঁচ বৎসরের ভুটিয়া বালক তাহার আত্মীয়-স্বজনের সহিত এই দুর্গম তুষার-শিখর পদব্রজেই হাসিমুখে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। চোখের সম্মুখে সেই বীর বালকের সাহসপূর্ণ অভিযান চিরদিনই আমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে।

দুই ঘণ্টাকাল তুষার-সমুদ্র মন্থন করিয়া বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে সকলে নীচে নামিয়া আসিলাম। আবার অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া প্রায় পাঁচ ছয় মাইল আগে চলিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে কালাপানিতে উপস্থিত হইলাম। বৃষ্টির জলে সে দিন সমস্ত পথটাই যাত্রীদিগকে ভিজিতে হইয়াছিল। রাস্তার আশপাশ সর্ব্বত্রই বিলক্ষণ আর্দ্র দেখিয়া তাঁবু খাটাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। জনৈক ভুটিয়া মহাজনের (কল্যাণ সিংএর) একখানি দ্বিতল মাটীর ঘর খালি পড়িয়া থাকায় তাহার রক্ষক একটি স্ত্রীলোককে কিছু বখশিশ্ দিয়া সে রাত্রি সেইখানেই কাটাইয়া দিলাম।

পরদিন বেলা সাড়ে আটটার মধ্যেই আমরা রওনা হইলাম। এখান হইতে আমাদের তিনজন যাত্রীর তিনটি ঘোড়া লিপুর পথে আঘাত পাওয়ায় চলিতে অসমর্থ হয়। অগত্যা সম্পূর্ণ ভাড়ার অর্দ্ধেক অর্থাৎ দুই টাকা হিসাবে চুক্তি দিয়া সে যাত্রায় তাহাদিগকে বিদায় দিতে হইয়াছিল। এখান হইতে গার্ব্বিয়াং প্রায় এগারো বারো মাইল পথ হইবে। পদব্রজেই বেশ দ্রুতভাবে এ পথ অতিক্রম করিয়া বেলা দেড়টা আন্দাজ সময়ে আমরা গার্ব্বিয়াংএ পৌছিলাম। আবার সেই কালী-নদী পার হইতে হইল। ভরা বর্ষায় তাহার আয়তন দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ছোট পুলের পরিবর্ত্তে এবারে বড় বড় চীর-গাছের সুদীর্ঘ গুঁড়ি দ্বারা প্রস্তুত পুল পার হইবার সময়ে, এই নদীর দুকূল-ভাঙ্গা গর্জ্জন ভীষণ-ভাবে শ্রুত হইয়াছিল। আমরা আগে পৌছিলেও আর আর সওয়ার-যাত্রী বা ভারবাহী ঝব্বু-গুলির গার্ব্বিয়াং পৌছিতে এ দিন বহু বিলম্ব ঘটে। এখানকার পাটোয়ারীর হুকুম লইয়া এবারে স্থানীয় ডাক-বাংলোয় স্থান লওয়া হইল। দেখিলাম, বাংলোটি বেশ সাহেবী ধরণের। পাকা ইমারত, দুই তিনটি শয়ন-ঘর, বেশ ঝর্‌ঝরে ও পরিষ্কার। পাশের দিকে একটু অগ্রসর

হইলেই বরাবর স্বতন্ত্রভাবে তিন চারিটি ছোট ছোট কুঠারী আছে। যাত্রিগণ এইখানেই রন্ধনাদি করিয়া থাকেন। সম্মুখেই প্রাচীর-ঘেরা প্রশস্ত অঙ্গন। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, গ্রামের মধ্যে স্থানীয় অধিবাসিগণ যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া চারিদিক দুর্গন্ধময় করিয়া রাখে। কিন্তু গ্রাম হইতে কিছু দূরের এ স্থানটি সে সকল দুর্গন্ধ হইতে একবারেই বর্জ্জিত। এত দিনে বেশ একটু থাকিবার মত স্থান পাইয়া সকলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

রঞ্জন আপন গ্রামে পৌঁছিয়াই যাত্রীদের সুখ-সুবিধায় ব্যস্ত হইল। আমাদের দলের মধ্যে কতক যাত্রীর কিছু দিন হইতেই কোন কোন দ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছিল, তাঁহারা এখানে আসিয়া চাউল খরিদ করিলেন, কিন্তু তরকারী কি পাওয়া যায়, তাহার জন্য সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। অনেক কষ্টে পান সিং (চাকর) কতকগুলি ফুলকপির ছোট ছোট গাছ (তাহাতে আদৌ কপি ছিল না) চারি আনা মূল্যে খরিদ করিয়া আনিল। ক্ষুধার তাড়নায় অন্নের সহিত সে দিন তাহারই "ছেঁচ্‌কি" তৈয়ার করিয়া গলাধঃকরণ করা গেল। অনুভবানন্দজী গ্রামে গিয়া পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রায় সকল যাত্রীরই পত্রগুলি আনিয়া দিয়া আমাদিগকে সে দিন পরম অনুগৃহীত করিয়াছিলেন।

এখানে আসিয়াই সকল যাত্রীর ঘরের কথা স্মরণ হইল! কিন্তু বোঝা লইয়া যাইবার কুলী কৈ? কৈলাস যাইবার পূর্ব্বেই স্বামীজী মহারাজ তাকলাকোট হইতে গার্ব্বিয়াং-নিবাসী একজন ভুটিয়া বণিকের মারফত পত্র দ্বারা ধারচুলায় সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে কুলীগণ ২।৩রা আগষ্ট নাগাইদ গার্ব্বিয়াংএ আসিয়া অপেক্ষা করে। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, ধারচুলায় পূর্ব্ব হইতেই কুলীগণের মজুরী ঠিক করিয়া এক টাকা হিসাবে অগ্রিম দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই

এক দিন পূর্ব্বে (১লা আগষ্ট তারিখে) এখানে পৌঁছিয়াছি, তাই আরও দুই একদিন অপেক্ষা করিতে হইল।

দ্বিতীয় দিন প্রভাতেই রঞ্জন খবর আনিল, নীরপানির পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সরকারী ডাক বহনের জন্য ঐ পাহাড়ের উপরের রাস্তা সংস্কার করা হইতেছে। সংবাদ শুনিয়া সকলেই বজ্রাহত হইলেন! আর দুই তিন দিন পূর্ব্বে আসিতে পারিলেই এই পুল দিয়া ঠিক অবস্থায় পার হইয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু ভগবানের চক্র! লীলাময়ের লীলা বুঝিবার সামর্থ্য মনুষ্যের নাই! তাই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় সকলেই যাত্রার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এ দিনে আমাদের ঝব্বু প্রভৃতির ভাড়া চুক্তি করিয়া দিয়া তিব্বতী ঝব্বুওয়ালাদিগকে ছাড়িয়া দিলাম। এক্ষণে আর তাঁবুর আবশ্যক নাই জানিয়া, আমাদের ভাড়া-করা অতিরিক্ত তাঁবুটি তাঁবুওয়ালাকে ফেরত দিয়া উহার নির্দ্দিষ্ট ভাড়া ছয় টাকা দেওয়া হইল। এইবার কৈলাস-দূত রঞ্জনকে বিদায় দিবার পালা। হিসাব করিয়া দেখা গেল, এ পর্য্যন্ত তাহার কুড়ি দিনের মজুরী পাওনা হইয়াছে।

প্রত্যহ দেড় টাকা হিসাবে এই মজুরী মোট ত্রিশ টাকা তিন দলের খরচায় বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক দল দশ টাকা হিসাবে বহন করিলেন। তাহা ছাড়া গার্ব্বিয়াং হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে আমাদের প্রত্যেক দলই তাহাকে দুই টাকা হিসাবে বখশিশ্ দিয়া আসিয়াছে। তাহার সর্ব্বদাই হাস্য-প্রফুল্ল মুখ এবং নম্র-মধুর ব্যবহার কৈলাসযাত্রার পথে আমাদের সকলকেই আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল।

এ দিকে নীরপানি পাহাড়ের নীচের পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সংবাদে, উপর দিয়া বোঝা লইয়া যাইবার ভয়ে, হয় ত কুলীগণ ধারচুলা হইতে নাও আসিতে পারে এই সন্দেহে, এখান হইতে আগে ফিরিবার জন্য অন্য

কুলীর সন্ধান চলিতে লাগিল। অনেক কষ্টে দ্বিতীয় দিন আট টাকা হিসাবে প্রত্যেক কুলীর মজুরী স্থির করিয়া তিনটি মাত্র কুলী সংগ্রহ হইল। এত বড় দলের বোঝা লইয়া যাইতে তিনটি কুলীতে কয় মণ মাল হইয়া যাইতে সমর্থ হইবে? সত্য কথা বলিতে কি, একা আমাদের দলেই আঠারোটি কুলীর আবশ্যক। কারণ, আমাদের সহিত দুইজন "স্ত্রীলোক লগেজ" রহিয়াছেন! অগত্যা ডাক্তার-দল (তিনজন মাত্র) এই কুলী লইয়া আগে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। বাটীতে তাঁহাদের অভাবে কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, ইহা তাঁহারা পত্রে জানিতে পারিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় আমরা আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। কেবল অনুভবানন্দজী বলিয়া উঠিলেন, "নীরপানির উপরের রাস্তা অতি ভীষণ, একে বর্ষা তায় সেই পুরাতন পথ (যাহাতে সবেমাত্র দুই এক দিন পথিক চলিতেছে) এরূপ সাংঘাতিক যে, সে পথে পা পিছ্‌লাইয়া পদে পদে প্রাণ হারাইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। এমতাবস্থায় ডাক্তারত্রয়ের সহিত তিনিও সঙ্গ লইলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ কথায় আমরা কেহই অমত করিতে পারিলাম না। বরং এখানে কুলীর বিশেষ অভাব দেখিয়া, সকলের পরামর্শে শেষ সিদ্ধান্ত হইল, স্বামীজী ধারচুলায় আগে পৌঁছিয়া আমাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কুলীগণকে (যাহাদের প্রত্যেককেই এক টাকা হিসাবে দাদন দেওয়া রহিয়াছে) ধমক দিয়া সেখান হইতে শীঘ্রই পাঠাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন। এই সব বিবেচনা করিয়া ডাক্তারত্রয়ের সহিত তাঁহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যাইবার পূর্ব্বে তিনি আরও বলিলেন, নীরপানি পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে দুইটি রাস্তার মধ্যে কোন্‌টি বেশী সংঘাতিক ও বিপদ্‌সঙ্কুল, তাহার বৃত্তান্ত তিনি ডাকহরকরা মারফত পত্রের দ্বারা পূর্ব্ব হইতে আমাদিগকে জানাইয়া দিবেন। তাঁহার পত্র পাইলে দলবলসহ আমরা সেই পথ দিয়াই যাওয়া স্থির করিব।

এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক পাঠককে এই বিষয় অধিকতর সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি। নীরপানি পাহাড়ের নীচের পুল (অন্য সময়কার চির-প্রচলিত রাস্তা) ভাঙ্গিয়া গেলে এই পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে যে দুইটী রাস্তা পাওয়া যায়, একটিকে "মাঝের রাস্তা" এবং অপরটিকে "উপরের রাস্তা" বলা হয়। নীচের প্রচলিত পথ অপেক্ষা মাঝের রাস্তা দিয়া যাইতে ছয় মাইল এবং উপরের রাস্তা দিয়া যাইতে সাত মাইল পথ অতিরিক্ত "ফের" পড়ে। এই দুই পথের মধ্যে কোন্ রাস্তা দিয়া যাওয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, তাহাই আমাদের স্বামীজী সেখান হইতে আগে গিয়া ডাক-হরকরার হাতে পত্রের দ্বারা জানাইবার কথা বলিতেছিলেন।

গার্ব্বিয়াং হইতে ডাক্তারত্রয়কে বিদায় দিবার সময়ে আমরা সকলেই বিশেষ কাতর হইয়াছিলাম। এতদিনের দুর্গম পথের সহযাত্রী, সুখে দুঃখে সমান অংশীদার, অর্দ্ধেক পথ হইতেই সঙ্গ-পরিত্যাগ করিলে কাহার মন সে সময়ে স্থির থাকে? স্বামীজীকে ত ধারচুলায় পৌঁছিয়া শীঘ্রই দেখিতে পাইব; কিন্তু ডাক্তারের দল তখন কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন! যাইবার কালে ডাক্তারত্রয় আলমোড়া হইতে আনীত তাঁহাদের পাচকটিকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দিনের রাত্রি কোন প্রকারে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিনে দারুণ বর্ষা দেখা দিল। আর সে তিব্বত নাই যে, অল্পবৃষ্টি হইয়াই নিবৃত্ত হইবে। সারাদিনই বৃষ্টিতে ঘর হইতে বাহির হইবার উপায় রহিল না। এই অপরিচিত পার্ব্বত্য-প্রদেশে এভাবে সমস্ত দিন নীরবে বসিয়া থাকা একবারেই অসহ্য মনে হইতেছিল। বোঝাগুলিই যে আমাদের ফিরিয়া যাইবার পক্ষে প্রধান অন্তরায়! ইহার গতি করিতে গেলে সেই একমাত্র কুলীর কথাই মনে পড়ে। ধন্য এই পাহাড়ী-কুলীদের শক্তি! সে শক্তি

সমতলদেশবাসী বাঙ্গালীগণকে একবারেই আশ্চর্য্য করিয়া দিয়াছে। যে সকল চড়াই-উত্‌রাই-পথ সহজ অবস্থায় 'উঠা-নামা' করিতে নিয়তই আমাদের হাঁফ ধরিতে থাকে, পাঁচ সাত মাইল-ব্যাপী সেই সকল দুর্গম পথে এই সকল পাহাড়ীই বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া, নামমাত্র মজুরীতে যাত্রী-দিগকে অনায়াসে পার করিয়া দেয়। তীর্থযাত্রার অর্দ্ধেক পুণ্য ইহারাই ত অর্জ্জন করিয়া থাকে। এই সকল পাহাড়ী-কুলীর সাহায্য না পাইলে আজ বাঙ্গালীর ভাগ্যে তীর্থপর্য্যটন অসাধ্য হইয়াই রহিয়া যাইত!

৪ঠা আগষ্ট বৈকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন আমাদের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কুলীগণের কোন সংবাদই পাওয়া গেল না, তখন কুলী সংগ্রহের জন্য সকলেই স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। ইনি এক জন নব্য অথচ সদাশয় ব্যক্তি। কৈলাস যাইবার কালেও আমরা ইঁহার যথেষ্ট সৌজন্যের পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের কুলীর অভাব দেখিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্ধানাদি লইতেছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় এ দিন এক সর্দ্দার-বিশেষ পাহাড়ী-কুলী সংগ্রহে স্বীকৃত হইল এবং এই কার্য্যের জন্য পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয়ের কথামত আমরা তাহার হাতে উপস্থিত প্রতি কুলী পিছু এক টাকা হিসাবে অগ্রিম দিবার জন্য ষোলটি টাকা ফেলিয়া দিলাম। টাকা পাইয়া সর্দ্দার ব্যক্তি সন্ধ্যার মধ্যেই আট দশটি কুলী সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং নীরপানির (পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়) উপরের ভীষণ রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে বলিয়া প্রতি কুলী পিছু নয় টাকা হিসাবে মজুরী চাহিল।

আমরা বাটী ফিরিবার জন্য ধৈর্য্য হারাইয়াছিলাম। ধারচুলায় কুলীদিগের সহিত ছয় টাকা হিসাবে দর চুক্তি থাকিলেও, আজ অবস্থাভেদে এই সর্দ্দার-কুলীর কথায় সায় দিতে হইল। তার পর, আগামী কল্যই বাকী কুলী সংগ্রহ হইয়া যাইবে, এ কথা বলিয়া যখন

সর্দ্দার চলিয়া গেল, সে সময়ে আমরা সকলেই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

পরদিন দুপুরবেলা সর্দ্দার জানাইয়া গেল, সমস্ত কুলীই ঠিক হইয়া গিয়াছে। প্রভাতে আসিয়া তাহারা বোঝা প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইবে। এ দিকে ঠিক সেই দিন সন্ধ্যাকালে ধারচুলা হইতে আগত কুলীসর্দ্দার "প্রধান" দলবল সহ আসিয়া আমাদিগকে সেলাম দিল। এ ব্যাপারে সকলেই বিশেষ মুস্‌কিলে পড়িলেন। উভয় দলেরই কুলীগণকে অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে, এমত অবস্থায় কোন্ দলকে সঙ্গে লইয়া গেলে অর্থের দিক্ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়, এই সব আলোচনা চলিল। বলা বাহুল্য, পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয়কেই মধ্যস্থ মানিয়া, বিচারের ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত হইল। তিনি স্থানীয় কুলীসর্দ্দারকে ডাকিয়া বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পরে তাহার সহিত স্থির করিলেন যে, ধারচুলা হইতে আগত পুরাতন কুলীগণই বোঝা লইয়া যাইবে। তবে এ ব্যাপারে মধ্য হইতে ষোলটি টাকা যাহা স্থানীয় কুলীগণকে অগ্রিম দেওয়া হইয়াছিল, ফেরত না পাওয়ায় উহা দণ্ডস্বরূপ আমাদিগকেই বহন করিতে হইল। সে যাত্রায় এইরূপে বিচারের নিষ্পত্তি হইয়া, আমরা রক্ষা পাইলাম। প্রধানের হস্তে অনুভবানন্দ স্বামীজীর একখানি পত্র পাওয়া গেল। গালা হইতে তিনি লিখিয়াছেন, "নীরপানি পাহাড়ের উপরের দুইটি রাস্তাই অতি ভীষণ, বিশেষ 'মাঝের রাস্তা' আরও সাংঘাতিক। তাঁহারা মাঝের রাস্তা দিয়া গিয়া ভুল করিয়াছেন, কারণ সে রাস্তায় মানুষ যাইতে পারে না। তাঁহাদের চোখের সম্মুখেই একজন সাধু পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িতেছিলেন। একটি গাছে আট্‌কাইয়া কোনরূপে তিনি বাঁচিয়া যান। ডাক্তারদের মধ্যে নলিন বাবুরও ঐ দশাই হইতেছিল। পাচক তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। তাঁহারা যে প্রাণ

লইয়া ফিরিতে পারিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। খুব সাবধানে উপরের রাস্তা দিয়াই আপনারা আসিবেন, ইত্যাদি।”

পত্র পড়িয়াই আমরা আকাশ হইতে পড়িলাম। স্ত্রীলোক-যাত্রিণী-দ্বয়ের মনের অবস্থা সে সময়ে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা তাঁহারাই একমাত্র বলিতে পারেন। যাহা হউক্, কৈলাসপতির নাম লইয়া পরদিন অর্থাৎ ৬ই আগষ্ট বা ২০শে শ্রাবণ তারিখে আহারান্তে বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে সকলে গার্ব্বিয়াং পরিত্যাগ করিলাম।

এই গ্রামটি অতিক্রম করিবার সময়ে প্রথমেই ঢালু, সংকীর্ণ রাস্তায় কিছুদূর পর্য্যন্ত বিলক্ষণ কাদা এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে অত্যন্ত পিচ্ছিলতা সকল যাত্রীকেই আগে চলিতে বেশ বিপদে ফেলিয়াছিল। বোঝা সমেত একটি কুলী একবার এখানে আছাড় খাইল। ভরা বর্ষায় বাটী ফিরিয়া আসিতেছি, ‘শুক্‌নো’ পথের আশা দুরাশা বলিলেই হয়। আবার সেই তৃণবিস্তৃত লম্বা ময়দান ক্রমশঃ পার হইলাম। তার পর বেলা বারোটার মধ্যেই গার্ব্বিয়াংএর বিপুল উত্‌রাই পথ নামিয়া আসিয়াই বুধিতে পৌছিলাম। সেখানে সকলেই অল্প অল্প বিশ্রাম করিয়া গন্তব্য পথে আবার অগ্রসর হইলেন। যাইবার কালে যে সকল চড়াই ছিল, এক্ষণে ফিরিবার কালে তাহা উত্‌রাই হইয়াছে। চোখের উপরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে আবার সেই ঘন জঙ্গলের সবুজ দৃশ্য! এখন আর সেই তিব্বতের বৃক্ষলতাহীন খর্ব্বাকৃতি পাহাড় নাই। সে নগ্নতার দৃশ্য পাগল-ভোলা দিগম্বরের শৈলাবাসের পাশেই হারাইয়া আসিয়াছি! গার্ব্বিয়াং পৌছিবার কিছু আগে অর্থাৎ কালাপানির নিকট হইতেই এক্ষণে এই নূতন দৃশ্য আবার সুরু হইয়াছে। যাহা হউক্, যতই আগে অগ্রসর হইয়া চলিলাম, পথগুলি যেন ক্রমশঃই লম্বা লম্বা গাছে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। সে গাছগুলি আবার সাধারণ আগাছা নহে,

একবারে 'কাল-বিছুটী'! প্রতিপদে সকল যাত্রীকেই আগে চলিতে বিলক্ষণ যন্ত্রণা দিতেছিল! মনের উৎসাহে বাটী ফিরিবার আদৌ সহায়তা করিতেছিল না। কালী-নদীর ধারে ধারে এই নদীর প্রচণ্ড গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে দুরন্ত পথ ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া বেলা তিনটা আন্দাজ সময়ে একটি ভয়াবহ দৃশ্যের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

সেই কিছু দূর বিস্তৃত পিচ্ছিলতাপূর্ণ সংকীর্ণ পথ! যাহার উপর, সংলগ্ন খাড়া পাহাড় হইতে ঝর-ঝর ধারায় বৃষ্টির মত অবিরল জলধারা পতিত হইতেছে। পাঠকবর্গের স্মরণ থকিতে পারে, আসিবার কালে সে পথ আমরা সাবধানে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। তখন এ পথে এত বেশী জল পড়ে নাই। ঘোর বর্ষায় ইহার রূপ পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতর ভাব ধারণ করিয়াছে। এখানে পা পিছ্‌লাইলে অব্যর্থ মৃত্যু! কারণ, পথের পরিসর দুই হাতের বেশী নহে। পড়িয়া গেলে একবারে পাঁচতলা-প্রমাণ নীচে কালী-নদীর করালগর্ভে ডুবিয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

প্রথমেই স্বামীজীদের মধ্যে দুই তিন জন সেই ভয়াবহ স্থানটুকু সাবধানে অতিক্রম করিয়া গেলেন। তার পর বাঁশের দোলায় বসিয়া কুলী-স্কন্ধে (প্রতি দোলার আগে ও পশ্চাতে দুইজন) স্ত্রীলোক-যাত্রী অর্থাৎ 'জীবন্ত লগেজ' পার হইয়া চলিল। তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে প্রায় আট দশ হাত অন্তরে, বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া একজন কুলী অনুসরণ করিতেছিল। অকস্মাৎ এই ভয়াবহ রাস্তার দুই দিক হইতেই চীৎকার-ধ্বনি উঠিল—'কুলী গির্ গয়া!' সকলেই হতভম্বের মত আপন আপন স্থানে দাঁড়াইয়া গেলেন। একটি দোলার বাহক তখন দিদির সহযাত্রিণীকে লইয়া পারে পৌঁছিয়াছিল, অপর দোলার বাহকদ্বয় তখন সেই পিচ্ছিলতা-পূর্ণ পথের শেষের দিকে ছিল। এই আকস্মিক 'কুলী গির্ গয়া' ধ্বনি শুনিয়াই নিমেষমধ্যে সেই জলধারা-বর্ষিত পিচ্ছিল পথের উপরে যাত্রী

অর্থাৎ আমাদের দিদিকে নামাইয়া রাখিয়া তাহারা উভয়েই সেই বিপদ্-পরিপূর্ণ পথটুকু পার হইয়া গেল। আতঙ্কে দিদি সে সময়ে আমাদের নাম ধরিয়া চীৎকার করিলেন। আমরা তখন আর আর সকলেই সেই ভয়াবহ পথের এ পারে দাঁড়াইয়া। ওদিক হইতে তৎক্ষণাৎ শঙ্করনাথ স্বামীজী দিদির নিকটে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাকী পথটুকু পার করিলেন।

এ দিকে পাঁচতলা-প্রমাণ নীচে কালী-নদীর প্রচণ্ড আবর্ত্তনের মধ্যে বোঝা পৃষ্ঠে যে কুলী নীচে পড়িল, সেখানে কাহারও যাইবার কোন দিক দিয়াই পথ নাই। অগত্যা উপর হইতেই সকলে হায় হায় করিয়া উঠিলেন! নীচে জলের উপরে স্থির-দৃষ্টি রাখিয়া দেখা গেল, পৃষ্ঠে বাঁধা বোঝা সমেত (খুলিবার উপায় ছিল না!) কুলী বেচারী প্রাণপণ শক্তিতে একবার ভাসিয়া উঠিল। প্রস্তরের কঠিন আঘাতে তখন তাহার মস্তক ও ললাটদেশ হইতে রুধির নির্গত হইয়া নদীর জলকে রক্ত-রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে! কিন্তু সে দৃশ্য কেবল এক সেকেণ্ডের জন্য! নিমেষ না যাইতেই পশ্চাৎ হইতে একটি প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া তাহাকে সেই তুষার-শীতল জলের মধ্যে কোথায় তলাইয়া দিল, কে বলিয়া দিবে! আজও তাহার সেই ক্ষণিকের রুধিরাপ্লুত মুখখানি মনে হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে!

যে কুলী নীচে পড়িল, তাহার পশ্চাতে সত্যস্বামী মহারাজ ধীরে ধীরে অতিক্রম করিতেছিলেন। কুলীর আকস্মিক পতন-দৃশ্যে তিনিও সেই জলধারা-বর্ষিত পিচ্ছিল পথে আতঙ্কে বসিয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁহার শরীরের ভার পাহাড়ের গায়েই পড়িল, নতুবা তাঁহাকেও হয় ত আমরা হারাইয়া বসিতাম!

তার পর আমরা সকলেই কৈলাসপতির নাম লইয়া, যষ্টিহস্তে ধীরে

ধীরে সে পথটুকু পায়ের উপরে লক্ষ্য রাখিয়াই একে একে পার হইলাম মাথার উপরে অজস্র ঝরণার ধারা সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিল। লম্বা ওয়াটার-প্রুফের 'আল্‌খাল্লা' সে ক্ষেত্রে ভিতরের গাত্রবস্ত্রকে আদৌ শুষ্ক রাখিতে পারে নাই।

ও-পারে আসিয়া দেখিলাম, সত্যবামী মহারাজ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তখনও বিলক্ষণ কাঁপিতেছেন। কিছুক্ষণ সেখানে নির্ব্বাক্ প্রাণহীনের মত সকলেই বসিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ বোঝা পৃষ্ঠে সকল কুলীই সে স্থানে আসিয়া জড় হইল ; কিন্তু আগে যাইবার কথায় আর তাহারা কেহই ভ্রূক্ষেপ করিতে চাহিল না। বলিল, বোঝা লইয়া তাহারা কেহই প্রাণ দিবার জন্য আসে নাই, প্রাণ লইয়া এক্ষণে রিক্তহস্তেই বাটী ফিরিয়া যাইবে।

বিপদের উপরে বিপদ! অবসর বুঝিয়া আকাশও তখন ভাঙ্গিয়া পড়িল। বর্ষার পুঞ্জীভূত কালো মেঘ হইতে অজস্র ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া আমাদিগকে সে সময়ে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। সকলেই বিষণ্ণ-চিত্ত। কৈলাস ঘুরিয়া আসিয়া আজ পর্য্যন্ত এরূপ বিপদে কেহই পড়েন নাই। তবু ত এখনও নীরপানির পাহাড় অতিক্রম করা বাকী রহিয়াছে! জানি না, সেখানে আবার নূতন কি দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। এইরূপ নানা প্রকার দুশ্চিন্তায়, শঙ্করনাথ স্বামীজীর কথামত অবশেষে দিদি ও সহযাত্রিণী দুইজনেরই হস্ত ধরিয়া পদব্রজেই তাঁহাদিগকে কিছু দূর পর্য্যন্ত আগে আগে লইয়া যাওয়া হইল। কুলী বা আমাদের সমস্ত আস্‌বাবাদি সে অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

স্বামীজী বলিলেন, কুলীদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইয়া তিনি পরে আসিতেছেন।

মালপায় পৌছিতে তখনও প্রায় মাইলখানেক বাকী আছে।

বিলম্ব করিলে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায়, আর আর সকলেই আগে চলিতে বাধ্য হইলেন। প্রায় অর্দ্ধ মাইল আগে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে কুলীগণকে ফিরিতে দেখিয়া সকলে আশ্বস্ত হইলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌ক্ষণে সে দিন আমরা সকলেই মালপায় পৌঁছিলাম।

এখানে একখানি মাত্র লম্বা চারিদিক-খোলা আটচালা, তাহাতে তৃণাচ্ছাদন থাকিলেও প্রায় সকল স্থান দিয়া উপরের আকাশ দেখা যাইতেছিল। বৃষ্টির জল পড়া তখনও তাহার মধ্য দিয়া নিবৃত্ত হয় নাই। পাঁচ ছয় জন কুলী তথাকথিত আটচালার মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া বসিয়া বসিয়া জটলা করিতেছিল। আস্‌বাব সহিত এতগুলি যাত্রীর আগমনে তাহারা কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রূক্ষেপ করিল না। এ দিকে সন্ধ্যার ঘোরে আশ্রয় লইবার জন্য যাত্রিগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। স্থান কোথায়? আট-চালাটির ঐ ত অবস্থা। তাহাও কুলীরা দখল করিয়া বসিয়া আছে। অথচ পার্শ্বে এমন কোন পরিষ্কার স্থান নাই, যেখানে তাঁবু খাটাইয়া রাত্রি-যাপনের উপায় হয়। সর্ব্বত্রই ভাঙ্‌ ও বিছুটীর মানুষ-প্রমাণ গাছগুলি জঙ্গল করিয়া রাখিয়াছে। 'সাত-পাঁচ' ভাবিয়া অনেক সাধ্যসাধনায় কুলীদিগকে ঐ আটচালারই একটা দিক ছাড়িয়া দিতে রাজী করাইয়া সেই স্থান-টুকুর মধ্যে সকলেই বসিয়া রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হইলেন। আস্‌বাবপত্র বাঁধা অবস্থায় বাহিরে পড়িয়া রহিল। কেবল বৃষ্টির জল হইতে কতকটা বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে ইহাদের উপরে তাঁবুগুলি বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সমস্ত দিনের মধ্যে কাহারও অন্নাহার জুটিল না। কিছু কিছু শুষ্কাহার অর্থাৎ আখরোট্‌, কিস্‌মিস্‌ ও মিছরী মাত্র সে দিন জলযোগ করিয়া বিনা নিদ্রায় রাত্রি কাটান হইল। সঙ্গের কুলীরা স্থানাভাবে পাহাড়ের উপরের একটা পাথরের আড়ে (কতকটা গুহার আকারে) সে দিন স্থান পাইয়াছিল।

রাত্রিতে এই আটচালার কুলীদিগের নিকটে আগে যাইবার রাস্তা সম্বন্ধে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, এই সকল আস্‌বাব ও স্ত্রীলোক-যাত্রী সঙ্গে লইয়া প্রত্যূষেই যাত্রা করিতে না পারিলে সন্ধ্যার মধ্যে গালায় (পরের গ্রামে) পৌছান কিছুতেই সম্ভব নহে। মাঝের রাস্তা অপেক্ষা উপরের রাস্তা দিয়াই তাহারা আমাদিগকে যাইবার পরামর্শ দিল। সে রাস্তাতেও বড় সাংঘাতিক জঙ্গল হইয়া আছে। বলা বাহুল্য, সরকার-পক্ষ হইতে উপরের সেই পুরাতন লোক-চলাচল-হীন রাস্তার জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্যই এই কুলীরা এখন নিযুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং রাস্তার সংবাদ যে ইহারা ভাল করিয়াই অবগত আছে, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

এ দিকে পথিমধ্যে যে কুলী পড়িয়া গিয়া অকস্মাৎ ডুবিয়া মরিল, সে দেশের আইনানুযায়ী এ সংবাদ প্রথমেই স্থানীয় পাটোয়ারীকে জানানো আবশ্যক; নতুবা সকলকেই দোষী হইতে হইবে। এই সব ভাবিয়া কুলী-সর্দ্দার প্রধান পরদিন প্রভাতে কুলী লইয়া আমাদের সহিত আগে যাইতে আপত্তি করিল। বলিল, পাটোয়ারীকে মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাত করিয়া মৃত্যুসম্বন্ধে তদন্ত শেষ হইলে তার পর যাত্রা করাই সমীচীন। সে এখনও এক সপ্তাহের জের। কারণ, পাটোয়ারীর গ্রাম এখান হইতে বহু দূরে। তাহাকে খবর দিয়া আনাইয়া তদন্ত শেষ করিতে গেলে, এই দারুণ বর্ষায় বিছুটী-জঙ্গলের মধ্যে বিনা আশ্রয়ে সকলকেই বিশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। অনেক ভাবিয়া শেষ সিদ্ধান্ত হইল, কুলীর পড়িয়া যাওয়ার যথাযথ ইতিবৃত্ত জানাইয়া দুইখানি পত্র লেখা হউক্। সে পত্র একখানি পাটোয়ারীকে ও অপরখানি গার্ব্বিয়াংএর পোষ্টমাষ্টার মহাশয়কে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিয়া ডাকহরকরা মারফত পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পত্রে ইহাও লিখিত হইয়াছিল—"স্থানাভাবে স্ত্রীলোক-যাত্রীদের লইয়া আমরা এখানে

বড়ই ক্লেশভোগ করিতেছি, এজন্য কুলী প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া আগে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইলাম। যদি কিছু তদন্তের আবশ্যক হয়, তবে ধারচুলায় আমাদিগকে পাইবেন, ইত্যাদি।" পত্রে শঙ্করনাথজী নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া প্রধানকে নানাপ্রকারে অভয় দিয়া প্রভাতে আটটার মধ্যেই যাত্রা করা হইল।

সাধারণতঃ মালপা হইতে গালা প্রায় আট মাইল হইবে, কিন্তু পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উপরের রাস্তায় সাত মাইল আন্দাজ পাহাড়ের চড়াই 'ফের' দিয়া গালায় পৌঁছিতে আরও অনেকটা পথ অতিরিক্ত যাইতে হইবে। বিশেষতঃ এই চড়াই-পথের অবস্থা অতি সাংঘাতিক জানিয়া, এ দিনেও যাত্রার পূর্ব্বে অন্নাদি তৈয়ার করিয়া আহার করিবার আদৌ অবসর পাওয়া গেল না। কি জানি, সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামে পৌঁছিতে না পারিলে নীরপানি অর্থাৎ জলহীন পাহাড়ের উপরে জঙ্গলের মাঝখানে রাত্রিবাস করা একবারেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা সে দিন সকলেই কিছু কিছু শুষ্ক খাদ্য সঙ্গে রাখিয়াছিলাম।

এইবার নীরপানির ইতিবৃত্ত।—কালী-নদীর ধারে ধারে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই আমরা আমাদের পুরাতন পথ ছাড়িতে বাধ্য হইলাম। এবারকার পথ আমাদের দক্ষিণ ভাগে পাহাড়ের গা দিয়াই ক্রমশঃ উপরে উঠিতে সুরু হইল। ইহার চড়াই (১নং) প্রায় দুই মাইল হইবে। প্রথমটা এ পথ সাধারণ চড়াইয়ের মত হইলেও শেষের দিকে আঁকিয়া-বাঁকিয়া ঘুরিয়া কখনও উপরে, কখনও বা ক্রমশঃ নীচে নামিয়া গিয়াছে। সেখানকার বিশেষত্ব এই যে, নীচে নামিবার কালে পাহাড়ের গায়ে গায়ে স্থানে স্থানে উঁচু-নীচু পিচ্ছিল মাটার উপরে "পাকৃডাণ্ডি" বা সরু বনপথে কেবল গুচ্ছ গুচ্ছ লম্বা ঘাসের ঘন-সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া গেল। সে স্থানগুলি অতিক্রমকালে বরাবর আমাদের হস্তস্থিত লম্বা যষ্টিগুলি যেমন

সাহায্য করিয়া আসিতেছে, তাহার সহিত এই ঘাসের গুচ্ছগুলিও আঁকড়াইয়া ধরিয়া এই সকল পিচ্ছিল স্থানে সাবধানে নামিতে হইয়াছিল। তার পর কোথায়ও নিম্নভূমিতে বড় বড় প্রস্তরখণ্ডের সমষ্টি কিছু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে পড়িয়া থাকায়, প্রকৃতপক্ষে সেখানে রাস্তার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সে সকল স্থানে কুলীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলেই অনুসরণ করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছি। বাঁশের দোলার স্ত্রীলোক-যাত্রিদ্বয়কে দোলা হইতে সেখানে নামাইয়া দিয়া, এক একটি বলিষ্ঠ কুলীর পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া, বালককে লইয়া যাওয়ার মত পার করিতে হইয়াছিল।

কিছুক্ষণ এইরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া আবার সেই পাহাড়-সংলগ্ন সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইতেই সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড খাড়া পাহাড় চোখে পড়িল। এখানে আমাদের সংকীর্ণ রাস্তাটিও শেষ হইয়া গিয়াছে। কোণের দিকে একটি ঝরণার ক্ষীণ ধারা ঝির্-ঝির্ রবে নামিতে দেখিয়া সকলেই এখানে কিছু কিছু জলযোগ করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলেন। ইহার পরে কোথায়ও জল পাওয়া যাইবে না, এ কথা কুলী-গণ সকলকে জানাইয়া দিল।

এই সম্মুখের খাড়া পাহাড়ের ধারে ধারে, লম্বা লম্বা ঘাসগুচ্ছের মধ্য দিয়া যে পাকডাণ্ডি বা বনপথ চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে "মাঝের রাস্তা" বলা হয়। এ পথ বেশী সাংঘাতিক, কারণ বর্ষায় পিচ্ছিলতা-নিবন্ধন এ পথে পদে পদে নীচে পড়িয়া যাইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা থাকে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যাত্রী অর্থাৎ ডাক্তারের দল এই পথে গিয়াই বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। আর একটি পথ এই পাহাড়ের মধ্যস্থল দিয়া খাড়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। তাহাই হইল "উপরের রাস্তা"—আমাদের আগে যাইবার নির্দ্দিষ্ট পথ।

পথ ত বলিলাম, কিন্তু সে পথে উঠিবার পূর্ব্বে পাঠকবর্গকে একবার ইহার অবস্থা জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশের গ্রাম্য অঞ্চলে রাস্তার ধারে ধারে কখনও কখনও যেরূপ কচু-গাছের ঘন জঙ্গল চোখে পড়ে, এই প্রকাণ্ড পাহাড়টি সেইরূপে সর্ব্বত্রই ঢাকিয়া জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। তবে তাহাতে কচু-গাছের পরিবর্ত্তে কেবল বিস্তর আগাছাই দেখা যায়। এই জঙ্গলের মধ্যস্থলে একটু প্রখর দৃষ্টি দিলেই (হঠাৎ নজরে পড়ে না) খানিকটা দূর পর্য্যন্ত কতকগুলি আগাছা কাটা অবস্থায় পাহাড়ের গায়েই পড়িয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই কাটা গাছগুলিই আমাদের পথের চিহ্নরূপে বরাবর উপরে লইয়া চলিল। এই কাটা আগাছার মধ্যে খাড়া উঁচু পাহাড়ে পা ফেলিয়া উপরে উঠিতে যাত্রিগণ বিলক্ষণ প্রমাদ গণিলেন। অবসর বুঝিয়া প্রতি পদক্ষেপেই জোঁকের উপদ্রবে সকলেরই পা ক্ষত-বিক্ষত হইল। এ চড়াইটুকুও (২নং) বড় সামান্য পথ নহে, প্রায় তিন মাইল হইবে। এই আগাছা-ঢাকা চড়াইয়ের মধ্যে অনেকেই যথাস্থানে পা রাখিতে না পারিয়া, মুখ গুঁজিয়া কয়েকবার আছাড় খাইলেন। বলা বাহুল্য, একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ নাই। সকলেই শশব্যস্ত; সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামে পৌঁছান চাই-ই। অনেক কষ্টে এই চড়াই শেষ করিয়া, বেলা তিনটা আন্দাজ সময়ে পাহাড়ের ধার দিয়া খানিকটা সংকীর্ণ পথ চলিল। সে পথের পরিসর দেড় হাতের বেশী নহে। আবার দুই তিন স্থানে এইরূপ সংকীর্ণ পথ পাহাড়ের গায়ে তৈয়ার করিতে না পারিয়া, ইহারই গাত্র-সংলগ্ন শূন্যের উপরে একদিক হইতে অপরদিকে লম্বা লম্বা চীর-গাছের গুঁড়ি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তদুপরি প্রস্তরখণ্ড বিছাইয়া আগের রাস্তার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। সে সকল স্থানে একটু অসাবধানে পা দিলেই প্রস্তর খসিয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য,

সেই সঙ্গে পথিকেরও জীবন রসাতলে গিয়া পৌঁছায়! যাহা হউক্, সকলেই খুব সাবধানতার সহিত কিছু দূর আগে গিয়া মনে করিলেন, এইবার বুঝি উত্‌রাই-পথ আরম্ভ হইবে। কিন্তু হায়! এ উত্‌রাই তখন কত দূরে, কে বলিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবে? এই দুইটি চড়াই শেষ করিতে প্রায় পাঁচ মাইল পথ আসা হইল। শরীর ইতঃমধ্যেই বিলক্ষণ শ্রান্ত-ক্লান্ত, গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও মুখ দিয়া তখন আর স্ফূর্ত্তির বাক্ নিঃসরণ হইতেছিল না। অপরাহ্ণ চারিটা বাজিতে চলিল। উত্‌রাইয়ের পরিবর্ত্তে এক ভীষণ জঙ্গলাবৃত উচ্চ পাহাড় সম্মুখে পড়িতে দেখিয়া অনেকেই এবারে চক্ষুতে অন্ধকার দেখিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এ পাহাড়ের অতিক্রম শেষ করা সহজসাধ্য নহে। কুলীরা স্ত্রীলোক-যাত্রী ও বোঝা স্কন্ধে লইয়া আগেই অগ্রসর হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। স্বামীজীর দল এই ভয়ঙ্কর চড়াই (৩নং) দ্রুত শেষ করিবার পরামর্শ দিয়া, ক্রমশঃই সে জঙ্গলের মাঝখানে অন্তর্হিত হইলেন। উত্তরপাড়ার দল ও আমি সকলের পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছি। কেবল কালিকানন্দজী এই দলটির সাথী হইয়া সাহস দিতে দিতে আমাদিগকে আগে লইয়া যাইতেছিলেন। যতই উপরে উঠিয়া যাইতেছিলাম, পথ ততই অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। মনুষ্য-চলাচলহীন বন, এ পথে কেহ যদি একটু আগে গিয়া পড়েন, তখন আর জঙ্গলের মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন হইয়া উঠে।

উত্তরপাড়ার দলের গতি খুবই ধীর দেখিয়া আমি একাকীই এক্ষণে উপরে উঠিয়া চলিতেছি। মধ্যপথে গিয়া পথ আর লক্ষ্য না হওয়ায় মুস্কিলে পড়িলাম। কালিকানন্দজীর হস্তে একটি বাঁশী ছিল। আমি আগে চলিয়া আসিবার সময়ে, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি যাহাতে বাঁশীর শব্দে কতদূরে আছেন মধ্যে মধ্যে জানাইতে পারেন, এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। রাস্তার ঠিক না পাওয়ায়

আমি সেই জঙ্গলে দুই তিনবার উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে বাধ্য হইলাম। দূর হইতে (বহু নীচে) তদুত্তরে বাঁশীর শব্দ শুনিয়া তাঁহাদের আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে মনে করিয়া, অগত্যা অনুমানের উপরেই সেই জঙ্গলের অস্পষ্ট রাস্তা ধরিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে সেই পাহাড়ের শিখরদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এই ৩নং চড়াই প্রায় দেড় মাইল আন্দাজ হইবে। ইহার উপরেও ২নং চড়াইয়ের জঙ্গল অপেক্ষা বেশী উচ্চ ও ঘন জঙ্গল দৃষ্টিগোচর হইল। তবে এখানে জলের একবারেই অভাব। জলাভাবে এ জঙ্গলে বোধ হয় জীবজন্তুর অস্তিত্ব না থাকিতে পারে, এই প্রকারে নিজেই নিজের মনে ভরসা আনিতেছিলাম। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, অন্তর নিয়তই ধুক্-ধুক্ করিয়া উঠিতেছিল। আশে-পাশে কোন গাছ একসঙ্গে নড়িয়া উঠিতেছে কি না, আগে যাইবার কালে চক্ষু দুটি সে দিকেও বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিতেছিল। ক্ষেত্র হিসাবে ধরিতে গেলে এই জঙ্গলের মাঝে সে সময়ে আমি একা (কাহারও কোনদিকে সাড়া না পাওয়ায়) জন্তুর মতই (?) সংকীর্ণ বনপথ ধরিয়া কিছু দূর আগে চলিলাম। পায়ের অবস্থা সাংঘাতিক, সর্ব্বত্রই জেঁাকের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত, হাঁটুতে আদৌ বল নাই, অথচ এ অবস্থায় আরও কত দূরে গিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিব, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, অসহায়ের মত এক স্থানে বসিয়া পড়িলাম।

এ যাবৎ এত চড়াই অতিক্রম করিয়া কৈলাস পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিলাম, কিন্তু একদিনের জন্যও ত এরূপ ভীষণ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় নাই। তবে এতদূর কাতর হইবার কারণ কি ? প্রথমতঃ, কোন পাহাড়েই এরূপ খাড়া পাহাড় ধরিয়া সোজা উপরে উঠিতে হয় নাই। তার উপর, অন্য পাহাড়ের গমনোপযোগী রাস্তার মত ইহার রাস্তাও তৈয়ারী নাই বলিলে হয়। এ জন্য উপরে উঠিতে কোন স্থানে অল্প উঁচু, আবার

কোথাও বা বেশী উঁচুতে পা দিয়া অস্বাভাবিকভাবে জোর দিতে হইয়াছিল। আরও এক কথা, সেটি প্রকৃতই স্বাভাবিক। সুতরাং প্রকাশে লজ্জার কারণ দেখি না। সমতল-দেশবাসী বাঙ্গালীর প্রাণ! পোড়া পেট কয় দিন আসল খাদ্যের অভাব সহ্য করিতে পারে? "তেলে-জলে স্নান" ও "দুটি ঝর্‌ঝরে ভাতে"র অভাব প্রতিদিনই অনুভব করিয়া আসিতেছি। একে পূর্ব্বদিনের রাত্রি বসিয়া বসিয়া অনিদ্রায় কাটাইতে হইয়াছে, তার উপরে দুই দিন কেবল শুষ্ক খাদ্য চর্ব্বণ করিয়াই আজ সমস্ত দিন নিরন্তর পাহাড়ের এই দুরন্ত চড়াই উঠিয়া আসিতেছি, এ অবস্থায় শরীর যে বরাবর একই ভাবে পাহাড়ের মত ঠিক থাকিবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবে অবস্থাবিশেষে তখন প্রাণের মায়াও পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অল্পক্ষণমাত্র বসিয়াই আবার উঠিতে বাধ্য হইলাম। ধীরে ধীরে সংকীর্ণ পথ ধরিয়া এই পাহাড়ের কতকটা কোণে আসিয়া বাঁকের মুখে হঠাৎ আমাদের শঙ্করনাথ ও সত্যনাথ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

জল বিনা তখন আমার জিহ্বা ত দূরের কথা, বুক পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের হাতে এনামেলের জগে ভরা মানসের জল ছিল। বাধ্য হইয়া তৃষ্ণার কথা প্রকাশ করিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা আর বিন্দুমাত্র আপত্তি জানাইতে পারিলেন না। সেই স্বচ্ছ-শীতল মানসের জলে তৃষ্ণা দূর করিলাম এবং কতকটা জল চোখে ও মস্তকে সেচন করিয়া তাঁহাদের সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম।

এইবার এতক্ষণে উত্‌রাইয়ে আসিয়া পড়িলাম। চড়াই পথের তুলনায় এ পথ শীঘ্র শীঘ্র নামিতে পারা যাইবে, এই ধারণায় তিনজনেই দ্রুত নামিয়া চলিলাম। দুঃখের বিষয়, কিছু দূর গিয়াই বড় বড় গুচ্ছ

গুচ্ছ ঘাসবনে এবং স্থানে স্থানে মানুষ-প্রমাণ আগাছার জঙ্গলে এ পথও একবারে ঢাকিয়া গেল! রাস্তা খুঁজিয়া লইতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইল। রাস্তায় অধিকাংশ স্থানে কেবলই প্রস্তরখণ্ডের সমষ্টি। অলক্ষ্যে পা ফেলিতে গিয়া, প্রস্তর সহ দুই চারিবার গড়াইয়া পড়িলাম। ঘাসের গুচ্ছ সে সকল স্থলে বেশী আঘাত হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছিল। এই ভাবে প্রায় তিন মাইল পথ আসিয়া দূরে নীচে আমাদেরই একটি কুলীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অন্তরে অন্তরে সকলেই ভরসা পাইলাম। তাহার হাতে বড় টর্চ্চলাইট্‌টি ছিল। রাত্রি হইলে পথিমধ্যে বিপদ হইতে পারে মনে করিয়া আমাদেরই জন্য উহা প্রেরিত হইয়াছে, বুঝিতে বাকী রহিল না।

এ দিকে উত্তরপাড়া-দলের তখনও পর্য্যন্ত সাড়াশব্দ নাই। বলা বাহুল্য, তাঁহারা তখন আমাদের অনেক পশ্চাতে। টর্চ্চলাইট্ হাতে পাইয়া শঙ্করনাথজী আমাকে বলিলেন, "আপনি কুলীর সহিত আগে অগ্রসর হউন্, আমরা একটু উপরে গিয়া উত্তরপাড়া-দলের সন্ধান করিয়া দেখি।"

আমার শরীরের অবস্থা তখন কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, "সে দিন আমার পুনর্জীবনলাভ ঘটিয়াছে।" কুলীর সহিত কিছু দূর নামিয়া গিয়াই গালায় প্রবেশ করিলাম।

প্রভাতে আটটার মধ্যে বাহির হইয়াছিলাম, রাত্রি আটটায় গালায় পৌঁছিয়াছি। দিদি এবং অন্যান্য কয়েকজন সহযাত্রী প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্বে পৌঁছিয়া আমার পক্ষে এইটুকু সুবিধা হইয়াছিল যে, হাত-মুখ ধুইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, তৈয়ারী আহার সম্মুখেই উপস্থিত পাইলাম। বিশেষ, আহারে এবার একটু নূতনত্ব ছিল। কারণ, এত দিনে দুষ্প্রাপ্য আলুর তরকারী দেখিতে পাওয়া গেল। ভোজনকালে সকলের মুখেই কেবল সেই একই

অর্থাৎ রাস্তার দুর্দ্দশার কথা আলোচিত হইতেছিল। উত্তরপাড়া-দলের তখনও পর্য্যন্ত সাড়াশব্দ না পাওয়ায়, সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িতে-ছিলেন। তবে ভরসা এই, তাঁহাদের সহিত কালিকানন্দজী আছেন এবং শঙ্করনাথ ও সত্যনাথজীও এক্ষণে আলো লইয়া গিয়াছেন।

রাত্রি দশটা আন্দাজ সময়ে শঙ্করনাথ স্বামীজী সকলকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের প্রমুখাৎ শুনা গেল, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অবস্থা অতীব শোচনীয়। ৩নং চড়াইএর উপরে আসিয়া তিনি দীর্ঘদেহ লইয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। সঙ্গীদের নিরন্তর সান্ত্বনাবাক্য দেওয়া সত্ত্বেও কিছুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মুখ হইতে তখন এই কথাই কেবল ব্যক্ত হইয়াছিল, "সকলে মিলিয়া আমাকে নীচে ফেলিয়া দিয়া আপনারা চলিয়া যান।" আর ধীরগামী গঙ্গাধর ঘোষের অবস্থাও সহজ ছিল না, এদিনকার চড়াই-উত্রাই-পথে তিনি গণিয়া পঁচিশবার মাত্র আছাড় খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

পাঠকগণ! এই নীরপানি পাহাড়ের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে সে দিনের সাথী এই স্বামীজীদের অমানুষোচিত কষ্টসহিষ্ণুতার কথা পুনঃ পুনঃ মনে আসিয়া পড়ে। সেদিনকার সম্মুখ-বিপদে ইঁহাদের সহায়তা না পাইলে হয় ত এ কাহিনী আজ সকলের সমক্ষে অন্যরূপেই প্রকাশ হইতে বাধ্য হইত।

পরদিন অর্থাৎ ৮ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার প্রভাতে আটটা আন্দাজ সময়ে গালা হইতে রওনা হইলাম। নীরপানি পার হইবার পর হইতে মনের বোঝা বা চিন্তা এক প্রকার হাল্কা হইয়াই গিয়াছে। এক্ষণে শুধু ধারচুলায় কতক্ষণে পৌছিব, এই চিন্তা মনের কোণে উঁকি মারিতেছিল। সামখেলা অতিক্রম করিয়া, চড়াই-উত্রাই পার হইয়া সে দিন বেলা চারিটা আন্দাজ সময়ে সিরদাংএ উপস্থিত হইলাম। স্থানীয় স্কুলবাড়ীতে

এবারে সকলেই আশ্রয় লইলেন। রাত্রিকালে সে দিন ঘৃত-সংযোগে 'খিচুড়ী' ও আলু-কুমড়া সংগ্রহ হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে বলিতে কি, তাহার সহিত এই নূতন (?) তরকারীর আস্বাদ আনন্দের সহিত সকলে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরদিন ভোর ছয়টার মধ্যেই সিরদাং ছাড়িয়া দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই পঙ্গুর ভয়ঙ্কর উত্‌রাই (আসিবার কালে চড়াই ছিল) শেষ করিলাম। হিমালয়ের দুরন্ত শীত এখান হইতেই কমিয়া গেল। মনে হইল, পঙ্গুর অত্যুচ্চ পাহাড়টি যেন ওপারের শীতের দেশ ও 'কন্‌কনে' হাওয়াকে একবারে আড়াল করিয়াই দিয়াছে। দিনের বেলা 'সোয়েটার' গায়ে দেওয়া এখান হইতেই বন্ধ হইল। উত্‌রাইয়ে নামিয়া এক স্থানে বহু উচ্চ হইতে ঝরণার ধারা পড়িতে দেখিয়া সেখানে আজ বহুদিন পরে রীতিমত স্নান ও কিছু জলযোগ সারিয়া লইলাম। তার পর মাইলখানেক খেলার চড়াই শেষ করিয়া, কালী-নদীর ধারে ধারে সমতল ভূমি দিয়া (কারণ, সে দিন চড়াই ছিল না) সন্ধ্যা নাগাইদ ধারচুলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মধ্যে জুম্মার নিকটে (যেখানে কুলীদের আড্ডা) এক স্থলে দুটি অন্ন তৈয়ার করিয়া খাওয়া হইয়াছিল। দেখিলাম, এই ধারচুলা-তক সমতল রাস্তার মধ্যে, বর্ষার প্রাবল্যে অনেক স্থানেই নূতন ঝরণার সৃষ্টি হইয়াছে, কতক স্থানে বা কিছু কিছু ধ্বসিয়াও গিয়াছে। বিশেষ পরিবর্ত্তনের মধ্যে, পথের দুই পার্শ্বেই মানুষ-প্রমাণ ভাঙ্‌ ও বিছুটী গাছ জঙ্গল করিয়া থাকায়, অনেক স্থলেই রাস্তা অতিক্রম করিতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, তপোবনের স্বামী অনুভবানন্দজী আমাদের আগমনে খুবই আনন্দিত হইলেন। সকলের কুশল-প্রশ্নাদির পরে আবার সেই ক্ষীরপানির মাঝের রাস্তার দুর্দ্দশার কথা তাঁহার মুখে ব্যক্ত হইল।

আমরাও তৎপরিবর্ত্তে উপরের রাস্তার ইতিবৃত্ত জানাইয়া পাল্টা জবাব দিলাম! তিনি বলিলেন, "তবু ত আপনারা সৌভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে বৃষ্টি পান নাই।" তাঁহারা বৃষ্টি পাইয়া পিচ্ছিলতার দরুণ কিরূপ বিপদ্‌ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা মালপায় উপস্থিতকালে তাঁহার পত্রেই উক্ত হইয়াছে। বৃষ্টির কথা শুনিয়া তখন মনে হইল, নীরপানির উপরের আগাছা-ঢাকা খাড়া চড়াইয়ের মধ্যে আবার বৃষ্টির উপদ্রব হইলে কখনই আমরা সে দিন গালায় পৌঁছিতে পারিতাম না। এজন্য মনে মনে কৈলাসপতিকে সে সময়ে বিলক্ষণ ধন্যবাদ দিলাম। যাহা হউক্, সেদিনকার একটি শোচনীয় ঘটনায় স্বামীজী বিশেষভাবে মর্ম্মাহত হইলেন। পড়িয়া গিয়া সেই কুলীর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ! যদিও সে কুলীর সহিত আমাদের সহযাত্রী জনকয়েকের কিছু কিছু ধাতুদ্রব্য অর্থাৎ থালা-ঘটী-গেলাস ইত্যাদি কালী-নদীর করাল গর্ভে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু মানুষের জীবনের মূল্যের সহিত তাহার আদৌ তুলনা করা যায় না।

একে একে সকল কুলীই বোঝা লইয়া তপোবনে উপস্থিত হইল' তার পর সেই মৃত কুলীর উদ্দেশে তাহাদের ক্রন্দনোচ্ছ্বাস! বিশেষ যখন জানা গেল, সেই কুলীটি তাহার অন্ধ পিতা-মাতার একমাত্র অবলম্বন ছিল এবং তাহার অভাবে এক্ষণে অন্ধের কি দুর্দ্দশাই না ভোগ করিতে হইবে! এইরূপ করুণ-উক্তিতে আমরা কেহই সে সময়ে স্থির থাকিতে পারি নাই। পুত্র-হারা পিতা-মাতার সাহায্যের জন্য সকলে মিলিয়া কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া মৃত কুলীর উদ্দেশে মোট দশটি টাকা আমরা অতিরিক্ত খরচ করিলাম। কুলীদিগকে আপন আপন প্রাপ্য মজুরী ও কিছু কিছু বখশিশ্ দিয়া বিদায় করিয়া আমাদের পান সিং চাকর অর্থাৎ গার্ব্বিয়াং হইতে যে চাকর নিযুক্ত হইয়া কৈলাস ঘুরিয়া ধারচুলায় ফিরিয়া আসিল, সে দিন পর্য্যন্ত তাহার এক মাসের মাহিনা

কুড়ি টাকা চুক্তি দিলাম। তার পর সুখে, দুঃখে, গল্প-গুজবে সে দিনকার রাত্রি বেশ কাটিয়া গেল!

পরদিনও আগে যাইবার কুলী ঠিক করিতে ধারচুলায় থাকিতে হইল। রুমা দেবী তখন আলমোড়ায় ছিলেন। তিনি না থাকিলেও আশ্রমের স্বামীজী এবং ডাক্তার পালধি মহাশয় আমাদের আদর-আপ্যায়নে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত। কোথায় পাকা আম, (আমাদের দেশে এ সময়ে দুষ্প্রাপ্য) অরুচির মুখে রুচির বস্তু নূতন নূতন তরকারী সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। এ দিকে উত্তরপাড়ার দল এবং স্বামীজীর দল ধারচুলায় কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া যাইবেন, স্থির হইল। বিশেষভাবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর বিলক্ষণ কাতর থাকায়, তিনি এক্ষণে বিশ্রামের পক্ষপাতী হইয়াছেন। আমরা কিন্তু আর এক দিনও এখানে থাকিতে ইচ্ছুক নহি। আমাদের দেখাদেখি উত্তরপাড়া-দলের কেবলমাত্র ঘোষ মহাশয় এবং পাবনার রায় মহাশয় আমাদেরই সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তদনুযায়ী মোট ষোলটি কুলীর আবশ্যক দেখা গেল।

পাঠকগণের স্মরণ আছে, আলমোড়া হইতে আসিবার কালে দিদির ডাণ্ডিখানি পথিমধ্যে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কুলীর দ্বারা তাহা আলমোড়ার দোকানে ফেরত দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে কেবল তাঁহার সহযাত্রিণীর ডাণ্ডিখানিই মাত্র মজুত। তাহাতে দুইজনের যাওয়া কোনমতেই সম্ভব নহে। অগত্যা স্ত্রীলোক-যাত্রিণীদ্বয়কে পূর্ব্বের মত বাঁশের দোলায় যাইতেই বাধ্য করা হইল। প্রত্যেক দোলা পিছু পাঁচজন হিসাবে মোট দশজন কুলী এবং বাকী ছয়জন আমাদের বোঝা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। এইরূপ স্থির করিয়া সর্ব্বসমেত সাত জনে আমরা পরদিন অর্থাৎ ১১ই আগষ্ট, রবিবার আহারান্তে ধারচুলা পরিত্যাগ করিলাম।

যাইবার পূর্ব্বে কৈলাস-যাত্রীর যাত্রা-পথে বিশ্রাম-স্থল এই মিশনের 'তপোবনে'র উন্নতিকল্পে এবং সাধুসেবার জন্য, শক্তি-অনুসারে সকলেই কিছু কিছু সাহায্য করিয়া স্বামীজীদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রত্যেক কুলীর প্রতিদিনের মজুরী এক টাকা হিসাবে স্থির হইল। পুরাতন ডাণ্ডিখানি আশ্রমের কাজে লাগিতে পারে, এই ভাবিয়া বলা বাহুল্য, সেইখানেই রাখিয়া আসা হইয়াছিল।

বেলা সাড়ে তিনটা আন্দাজ সময়ে বাহির হইয়া, প্রায় দশ মাইল দূরে "সর্‌সম্‌" নামক স্থানে একটি ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে জনৈক ভুটিয়ার ঘরসংলগ্ন ছোট বারান্দায় এদিনে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। ওখানেই সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। দারুণ বর্ষায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া খোলা বারান্দাটুকুতে বসিয়া কাটাইতে হইল। ঘরের মালিক ঘরখানিতে চাবিবন্ধ করিয়া ব্যবসায়ার্থ উপরে চলিয়া গিয়াছিল। ভূপ সিং এই ক্ষেত হইতে কেবল ভুট্টাসংগ্রহে যথেষ্টই চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ভিজা কাষ্ঠের জন্য তাহার মনের আশা পূর্ণ হয় নাই। আসিবার কালে পথিমধ্যে "কালিকা" নামক স্থানে আমাদের পুরাতন কৈলাস-সহযাত্রী আলমোড়ার পেস্কার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তিনি নির্ব্বিঘ্নে কৈলাস ঘুরিয়া বাটী ফিরিতেছেন।

পরদিন প্রভাতে মাথার উপরে অজস্র বৃষ্টিপাত অগ্রাহ্য করিয়া নয় মাইল দূরে কালী ও গৌরী নদীর সঙ্গমস্থল জোলজুবীতে দ্বিপ্রহরে উপস্থিত হইলাম। এখানকার ব্রহ্মচারীর আশ্রমটিতে সকলেই ভোজনাদি সম্পন্ন করিলেন। এ আশ্রমটি অতীব রমণীয় স্থান, দেখিবার মত বটে! চারিদিকেই ঘনসন্নিবিষ্ট আম্রবৃক্ষের ছায়া। মধ্যস্থলে প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর শিবমন্দির। মন্দিরের চতুর্দ্দিকেই সংলগ্ন বারান্দা। অনেকগুলি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের শ্লোক ইহার গাত্রে লিখিত রহিয়াছে। এই ব্রহ্মচারীর নাম

"খড়্গদেব।" ইঁহার যত্নে ও পরিশ্রমে আশ্রমটির চতুর্দ্দিকই বেশ ঝর্ঝরে ও পরিষ্কার। নীচে কালী ও গৌরী-নদী আশ্রমটিকে 'বেড়' দিয়া কুলুকুলু-নিনাদে প্রবাহিত হইতেছে। এখানে আমাদের আগমনে ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রত্যেককেই চারি পাঁচটি করিয়া গাছের সুমিষ্ট আম্রপ্রদানে প্রথমে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক্, অবশেষে মন্দিরে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া আমরা ভোজনান্তে এইবার গৌরী-নদীর ধারে ধারে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া চলিলাম। তাহার পর ইহার পুল পার হইয়াই আস্কোটের কঠিন চড়াই (আসিবার কালে উত্‌রাই ছিল) অতিক্রম শেষ করিয়া সন্ধ্যা নাগাইদ সেই গ্রামের মধ্যে নবনির্ম্মিত ধর্ম্মশালায় আসিয়া আবার উপস্থিত হইলাম।

ঘোড়া পাওয়ায় এখানে কুলীদিগকে বিদায় দেওয়া হইল। ইহারা বোঝা লইয়া আমাদের সাথে সাথে সময়ে আসিতে বড়ই গোলযোগ বাধাইতেছিল। দুই দিনের মজুরী প্রত্যেককে দুই টাকা হিসাবে চুক্তি করিয়া ঘোড়াওয়ালার সহিত ভাড়া-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা স্থির হইল। প্রত্যেক সওয়ারী ঘোড়া আলমোড়া-তক পৌঁছিয়া দিতে কুড়ি টাকা এবং ভারবাহী প্রত্যেক অশ্বতর চৌদ্দ টাকা হিসাবে মজুরী গ্রহণ করিবে।

রাজওয়ারা সাহেবের নিকট হইতে আবার এখানে খাদ্যদ্রব্যের 'ভেট' আসিল। এবারে তিনি শুধু 'ভেট' দিয়া পরিতুষ্ট নহেন, নিজের পুত্রকেই ধর্ম্মশালায় পাঠাইয়া দিয়া অনুরোধ জানাইলেন যে, আকাশের এরূপ দুর্য্যোগে দুইদিন বিশ্রাম করিয়া তবে যেন এ স্থান পরিত্যাগ করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের মনের দুর্য্যোগের কাছে তখন আকাশের দুর্য্যোগ কিছুই নহে, তাই পরদিন তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া বেলা দশটার মধ্যেই আহারাদি শেষ করিয়া আগে রওনা হইলাম।

এত দূরে আসিয়া স্ত্রীলোকেরা আবার সওয়ার হইলেন। দুই তিনবার

সওয়ার হওয়ায়, তাঁহাদের এক্ষণে অবশ্যই কিছু সাহস জন্মিয়া থাকিবে। প্রথমেই সাত মাইল দূরে ডাণ্ডির হাট বেলা একটার মধ্যেই শেষ করিয়া এ দিনে ক্রমশঃ আরও দশ মাইল পথ দ্রুত চলিয়া আসা হইল। তবে শেষের দিকে এ পথে প্রায় চারি মাইল খাড়া উত্‌রাই নামিয়া থলে পৌঁছিতে সকলেই বিশেষ বেগ পাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ বর্ষার উপদ্রবে সওয়ার-যাত্রীদের ক্লেশের সীমা ছিল না। উত্‌রাই-পথে ঘোড়া হইতে নামিয়া পদব্রজেই টর্চ্চলাইট্ সাহায্যে থলে আসিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। কেবল আমরা জনকয়েক সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারিয়াছিলাম।

এখানে একটি দোকান-ঘরের উপরে দ্বিতলে রাত্রিবাস করা হইল। পরদিনে আবার আহারাদি সম্পন্ন করিয়া বেলা নয়টা আন্দাজ সময়ে রওনা হইলাম। প্রথমেই রামগঙ্গা নদীর পুল পার হইয়া, নদীর ধারে ধারে তিন মাইল আন্দাজ চলিয়া আসিলাম। তার পর বেলা এগারোটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত প্রায় সাত মাইল ক্রমশঃ চড়াই অতিক্রম করিয়া বেরীনাগে উপস্থিত হই এবং সেখান হইতে প্রায় চারি মাইল আরও আগে নামিয়া এ দিনে গাদিগাড়ে আসিয়া আশ্রয় লওয়া হয়।

পরদিন প্রভাতে নয়টার মধ্যে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া যাত্রা করিলাম এবং বেলা একটার মধ্যেই আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গোনাইয়ে উপস্থিত হই। এখানে এক স্থানে সংকীর্ণ পথ একবারেই ধ্বসিয়া গিয়াছে। সুতরাং বাধ্য হইয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে উপরের দিক্ দিয়া ঘুরিয়া খানিকটা পথ সাবধানে পার হইতে হইল। তারপর সে দিন অপরাহ্ণ চারিটা নাগাইদ আরও পাঁচ মাইল আন্দাজ আগে চলিয়া আসিয়া সরযূঘাটে (শেরাঘাটে) বিশ্রাম লইতে বাধ্য হইলাম। এখানে আসিতে উত্‌রাই-পথের স্থানে স্থানে এত অধিক পিচ্ছিল যে,

সওয়ার ঘোড়া বা ভারবাহী অশ্বতরকে সেখান দিয়া নীচে নামিতে প্রতি পদক্ষেপেই পড়িয়া যাইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা দেখা গিয়াছিল।

এখান হইতে আলমোড়া মাত্র চব্বিশ মাইল দূরে। বলা বাহুল্য, যতই নিকটে আসিয়া পৌছিতেছি, মন ততই আলমোড়ায় পৌছিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। বর্ষায় সরযূর জল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। বিপুল উচ্ছাসে তরতর-বেগে তাহার দুকূল-ভাঙ্গা স্রোত আগে চলিয়াছে। আমাদের মনের গতি কিন্তু তদপেক্ষা কম ছিল না। এখানে আসিয়া আমাদের পুরাতন কৈলাস-সহযাত্রী ভি. কৌশিক পণ্ডিত মহাশয়ের পুনর্দর্শন পাইলাম। এত দিন পরে হঠাৎ তিনি আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া আনন্দের আতিশয্যে বীরের মত একবার লম্ফ দিয়া উঠিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের কুশল-প্রশ্নাদির পরে, কৈলাস-দর্শন হইতে নীরপানির দুর্দ্দশা পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। নীরপানিতে তিনি মাঝের রাস্তা দিয়া ফিরিয়াছেন। কৌশিক মহাশয় লিপু অতিক্রমকালে তুষার-পথে নামিতে গিয়া যখন কুড়ি হাত নীচে গড়াইয়া পড়েন, পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, সে সময়ে এই বীরচূড়ামণির মুখে বীরত্বের হাসিই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর আজ সেই অক্লান্ত-বীর মহাশয়ই মাঝের রাস্তার বর্ণন করিতে গিয়া, বার বার তিনবার কৈলাসপতির উদ্দেশে একবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াই দণ্ডবৎ করিলেন।

এ দিন সরযূতীরে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন আহারান্তে আবার যাত্রা করা গেল। বৃষ্টির বিরাম নাই, এ জন্য সওয়ার-যাত্রী বা ভারবাহী জন্তু লইয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক্, সে দিন বেলা তিনটা আন্দাজ সময়ে এগারো মাইল দূরে ধলচিনারে উপস্থিত হইয়া এক ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করা হয়। তার পর উত্রাইয়ে নামিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বারিছিনায় আসিয়া আশ্রয় পাইয়া-

ছিলাম। এ দিন রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত গীতবাদ্য-শ্রবণে কাল কাটিয়াছিল। সকল রসে সুরসিক কৌশিক পণ্ডিতের সহচর "ভায়োলীন" যন্ত্রটির এত দিন পরে এইখানেই পরীক্ষা লওয়া শেষ হইল। বলা বাহুল্য, সে দিনে এই যন্ত্রটির নব নব রাগিণীর মধুর আলাপে সেই পাহাড়ী-অঞ্চলেও দুই তিন জন গায়ক আসিয়া জুটিয়াছিলেন।

পরদিন প্রভাতেই মেঘজাল-জটাচ্ছাদিতা, এলায়িতকুন্তলা বর্ষার অসংখ্য চীর-কানন-বেষ্টিত পর্ব্বতের মধ্যস্থলে, সংকীর্ণ পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে যখন আলমোড়াভিমুখে অগ্রসর হইলাম, দূরে দিগ্-দিগন্তের শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বতমালা তখন যেন আমাদের প্রত্যেককেই সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইয়া প্রতিক্ষণেই অপূর্ব্ব মায়াজাল বিস্তার করিতেছিল। আকাশচুম্বী ঘন-সন্নিবিষ্ট চীর-বৃক্ষের শাখায় শাখায় ধীর-মধুর-স্পন্দন-শিহরণে, বিদায়ের করুণ বাজনা ধ্বনিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই বলিয়া দিতেছিল, "ওগো সুদূরের যাত্রি! এতদিন আমাদের প্রাকৃতিক অব্যক্ত মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া আমাদের মাঝেই একপ্রকার আপনা হারাইয়াছিলে, আর আজ এতদিন পরে সে মায়া, সে সুখে-দুঃখে প্রতিদিনের নিরন্তর ভ্রমণানুরাগ একবারেই ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া আপন আপন গৃহাভিমুখী হইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ—যাইবার কালে একবার ক্ষণেকের জন্যও কি এতটুকু স্নেহবিন্দু, অশ্রুজল চোখের কোণে ফুটিয়া উঠিবে না?" অভিভূতের মত বাস্তবিকই সকলে সে দিন সেই চৈতন্যপূর্ণ, অব্যক্ত, অচিন্ত্য জড়-প্রকৃতির পদপ্রান্তে ক্ষণেকের জন্য আছাড়িয়া পড়িয়া চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সে দিন শনিবার, ১লা ভাদ্র, ইংরাজী ১৭ই আগষ্ট, জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। সে দিন আমাদের চিরদুর্গম কৈলাস-ভ্রমণের পথক্লেশ শেষ হইয়াছে। বেলা একটা আন্দাজ সময়ে আমরা আল-

মোড়ায় আমাদের পুরাতন "এম্পায়ার্" হোটেলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এখানে আসিয়াই আবার সেই সহরবাসীর হট্টগোল, মোটর-বাসের হুড়াহুড়ি, চটুল-চরিত্র নানাজাতীয় মনুষ্য-সমাগমের মধ্যস্থলে, নূতন নূতন "ফ্যাসানের" অদ্ভুত সমাবেশ দেখিয়া পথক্লিষ্ট মন ক্ষণেকের জন্য আবার অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল। ঘোড়াওয়ালাগণকে প্রাপ্য মজুরী চুক্তি করিয়া বিদায় দিয়া, বাটী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

বৈকালে রুমা দেবীর সন্ধানে একবার মিশনের "চিল্কাপিটা রামকৃষ্ণ-কুটীরে" উপস্থিত হইয়া স্বামীজীদের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, দেবীজী এক্ষণে শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীর শিষ্যা "মিসেস্ কুকে"র বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। বলা বাহুল্য, সেখানে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলাম। আমাদের নির্ব্বিঘ্নে কৈলাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদে তিনি যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এই অমায়িক দেবী-প্রকৃতি মানবীর সহিত কিছুক্ষণ সদালাপেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ ইত্যবসরে ভাঙ্গা-ডাণ্ডি-বিক্রেতা এল্. আর. শাহ কোম্পানীর দোকানে গিয়া মালিকের নিকট হইতে, ডাণ্ডি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দণ্ডস্বরূপ পাঁচটি টাকা আদায় করিয়া আনিল। বাসায় ফিরিয়া নিশ্চিন্ত-চিত্তে সে দিন কোন প্রকারে রাত্রিকাল অতিবাহিত করিলাম।

প্রভাতে আহারান্তে মোটরে উঠিলাম। আলমোড়া হইতে কাঠগুদামে ফেরতমুখে এক্ষণে অনেক মোটর-বাস্ই যাত্রী খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। সস্তায় (তিন টাকা স্থলে) এবারে প্রতি লোক-পিছু লগেজ সমেত মাত্র এক টাকা ভাড়া গণিয়াই, একাশী মাইল পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম শেষ করিয়া বেলা চারিটা আন্দাজ সময়ে কাঠগুদাম ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনে আসিয়াই প্রথমে আমাদের শরীরের ওজন পরীক্ষা হইল।

পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন না, প্রথম যাত্রাকালের ওজন অপেক্ষা আমার শরীর নয় সের মাত্র (বেশী নহে !) এবং ভূপ সিংএর বারো সের মাত্র ওজন কমিয়া গিয়াছিল। তার পর সন্ধ্যা ৫।৪৫ মিঃ ট্রেণে আরোহণ করিয়া রাত্রি সাড়ে আটটায় বেরিলী পৌঁছিলাম। ভোর চারিটা আন্দাজ সময়ে গাড়ী বদল করিয়া পরদিন অর্থাৎ ৩রা ভাদ্র, সোমবার সন্ধ্যাকালে কাশী অর্থাৎ একবারে নিজ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

চির-দুর্গম কৈলাস-যাত্রার যথার্থ ইতিবৃত্তের সহিত এই তীর্থ-ভ্রমণে বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ খরচ পড়ে, তাহাও এ স্থলে পাঠকগণকে বিশেষ-ভাবে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এ স্থলে তাহার বিস্তৃত হিসাব উল্লেখ করিলাম।

আলমোড়া হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত যাতায়াত-খরচের বিস্তৃত হিসাব

পদব্রজে যাইতে (২ জনের)

আলমোড়া হইতে ধারচুলা-তক—দুই মণ মাল বহিবার জন্য ১টি ভারবাহী ঘোড়ার ভাড়া	১৪৲
ধারচুলা হইতে গার্ব্বিয়াং-তক—দুই মণ মাল বহিবার জন্য ৩ জন কুলীর মজুরী ৬৲ টাকা হিসাবে—	১৮৲
গার্ব্বিয়াং হইতে তাকলাকোট-তক—১টি মালবাহী ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া—	৫৲
তাকলাকোট হইতে কৈলাস হইয়া পুনরায় তাকলাকোটে ফেরত ১টি মালবাহী ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া—	১২৲
তাকলাকোট হইতে গার্ব্বিয়াং-তক—১টি মালবাহী ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া	৫৲
গার্ব্বিয়াং হইতে কৈলাস হইয়া পুনরায় গার্ব্বিয়াংএ ফেরত—গাইডের ১॥০ হিসাবে ২০ দিনের মজুরী—	৩০৲
গাইডের খোরাকী—	১০৲
তাঁবু ভাড়া (একটির)—	৬৲
গার্ব্বিয়াং হইতে ধারচুলা-তক—৪টি মাল বহিবার কুলীর মজুরী ৭৲ টাকা হিসাবে—	২৮৲
ধারচুলা হইতে আস্কোট-তক—৩জন মালবাহী কুলীর মজুরী ২৲ টাকা হিসাবে—	৬৲
আস্কোট হইতে আলমোড়া-তক—১টি ভারবাহী ঘোড়ার মজুরী—	১৪৲
দুই মাসোপযোগী—নিজেদের ২ জনের খোরাকী— প্রতি জন মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে প্রতি মাসে ৪০৲ টাকা ধরিয়াছি।	৮০৲
দুইজনের সর্ব্বসমেত খরচ—	২২৮৲

প্রত্যেক লোকপিছু খরচ ইহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১১৪৲ আন্দাজ পড়িবে।

ঘোড়া বা ঝব্বুতে ও পদব্রজে (২ জনের)

আলমোড়া হইতে ধারচুলা-তক—১টি ভারবাহী ঘোড়ার ভাড়া—	১৪৲
দুইজনের দুইটি সওয়ার-ঘোড়ার ভাড়া ২৬৲ হিসাবে—	৫২৲
ধারচুলা হইতে গার্ব্বিয়াং-তক—(পদব্রজে) মাল বহিবার ৩ জন কুলীর মজুরী ৬৲ হিসাবে—	১৮৲
গার্ব্বিয়াং হইতে তাকলাকোট-তক—১টি মালবাহী ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া	৫৲
২টি সওয়ার ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া—	১০৲
তাকলাকোট হইতে কৈলাস হইয়া পুনরায় তাকলাকোটে ফেরত—১টি মালবাহী ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া—	১২৲
২টি সওয়ার ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া—১২৲ হিসাবে	২৪৲
তাকলাকোট হইতে গার্ব্বিয়াং-তক—১টি মালবাহী ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া—	৫৲
২টি সওয়ার ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া ৫৲ টাকা হিসাবে—	১০৲
গাইডের ২০ দিনের মজুরী প্রত্যহ ১॥০ টাকা হিসাবে—	৩০৲
গাইডের খোরাকী—	১০৲
তাবু ভাড়া—	৬৲
গার্ব্বিয়াং হইতে ধারচুলা-তক—৪টি মাল বহিবার কুলীর মজুরী ৭৲ টাকা হিসাবে—(পদব্রজে)	২৮৲
ধারচুলা হইতে আস্‌কোট-তক—৩ জন মালবাহী কুলীর মজুরী ২৲ টাকা হিসাবে—(পদব্রজে)	৬৲
আস্‌কোট হইতে আলমোড়া-তক—১টি ভারবাহী ঘোড়ার মজুরী—	১৪৲
২টি সওয়ার ঘোড়ার মজুরী ২০৲ টাকা হিসাবে—	৪০৲
দুই মাসোপযোগী—নিজেদের ২ জনের খোরাকী—	৮০৲
প্রতি জন মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে প্রতি মাসে ৪০৲ টাকা ধরিয়াছি।	
দুইজনের সর্ব্বসমেত খরচ—	৩৬৪৲

প্রত্যেক লোকপিছু খরচ ইহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১৮২৲ আন্দাজ পড়িবে।

স্ত্রীলোক বা পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য—(২ জনের)

আলমোড়া হইতে ধারচুলা-তক—১টি ভারবাহী ঘোড়ার ভাড়া—	১৪৲
দুইটি নূতন ডাণ্ডি খরিদ—	৩০৲
ডাণ্ডি দুইটি বহনের ভাড়া ৫৪/০ হিঃ—	১০৮৶০
ধারচুলা হইতে গার্ব্বিয়াং-তক—২টি বাঁশের দোলা তৈয়ারী খরচ—	৮৲
৩ জন কুলীর মজুরী ৬৲ টাকা হিঃ—	১৮৲
দোলা-বাহক ১০ জনের মজুরী প্রতি দোলায় ৫ জন, প্রতি জন ৬৲ হিঃ	৬০৲
গার্ব্বিয়াং হইতে তাকলাকোট-তক—১টি মালবাহী ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া	৫৲
২টি সওয়ার ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া—	১০৲
তাকলাকোট হইতে কৈলাস হইয়া পুনরায় তাক্‌লাকোটে ফেরত—১টি মালবাহী ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া—	১২৲
২টি সওয়ার ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া—	২৪৲
তাক্‌লাকোট হইতে গার্ব্বিয়াং-তক ১টি মালবাহী ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া—	৫৲
২টি সওয়ার ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া—	১০৲
গাইডের ২০ দিনের মজুরী প্রত্যহ ১৷৷০ হিসাবে—	৩০৲
গাইডের খোরাকী—	১০৲
তাবু ভাড়া—	৬৲
গার্ব্বিয়াং হইতে ধারচুলা তক—৪টি কুলীর মজুরী ৭৲ টাকা হিসাবে—	২৮৲
২টি বাঁশের দোলা-বাহক ১০ জনের মজুরী প্রতি জনের ৭৲ হিসাবে—	৭০৲
স্ত্রীলোকের জন্য—ধারচুলা হইতে কৈলাস হইয়া ধারচুলা ফেরত পর্য্যন্ত ১ জন চাকরের বেতন (১ মাসের)—	২০৲
ঐ খোরাক ও কিছু পোষাক (১ মাসের)—	১৫৲
ধারচুলা হইতে আস্‌কোট-তক—২টি বাঁশের দোলা-বাহক ১০ জনের মজুরী ২৲ টাকা হিসাবে—	২০৲
৩ জন কুলীর মজুরী ২৲ টাকা হিসাবে—	৬৲
আস্‌কোট হইতে আলমোড়া-তক—একটি ভারবাহী ঘোড়ার মজুরী—	১৪৲
দুইটি সওয়ার ঘোড়ার মজুরী ২০৲ হিসাবে—	৪০৲
দুই মাসোপযোগী নিজেদের ২ জনের খোরাকী ৪০৲ টাকা হিসাবে—	৮০৲
দুইজনের সর্ব্বসমেত খরচ—	৬৩৯৶০

প্রত্যেক লোকপিছু খরচ ইহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৩১৯৷৷/০ আন্দাজ পড়িবে।

উল্লিখিত হিসাবদৃষ্টে জানা যায়, আলমোড়া হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত সমস্ত পথ পদব্রজে যাতায়াত করিতে পারিলে প্রত্যেক লোক-পিছু এক শত চৌদ্দ টাকা মাত্র, ঘোড়ার উপরে বা কতক কতক পথে পদব্রজে যাইলে প্রত্যেক লোক-পিছু একশত বিরাশী টাকা মাত্র, এবং স্ত্রীলোক বা পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতি লোক-পিছু তিনশত উনিশ টাকা নয় আনা আন্দাজ খরচ লাগিয়া থাকে। আমি একত্রে দুই জনের হিসাব ধরিয়া দেখাইয়াছি। কারণ, একসঙ্গে দুই জনে (অন্ততঃ) যাইতে পারিলে অনেক বিষয়েই খরচ কম হইতে পারে। যেমন, একই ধাতুদ্রব্যে উভয়ের রান্না, একই তাঁবুর মধ্যে, সম্ভব হইলে একত্রে শয়ন পর্য্যন্ত চলিতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে আস্‌বাব কম লাগে, সুতরাং কুলী-খরচ অল্প হয়। বিশেষ সুবিধা এই—গাইড্, চাকুর বা তাঁবু-ভাড়ার খরচাদি সমানে বিভক্ত হওয়ার সুযোগ ঘটে। যাত্রীর সংখ্যা যতই বাড়িবে, এ সকল উপসর্গ জুটাইবার খরচ ততই হ্রাস পাইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

সাধারণতঃ যাত্রিগণ যাত্রাকালে উল্লিখিত হিসাবের টাকা অপেক্ষা কিছু বেশী (অন্ততঃ পঁচিশ টাকা) হাতে অতিরিক্ত রাখিবেন, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-যাত্রী বা পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে আরও কিছু (অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা) অতিরিক্ত রাখিতে পারিলে নিরাপদ থাকা যায়। কারণ, তাঁহারা একবারেই পরবশ। পরের স্কন্ধে যাইতে হইলে যদি প্রতি কুলী ছয় টাকা স্থলে আট টাকাই চায়, তবে ক্ষেত্রহিসাবে স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সেরূপ অবস্থায় বেশী টাকা খরচ হইয়া যায়।

এই হিসাবের ফর্দ্দে যাত্রীর পথের খোরাক প্রতি জনপিছু মাসিক কুড়ি টাকা রাখিয়াছি। শুধু "খাই-খরচে" এতটা না লাগিলেও,

আনুষঙ্গিক খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিষ—যেমন, কিছু কেরোসিন তৈল, কিছু বা সরিষা তৈল, কতক কতক শুষ্ক খাদ্য—(আখরোট, পেস্তা, কিস্‌মিস্‌, মিছরী প্রভৃতি) সঙ্গে লইয়া যাইতে গেলে মাসিক কুড়ি টাকার কমে হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

প্রত্যেক দুইজনের মালপত্রের ওজন দুই মণ হিসাবে ধরিয়াছি। তাহাতে বিছানাপত্র, হাল্কা ধাতুদ্রব্য (এনামেল্‌ হইলেই সুবিধাজনক), শুষ্ক খাদ্য, মাল-মশলা, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি মোটামুটি আসিয়া যায়।

ইহাই হইল বর্ত্তমান সময়ে কৈলাস-তীর্থ-ভ্রমণের আনুমানিক ব্যয়-বিবরণ। অবশ্য রেল-ভাড়া বা দান-খয়রাতের খরচ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। বুদ্ধির তারতম্য হিসাবে অর্থের দিক্‌ দিয়া হিসাবের কিছু ভুলচুক্‌ হওয়া অস্বাভাবিক নহে, এ জন্য যদি কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে পাঠকবর্গের নিকটে বিদায় লইবার পূর্ব্বে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

কৈলাস-যাত্রা শেষ হইল। মুক্তি-রাজ্যের সম্রাট্‌ বিশ্বনাথের চির-দুর্গম উজ্জ্বল মুক্তি-প্রাসাদ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি আজ তাঁহারই সেই মুক্তি-রাজধানী কাশী-নগরীতে। জানি না, মহাপ্রয়াণের সন্ধিক্ষণ কোথায় লিখিত আছে!

ভারতবিশ্রুত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, দেখুন ঃ—

তোমার 'মানস-সরোবর ও কৈলাস' ভ্রমণ আমি মধ্যে মধ্যে শ্রবণ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থের সহিত বর্ত্তমান সংস্থানের সামঞ্জস্য প্রদর্শনে তোমার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। তোমার গ্রন্থের বহুল প্রচার হউক এবং তুমি যশস্বী হইয়া চিরজীবী হও ইহা আমার আশীর্ব্বাদ। রচনাসৌষ্ঠব ও শাস্ত্র-দৃষ্টির পরিচয় বাঙ্গালা গ্রন্থে একাধারে অল্পই দেখা যায়, তোমার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাহা আছে সেই জন্যই আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি-

২০শে শ্রাবণ
৺কাশীধাম

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা

ভারতবর্ষের সম্পাদক, হিমাদ্রি-পথের পর্য্যটক, সুপ্রবীণ সাহিত্যিক রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর মহাশয়ের অভিমত :—

দেশ ভ্রমণ আমার নেশা বল্‌লেই হয়। এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি, ভ্রমণে বে'র হ'বার শক্তি-সামর্থ্য নেই। তা হ'লেও ভ্রমণের নাম শুন্‌লেই আমি নেচে উঠি। চল্‌বার শক্তি নেই, তাই অন্যের ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে আমার ভ্রমণের সাধ এখন মিটাই। সেই জন্য, যখন পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বসুমতী' পত্রে ধারাবাহিক ভাবে 'মানস-সরোবর ও কৈলাস' ভ্রমণ-কাহিনী ছাপ্‌তে আরম্ভ করেছিলেন, আমি তখন বিশেষ আগ্রহে সে সমস্ত পড়েছিলাম। আগ্রহের আরও একটা কারণ ছিল; আমার সোদরোপম স্নেহভাজন শ্রীমান্ রায় নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই ভ্রমণের সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁদের কথা জান্‌বার আগ্রহ আমার পক্ষে স্বাভাবিক। তাই সেদিন সুশীল বাবু যখন আমাকে বল্‌লেন যে, তিনি তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করবেন, আমি তখন তাঁকে খুব উৎসাহ দিয়েছিলাম। সেই বই ছাপা হ'য়ে গেল, কত চিত্র শোভিত হ'য়ে ছাপা হ'ল, সুতরাং, আমি যে এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করব, তার কি আর কথা আছে? বইখানি যে বেশ হয়েছে, সুপাঠ্য হয়েছে, সে কথা আমার মুখে শোনার চাইতে পাঠক-পাঠিকাগণের মুখে শুন্‌লে গ্রন্থকারেরও বেশী আনন্দ হবে, আমারও মন প্রফুল্ল হবে।

২১শে শ্রাবণ
১৩৩৮

শ্রীজলধর সেন

অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ধ্রুবতারা প্রভৃতি সৎসাহিত্যের রচয়িতা, ধর্ম্মপ্রাণ রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ বাহাদুর মহাশয় লিখিতেছেন ঃ—

মাসিক বসুমতীতে শ্রীযুত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের লিখিত মানস-সরোবর ও কৈলাসযাত্রার বিবরণ যখন মাসে মাসে বাহির হইত, তখন আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিতাম। পরে সুশীল বাবু যখন একদিন বলিলেন, তিনি উহা পুস্তকাকারে বাহির করিবেন, তখন বাস্তবিকই সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহার এই লেখাটি যেমন বহু তথ্যপূর্ণ, তেমন চিত্তাকর্ষক। এই পুস্তক বাঁহির হইলে, তাহা বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে এবং বহু তীর্থদর্শনকারীর উপকার সাধন করিবে। এই লেখার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও সরস, তেমন বর্ণিত বিষয়ানুরূপ গাম্ভীর্য্যরসে পরিপূর্ণ। জগতের শ্রেষ্ঠতম প্রাকৃত সৌন্দর্য্যমণ্ডিত দৃশ্যাবলী যথাযথভাবে চিত্রিত করিতে হইলে যেরূপ কবিত্বশক্তির প্রয়োজন, সুশীল বাবুর মধ্যে তাহার অসদ্ভাব নাই দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এতদ্ভিন্ন হিন্দুর এই বহু প্রাচীন তীর্থসম্বন্ধে পুরাণাদি শাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি যে সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় প্রদান করে। তিনি বঙ্গবিশ্রুত যে পণ্ডিত-শিরোমণির দৌহিত্র, তাহাতে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি আশা করি, তাঁহার এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র যথোচিত আদর লাভ করিবে।

৺কাশীধাম
২১শে আষাঢ়, ১৩৩৮ } শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

কাশী-কুইন্স-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রাচ্য-প্রতীচ্য-বিদ্যায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, মহোদয় বলেন ঃ—

শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সচিত্র মানস-সরোবর ও কৈলাস" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মানস-সরোবর ও কৈলাসের গৌরব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু কদাচিৎ দুই একটি পর্য্যটনশীল সাধু মহাপুরুষের মুখে প্রসঙ্গতঃ দুই চারিটি সাধারণ বিবরণ ভিন্ন 'এতদিন এই শ্রেষ্ঠ তীর্থসম্বন্ধে কোথাও বিশেষ কোনও সংবাদ জানিবার উপায় ছিল না। অতি দুর্গম ও বিপৎ-সঙ্কুল পথের. কঠোরতা নিবন্ধন সাধারণ হিমাচলযাত্রীও কৈলাস পর্য্যন্ত যাইতে প্রায়ই সাহস পান না, এবং যাঁহারা যাইয়া থাকেন, তাঁহারাও অনেক সময়ে নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন না। বঙ্গসাহিত্যে এত দিনের মধ্যে দুই তিনজন মাত্র লেখকই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁহাদের বিবরণ অপেক্ষাও নানা কারণে বর্ত্তমান গ্রন্থ-প্রদত্ত বর্ণনা অধিকতর প্রামাণিক, উপাদেয় এবং ভবিষ্যৎ কৈলাস-যাত্রাভিলাষী যাত্রিগণের পক্ষে উপযোগী। গ্রন্থকার প্রাঞ্জল এবং সরল ভাষায় নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহাতে সত্যের মর্য্যাদা কোনও স্থানে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, অথচ রচনাটি বাস্তবিকই সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা বঙ্গীয় সাহিত্যে এই জাতীয় গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ,
বেনারস।
৮ই জুলাই, ১৯৩১

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান

শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য

১৯০নং সোনারপুরা, ৺কাশীধাম,

অথবা

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির

১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা